নব ভারত স্রষ্টা

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

পদ্মিনী সেনগুপ্ত



৪'৬

নব ভারত স্রষ্টা

দেশপ্রিয়
যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

৪৩৪

পদ্মিনী সেনগুপ্ত

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

জানুয়ারী, ১৯৭৫ (পৌষ-মাঘ, ১৮৯৬)
January, 1975 (Pausa-Magh,1896)

DESHAPRIYA JATINDRA MOHAN SENGUPTA (Bengali)

মূল ইংরেজী পুস্তকের প্রকাশকাল : জুলাই, ১৯৬৮
বাংলা অনুবাদ : শ্রীক্ষিতীশ রায়

মূল্য : ৫.০০ টাকা
Price : Rs. 5.00

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস্, এ্যান্টুল এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৯ দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান : ৮, এস্প্ল্যানেড ইষ্ট (একতলা) কলিকাতা-১

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের
কনিষ্ঠ সহোদর

ও

আমার স্বামী
রণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার স্বামী রণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত দেশপ্রিয় সম্পর্কিত বাংলা বই ও চিঠিপত্রাদি আমায় তর্জমা করে শুনিয়েছেন, তাঁর মেজদাদার বিষয়ে অনেক স্মৃতিকথা বলেছেন—তাঁর কাছে ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর কাছে লেখিকা গভীরভাবে ঋণী।

ভূমিকা

আমার ছোট জা পদ্মিনীকে বলা হয়েছে আমার স্বামী দেশপ্রিয়ের জীবন কথা লিখতে। তাঁর বাসনা আমি এই বইয়ের ভূমিকা লিখি। পদ্মিনীর সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় থাকলে বেশ হত।

তরুণ বয়স থেকেই দেশের রাষ্ট্রিক ব্যাপার নিয়ে আমার স্বামী মাথা ঘামাতেন। অন্যান্য লোকের তুলনায় তাঁর পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু দেশের কাজে গভীর আগ্রহ ছিল বলেই, ঘরের অভ্যস্ত আরাম অনেকখানি ত্যাগ করে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন যখন খুবই জোরদার, মহাত্মাজী সেই সময়ে 'অগ্রণী চট্টগ্রাম!' ('Chittagong to the Fore!') নাম দিয়ে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পূর্বাপর বিবেচনা না করেই চট্টগ্রাম জেলার জনসাধারণ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জীবিকার নানা ক্ষেত্র থেকে বয়ঃক্রম নির্বিশেষে এ জেলার লোক সেদিন পরম উৎসাহে মহাত্মাজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের কেন্দ্রে সেদিন যতীন্দ্র মোহন প্রাণস্বরূপ ছিলেন—আজ যদি এ কথা বলি, আশা করি কেউ আপত্তি করবেন না।

দেশের প্রতি গভীর প্রেমে দেশের কাজে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সারা বাংলার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তেমনি চট্টগ্রামের হৃদয় জয় করেছিলেন যতীন্দ্র মোহন।

ব্যারিষ্টর মিঃ জে. এম. সেনগুপ্তের 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্র মোহনে পরিণত হওয়া একটি মহৎ ঘটনা। কিন্তু এ রূপান্তর হঠাৎ কোনো আকস্মিক কারণে ঘটে থাকবে—এমন মনে করা ভুল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি যখন ছাত্র তখনো তাঁর আচারে আচরণে কথায় বার্তায় মাতৃভূমির প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ

পেত। দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রগাঢ় সত্যনিষ্ঠার সমন্বয় হয়েছিল বলে দেশের কাজে তিনি অকুতোভয় হতে পেরেছিলেন।

তিনি শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। কেবল চট্টগ্রাম জেলার চতুঃসীমানার মধ্যে নিছক রাজনীতিক কাজ তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। অচিরকালের মধ্যেই ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—এমনকি বহির্বিশ্বেও—তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার আয়তন বিস্তৃত হতে থাকে, জীবনযাত্রার বিচিত্র বিষয় তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে শুরু করেন।

পতিরূপে তিনি ছিলেন প্রেমময়। ছোট ভাই ও ছেলেরা পেয়েছিল তাঁকে স্নেহময় পিতা ও বন্ধুরূপে। আত্মীয়-স্বজনের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল। কেবল বন্ধুবৎসল ছিলেন এমন নয়, সকলের প্রতি, এমন কি বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিদের প্রতিও তিনি ছিলেন বন্ধু ভাবাপন্ন। এই কারণেই তিনি যে আসনই অলঙ্কৃত করে থাকুন সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন।

আইনজীবী ক্রীড়ামোদীরূপে, স্বাধীনতার যোদ্ধা ও বিতর্ক-নিপুণ আইনসভার সদস্যরূপে, রাজনীতিক সংস্কারক ও শক্তিমান সংগঠন কর্মীরূপে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসংহতির পরিপোষকরূপে, কলকাতা করপোরেশনের মেয়র পদে থাকা কালে সকল নাগরিকের সমাধিকারের সাধকরূপে, ভারতীয় ছাত্রসমাজের জনপ্রিয় নেতারূপে—আজো তিনি বহুলোকের স্মৃতিতে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বিরাজ করছেন।

কিন্তু বিচিত্র সম্ভাবনায় উজ্জ্বল তাঁর জীবনের শেষ কথাটি তিনি তো বলে যেতে পারেননি। স্বাধীনতার কুরুক্ষেত্র-রণে তিনি যখন ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন, ভারতে বৃটিশ শাসনের লাঞ্ছনা ও গ্লানি ইংরেজকে ভারতবাসীর সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে—এই সত্য কথা যখন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, ঠিক সেই সময়ে ১৯৩৩ সালে অতর্কিত মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ছিঁড়ে ফেলল তাঁর জীবনখাতার অনেকগুলি শূন্য পাতা।

নেলী সেনগুপ্ত

সূচি

প্রথম খণ্ড

পরসেবা-আত্মসেবার ঊর্ধে

প্রথম	...	পরিবার পরিবেশ	১
দ্বিতীয়	...	পিতা-মাতা	৬
তৃতীয়	...	ছেলেবেলা ও কেম্‌ব্রিজ	১০
চতুর্থ	...	বিবাহ	১৫
পঞ্চম	...	গৃহজীবন ও কর্মজীবনের সূচনা	১৯
ষষ্ঠ	...	রাজনীতিক জীবনে প্রথম সাফল্য	২৮
সপ্তম	...	ধর্মঘট ও তার জের	৩৫
অষ্টম	...	স্পর্ধিত প্রতিবাদ	৪৩
নবম	...	প্রথম কারাবরণ	৫১
দশম	...	চট্টগ্রাম কনফারেন্স	৫৯
একাদশ	...	স্বরাজ্য পার্টি	৬৭
দ্বাদশ	...	বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিল	৭২
ত্রয়োদশ	...	ত্রি-মুকুট	৭৬
চতুর্দশ	...	কলকাতার মেয়র	৮৫
পঞ্চদশ	...	কৃষ্ণনগর ও প্রদেশ কংগ্রেসে ভাঙন	৮৯
ষোড়শ	...	কাউন্সিল নির্বাচন ও পুনরায় মেয়র	৯৫

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানী

প্রথম	...	স্বাধীনতা আন্দোলন	১০৭
দ্বিতীয়	...	জনপ্রিয় মেয়র	১১৪
তৃতীয়	...	কংগ্রেসের আহ্বান	১১৮
চতুর্থ	...	একতার অভাব	১২৭
পঞ্চম	...	পূর্ণ স্বাধীনতা	১৩২
ষষ্ঠ	...	ব্রহ্মদেশে বিচার	১৩৬
সপ্তম	...	কলকাতায় গ্রেফ্‌তার	১৪১
অষ্টম	...	জজ সাহেবের দোটানা	১৪৬
নবম	...	কারাবাস ও পুনরায় মেয়র	১৬১
দশম	...	জেলের ভিতরে ও বাহিরে	১৬৪
একাদশ	...	গান্ধী আরউইন চুক্তি	১৬৮
দ্বাদশ	...	তিন সঙ্কট	১৭৫
ত্রয়োদশ	...	বিলাত যাত্রা	১৭৯
চতুর্দশ	...	কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নেলী সেনগুপ্ত	১৮৬
পঞ্চদশ	...	অন্তরীণ ও মৃত্যু	১৯০
ষোড়শ	...	শেষ যাত্রা	১৯৫
সপ্তদশ	...	মানুষ হিসাবে দেশপ্রিয়	২০১
		গ্রন্থপঞ্জী	২১১

প্রথম খণ্ড

পরসেবা আত্মসেবার উর্ধে

'দেশের প্রতি প্রেমে কিংবা দেশের কাজে আত্মনিবেদনে আমি নিজেকে কারো চেয়ে ন্যূন বলে মেনে নিতে পারি না।'

যাত্রা মোহন সেনগুপ্ত

(১৯১৯ সালে ময়মনসিংহ কনফারেন্স-এ প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবার ও পরিবেশ

যতীন্দ্র মোহন ধনী ঘরের দুলাল হয়ে জন্মাননি। তাঁর পিতা যাত্রা মোহন সেন কঠোর পরিশ্রমে ও সৎ উপায়ে অল্পে অল্পে প্রভূত বিত্তের অধিকারীরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যাত্রা মোহনের পিতা ত্রাহিরাম সেন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু আজীবন তাঁকে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ত্রাহিরামের পত্নীর নাম ছিল মেনকা। কবিরাজ রূপে ত্রাহিরামের এমনি খ্যাতি ছিল যে তিনি চিকিৎসা করতে আসবেন জানলেই অনেক রোগী আরাম বোধ করত। কবিরাজীতে তাঁর পসার ছিল ভালো, তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল অনাড়ম্বর ও সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাহলে কি হয়, প্রভূত ধন তিনি উপার্জন করতে পারেননি, সম্ভবতঃ তাঁর অধিকাংশ রোগী ছিল গরীব-দুঃখী এবং তিনি বিনা পয়সায় তাদের চিকিৎসা করতেন।

ত্রাহিরাম ও মেনকার চার ছেলের নাম নবকুমার, নীলকমল, প্যারী মোহন ও যাত্রা মোহন। একমাত্র মেয়ের নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। যাত্রা মোহন হয়েছিলেন কেবল এই পাঁচ জনের মধ্যে নয় আর পাঁচ জনেরও মধ্যে একজন। ১৮৫০ সালে তাঁর জন্ম। ত্রাহিরাম ও মেনকার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ নবকুমারকে মাসিক বারো টাকা বেতনে জমিদার বাড়ির গোমস্তার কাজ নিতে হয়। এদিকে যাত্রা মোহনের উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ। পড়াশোনায় ভালো ছিলেন বলে এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি জলপানি পান এবং সেই বৃত্তির টাকা জমিয়ে তিনি বি, এ ও বি, এল পরীক্ষায় পাশ করেন। পূর্ববঙ্গের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম সহরে তিনি তাঁর ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। অনতিকালের মধ্যে তাঁর পসার জমে এবং ওকালতির পয়সায় তিনি বিস্তর জমিজমা খরিদ করেন। পরে তিনি বরমা গ্রামের জমিদাররূপে পরিচিত হন।

যাত্রা মোহনের সঙ্গে বিবাহ হয় বিনোদিনী দেবীর—ইনি ছিলেন তদানীন্তন কলকাতা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্নদাচরণ খাস্তগীরের সেজ মেয়ে। এঁদের বিবাহিত জীবন বড়ই মধুর ছিল। এই বিবাহের ফলে তাঁদের পনেরোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে—আট ছেলে ও সাত মেয়ে। সর্বজ্যেষ্ঠ মনমোহন তাঁর নিজের বিবাহের অনতিকাল পরে অকালে মারা যান—তাঁর বিধবা পত্নী কুসুমকুমারীকে রেখে। কুসুমকুমারী মহীয়সী রমণী ছিলেন, স্বভাবগুণে তিনি পরিবারস্থ সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। শাশুড়ী বিনোদিনী দেবীর মৃত্যুর পর বৃহৎ একান্নবর্তী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তিনি আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সেনগুপ্ত পরিবারের বড় বৌদিই ছিলেন আমরণ সর্বময়ী কর্ত্রী। ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। যাত্রা মোহনের দ্বিতীয় সন্তান সুরধুনী আঠারো বছর বয়সে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যান। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন ছিলেন তাঁর মা-বাবার তৃতীয় সন্তান ও মেজো ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই অন্য ভাইদের চেয়ে তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর। অল্প বয়সেই সমাজ সেবায় তিনি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। যাত্রা মোহনের অন্যান্য সন্তানের মধ্যে চতুর্থটি ছিল কন্যা—ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়। পঞ্চম সন্তান—ফণীন্দ্র মোহন গ্রামেই তাঁর জীবন কাটিয়েছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম ছিল যমজ ভাইবোন। বোনটি মারা যায়, ভাই নীরেন্দ্র মোহন বিলেত গিয়ে ডাক্তার হয়েছিলেন ও সেখানে ইভা বলে একটি মিষ্ট-স্বভাব ইংরেজ কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ইভা ভারতে পা না দিলেও এমন আচরণ করতেন যেন তিনি সেনগুপ্তদের বিরাট একান্নবর্তী পরিবারেরই অন্যতমা বধূ। পরিবারের কেউ যখন বিলেত যেত, তাঁর বাড়ীতে পেত খোলা দরজার আতিথ্য সেখানে তাঁর বাড়িই ছিল আমাদের সকলের আশ্রয়স্থল।

নীরেন্দ্র মোহন ও ইভার একমাত্র সন্তান আইলীন যখন বারো চোদ্দ বছরের বালিকা সেই সময় তাকে এ দেশে আনা হয়। যতীন্দ্র মোহন তাঁর স্ত্রী নেলী আইলীনকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। রাঁচিতে অন্তরীণ থাকা কালে তার জেঠামশায়ের যখন মৃত্যু হয়, আইলীন ছিল তাঁর শয্যাপার্শ্বে।

যাত্রা মোহনের অষ্টম সন্তান নলিনী খুব কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। বি. এ. ক্লাসের তিনি যখন ছাত্রী, সে সময় নীরেন্দ্র মোহনের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে তাঁরও মৃত্যু হয়। পর পর এই দুটি মৃত্যুশোকে যাত্রা মোহন বিশেষ কাতর হয়েছিলেন এবং এর ফলে যতীন্দ্র মোহনের পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। নলিনীর পর যে চারজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাঁদের নাম দ্বিজেন্দ্র মোহন, বীরেন্দ্র মোহন, শৈলেন্দ্র মোহন ও রণেন্দ্র মোহন।* প্রথম তিন জনের উচ্চশিক্ষার আগ্রহ ছিল না বলে গ্রামেই থেকে যান। রণেন্দ্র মোহন ছাত্র হিসাবে কৃতী হয়েছিলেন ও উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। যাত্রা মোহনের পনেরোটি সন্তানের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র রণেন্দ্র মোহনই বেঁচে আছেন। দ্বাদশ সন্তান ইন্দিরার পর দুজন যমজ ভগ্নী জন্মায়—তাদের নাম সুজাতা ও সুব্রতা। সুব্রতার ডাক নাম ছিল ছুট্‌কী। লেখাপড়ায় সে খুব ভালো ছিল বলে অল্প বয়সেই গ্র্যাজুয়েট হয় ও শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করে। বিবাহের পরেও শিক্ষকতা সে ছেড়ে দেয়নি। ১৯৩৮ সালে ছুট্‌কী ও তার দুটি সন্তান টাইফয়েড রোগে মারা যায়, বেঁচে থাকে তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। আজকের দিনেও তাঁর বন্ধুরা ছুট্‌কীর বিষয়ে বলতে গিয়ে তার ধৈর্য, সাহস ও প্রীতিপূর্ণ স্বভাবের সপ্রশংস উল্লেখ করে থাকেন।

বাল্যকালের অধিকাংশ সময় যতীন্দ্র মোহন কাটিয়েছিলেন চট্টগ্রাম সহরে ও বরমা গ্রামে। চট্টগ্রাম সহর সমুদ্র বেষ্টিত পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। মোহনার মুখে থাকায় এই অঞ্চলের নদীগুলির বিস্তার দেখবার মতো। পূর্ববঙ্গের একমাত্র বন্দর বলে চট্টগ্রামের যে খ্যাতি ছিল, যতীন্দ্র মোহনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে সেই খ্যাতি বহুগুণিত হয়। তখনকার কালে বাংলার এই অঞ্চলে সপ্তাহের ছ'টা দিন বেশির ভাগ ভদ্রলোক নিজ নিজ পেশা ও জীবিকার তাগিদে সহরে কাজকর্ম করতেন, কিন্তু সপ্তাহান্তে শনিবারটা কাটাতেন সহরের নিকটবর্তী নিজ নিজ গ্রামদেশে। সহর ও গ্রামের দুটি আলাদা

* এই শেষোক্ত হলেন লেখিকার স্বামী

জগতের সঙ্গে অল্প বয়সেই ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়, যতীন্দ্র মোহন বুঝেছিলেন বিদেশী শাসকের আওতা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কি সহর কি গ্রামের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব হবে না। তাঁর বেশীর ভাগ ভাই বোনেদের মতো যতীন্দ্র মোহনও জন্মেছিলেন বরমা গ্রামে। এই গ্রামটি ছিল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত। সেকালে সমগ্র জেলার মধ্যে পটিয়া থানার স্থান ছিল সবার শীর্ষে। লোকে বলত পটিয়ায় লক্ষ্মী সরস্বতী একত্রে বিরাজ করেন। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্বান ও বিত্তবানদের এরকম একত্র সমাবেশ দেখা যেত আর কেবল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন বিক্রমপুরের লোক। এক বিক্রমপুর থেকে যত খ্যাতনামা উকিল, ব্যারিষ্টার, শিক্ষক, অধ্যাপক ও ডাক্তার বৈদ্য বেরিয়েছেন, তেমনটি ভারতের আর কোনো জায়গা থেকে বেরোননি। পটিয়াকে বলা হত চট্টগ্রামের বিক্রমপুর। বরমার উত্তরে ও দক্ষিণে ছিল বিস্তীর্ণ চর জমি, সেখানকার উর্বর পলিমাটি অল্প আবাদে কত যে ফসল ফলাতো তার আর ঠিকঠিকানা নেই। ধান, পাট, তিল, সর্ষে, আলু, তরমুজ, শাক সবজির কোনো কমতি ছিল না। এইসব ক্ষেতের পাশ দিয়ে বয়ে যেত শঙ্খ নদী। পদ্মার চেয়ে সে নদী ছোট হলে কি হয়, বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে সে নদীই হত পদ্মার মতো ভয়ঙ্করী, বন্যায় ভাসিয়ে নিত গ্রামকে গ্রাম। ক্ষতি করত খুবই কিন্তু বন্যার জলে ভেসে আসত যে পলিমাটি তার প্রলেপে সব ক্ষয়-ক্ষতি মুছে দিয়ে জমিকে বহুগুণে শস্য শ্যামলা করে তুলত।

বরমা গ্রামের জমিদার হিসাবে যাত্রা মোহন তাঁর বুদ্ধিকৌশলে এই গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন—কেবল নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য নয় প্রজা-সাধারণের হিতের জন্যও। শঙ্খ নদীর উত্তর তটে অবস্থিত এই গ্রামটির নৈসর্গিক পরিবেশও ছিল মনোরম। জট নামে একটি শাখা নদী বয়ে যেত যাত্রা মোহনের সবজি ক্ষেতের গা ঘেঁসে। এই নদীতে ছিল অপর্যাপ্ত মাছ। গ্রামের মাঝখানে যাবার জন্য ছিল একটি বাঁধা সড়ক। সহর গ্রামে ভূসম্পত্তি থাকায় যাত্রা মোহনের প্রতিপত্তি ছিল কিছু কম নয়। অথচ তাঁর ঐশ্চর্যের

আড়ম্বর ছিল না, আসলে তিনি ছিলেন একজন শান্ত স্বভাব সৎলোক। এইরকম পারিবারিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল আবহাওয়ায় যতীন্দ্র মোহনের ছেলেবেলা কেটেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পিতা-মাতা

জমিদার হিসাবে যাত্রা মোহন ছিলেন অন্যান্য জমিদারদের অনুকরণীয় একজন আদর্শ জমিদার। প্রজাদের প্রতি তাঁর মায়াদয়ার অন্ত ছিল না। আইনজীবী রূপে মামলা মোকদ্দমা ছিল তাঁর পেশা। কিন্তু তাঁর অভিযোগক্রমে কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে বরমার কোন প্রজাকে কখনো কোর্ট-কাছারি করতে হয়নি। মামলা করে গরীব প্রজাদের জব্দ করা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁর জমিদারীর অলিখিত নিয়ম অনুসারে প্রজারা যে যখন পারত বকেয়া খাজনা মিটিয়ে দিত, তা নিয়ে কোনো জবরদস্তি করা হত না। এ থেকে জমিদারের বদান্যতা সূচিত হয় বটে, কিন্তু এরকম প্রশ্রয় দেবার ফলে জমিদারীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমনও হয় যে স্বয়ং জমিদার সরেজমিনে হাজির না থাকলে প্রজারা দেয় খাজনা বাকী ফেলত।

বরমার আরো একজন জমিদার ছিলেন অখিল চৌধুরী। মতে ও স্বভাবে বনতনা বলে ইনি প্রায়ই যাত্রা মোহনের সঙ্গে খিটিমিটি মামলা বাধাতেন। মামলায় জয়ী না হলে কি হয়, যত তিনি হারতেন তত অখিল চৌধুরীর জেদ চাপত প্রতিপক্ষকে কোনো উপায়ে জব্দ করতে। এই মামলাবাজ জমিদারটির বিরুদ্ধেও যাত্রা মোহনের কোনো বিদ্বেষ ভাব ছিল না। সে বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে : এক সন্ধ্যায় অখিল চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছেন শঙ্খ নদীর ঘাটে—উদ্দেশ্য খেয়া পার হয়ে যাবেন চট্টগ্রামে। সেখানে পরদিন জিলা জজের কোর্টে যাত্রা মোহনের বিরুদ্ধে তাঁর একটি কেস্-এর শুনানী। ঘাটে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেই ঘনঘটা করে ঝড় এল। পারাপারের নৌকা আর যেতে চায় না। চৌধুরী মশায় অস্থির হয়ে পড়লেন কারণ সহরে তাঁর না গেলেই নয়, আদালতে গর হাজির হলে মামলা খারিজ হয়ে যেতে পারে। কী উপায় করা যায় ভাবছেন এমন সময় দেখতে পেলেন অন্য কোন ঘাট থেকে একটি নৌকা

ঝড়ের মধ্যেই বয়ে চলেছে সহরের দিকে। চৌধুরী মশায় গলা ফাটিয়ে মাঝিকে ডাক দিলেন তাঁকে পারে নেবার জন্য। নৌকা মুখ ঘুরিয়ে চলে এল তাঁর ঘাটে—ছই-এর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে যাত্রা মোহন বললেন, 'চলে আসুন চৌধুরী মশায়।' মামলা লড়বার জন্য তিনিও চলেছেন সহরে, কিন্তু তাঁর যাঁর সঙ্গে মামলা সেই বিবাদী ব্যক্তিটিকে ওইরকম অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর মায়া হল। প্রতিপক্ষকে তিনি নিজের নৌকায় তুলে নিলেন। সহরের ঘাটে একসঙ্গেই তাঁরা নামলেন ও জজ সাহেবের আদালতে যথা সময়ে হাজির হয়ে মামলাও লড়লেন পরস্পরের সঙ্গে।

গরীব মক্কেলরা যাত্রা মোহনকে খুব খাতির করত। তারা যাতে ন্যায় বিচার পায় সেজন্য তিনি সব সময় তাদের হয়ে লড়তেন। প্রথম প্রথম এদের মধ্যেই তাঁর পশার জন্মে বেশী। ক্রমে ক্রমে তাঁর ওকালতির আয় বৃদ্ধি পেতে লাগল, সে টাকায় তিনি জমি কিনলেন, বাড়ি কিনলেন চট্টগ্রাম সহরে ও বরমা গ্রামে। সহরে যে তিনি বিরাট বসতবাড়ী তৈরী করেছিলেন, আজকাল সেই বাড়ীতেই যতীন্দ্র মোহনের ইংরেজ স্ত্রী নেলী বসবাস করেন।

বরমা গ্রামের যে বাড়িটিতে যাত্রা মোহন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, ক্রমে তাঁর পরিবার বৃদ্ধির ফলে সে বাড়িতে সকলের স্থান সঙ্কুলান করা শক্ত হয়ে উঠল। তখন ভিটেবাড়ি ছেড়ে তাঁকে গ্রামের অন্যত্র একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ী তুলতে হল। তাঁর পরিবারের বসবাসের ফলে গ্রামেরও প্রভূত উন্নতি হতে লাগল। তাঁর চেষ্টায় গ্রামে ডাকঘর পত্তন হল, বাজার বসল। পিতামাতার স্মরণে ত্রাহিমেনকা মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় নাম দিয়ে তিনি যে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে স্কুল আজও রয়েছে। ১৯১৯ সালে যাত্রা মোহনের মৃত্যুর পর যতীন্দ্র মোহনের চেষ্টায় সে স্কুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পরে যাত্রা মোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রণেন্দ্র মোহন স্কুলের কাজ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ড স্থাপন করেন।

বরমার একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যাত্রা মোহন

এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করে গিয়েছিলেন। কিন্তু চিকিৎসালয়টির কাজ চালু অবস্থায় তিনি দেখে যেতে পারেননি। যেদিন চিকিৎসালয় খোলার কথা তার অল্প কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসালয় উদ্বোধনের সভা শোক-সভায় পরিণত হয় এবং গ্রামের মাতব্বর লোকেরা সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাবক্রমে স্থির করনে যে চিকিৎসালয়ের নাম হবে প্রতিষ্ঠাতার নামে—যাত্রা মোহন সেন চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি।

চট্টগ্রাম সহরেও যাত্রা মোহনের বদান্যতা ও সমাজ-কল্যাণমূলক বিবিধ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে। এইসব কাজে তিনি মুক্তহস্তে ভূমি দান করেছেন, অর্থ সাহায্য করেছেন। 'যাত্রা মোহন হল' তাঁর মৃত্যুর পর স্থাপিত হলেও এর জন্য অধিকাংশ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের কাছ থেকে। চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন—যার তিনি সভাপতি ছিলেন—তা এক প্রকার তাঁরই কীর্তি, তাঁরই টাকায় জমি কিনে অ্যাসোসিয়েশনএর জন্য বাড়ি তোলা হয়। স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। চট্টগ্রামে মেয়েদের হাইস্কুল প্রতিষ্টিত করার জন্য জমি তিনিই দিয়েছিলেন। পরে এই স্কুলের নাম হয়—'ডক্টর খাস্তগীর হাইস্কুল ফর গার্লস্'।

১৯০৭ সালে (বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের জের তখনও চলছে) চট্টগ্রাম, আকিয়াব ও রেঙ্গুনের মধ্যে জলপথে চলাচলের জন্য একটি স্বদেশী ষ্টিমার কোম্পানী প্রতিষ্টিত হয়। কোম্পানীর নাম ছিল বেঙ্গল ষ্টীম কোম্পানী। চট্টগ্রামের কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন এর পিছনে। কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেসন্-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা। কোম্পানী চালু হবার অল্প কিছুকাল পরেই দেখা গেল তার আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যে যাত্রা মোহন ব্যাঙ্কের কাছে কোম্পানীর জামিন্দার দাঁড়িয়েছিলেন। ধারের অঙ্ক ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। কোম্পানী ফেল করার পর জমিদারের ঘাড়ে মস্ত একটা ঋণের বোঝা চাপল, কিন্তু কথা যখন দিয়েছেন তার তো খেলাপ করতে পারেন না। কথা তিনি রেখেছিলেন

ঠিকই কিন্তু এই জন্য তাঁকে বেশ কিছু সম্পত্তি মায় আবাদী জমি বেচে দিতে হয়। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে নিজের গাড়িঘোড়া, এমন কি স্ত্রীর অলঙ্কার বেচে তাঁকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কিন্তু দমবার পাত্র তিনি ছিলেন না, নষ্ট সম্পত্তির অনেকটাই স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে তিনি অল্পে অল্পে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

যাত্রা মোহন জন্মেছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে, কিন্তু বিয়ে করেছিলেন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারে। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন বলে, গোঁড়া হিন্দুদের পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সংস্কারের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক অনীহা ছিল। বিবাহের পর তিনি নিজেও ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হয়েছিলেন, এজন্য তাঁকে লাঞ্ছনাগঞ্জনা কিছু কম সহ্য করতে হয়নি। অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাবাপন্ন না হয়েও তিনি অনলসভাবে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন, সমাজ সেবা ও ধর্ম সংস্কারের কাজ করেছেন।

১৮৯৮ সালে যাত্রা মোহন বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন, তার ফলে বছরের একটা সময় তাঁকে কলকাতায় কাটাতে হত। কলকাতার কল-কোলাহলের মধ্যে, চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যস্ততায়, এমন কি বরমা গ্রামের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশেও এই অক্লান্তকর্মার কাজের কোনো বিরাম ছিলনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ছেলেবেলা ও কেম্‌ব্রিজ

যতীন্দ্র মোহনের জন্ম হয় ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ সনে, ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী তিথিতে। ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন দীর্ঘ সুঠাম দেহ প্রিয়দর্শন বালক। খেলাধুলায় তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। পরিণত বয়সে খেলাধূলোর উন্নতিকল্পে একাধিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেছিলেন—তার মধ্যে কলকাতার সাউথ ক্লাব ও লেক ক্লাব উল্লেখযোগ্য। সবাই তাঁকে বলত কলকাতার ক্রীড়ামোদী মেয়র।

যতীন্দ্র মোহনের যখন বছর পাঁচ বয়স, তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে। কিন্তু মা বিনোদিনী তাঁর এই তৃতীয় সন্তানকে অত্যধিক স্নেহ করতেন বলে অল্প বয়সে তাঁকে আর স্কুলে দেওয়া হয়নি। বছর দুই একজন গৃহশিক্ষক এসে বাড়িতেই তাঁকে পড়িয়ে যেতেন। সাত বছর বয়সে তাঁকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে দু'বছর থাকার পর বিনোদিনী তাঁর নাম কাটিয়ে চট্টগ্রাম সহরে নিয়ে আসেন এবং সেখানকার হাজারী স্কুলে নাম লেখান। এটি ছিল মধ্য ইংরেজী স্কুল—এখানে ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে পড়ত। অতঃপর হাজারী স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যতীন্দ্র মোহনকে ভর্তি করা হয় চট্টগ্রামের কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানে তিনি বছর দুই ছিলেন। এখানে এসে খেলাধুলোয় তাঁর আগ্রহ এমন বৃদ্ধি পায় যে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে থাকতেন। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে একটি ফুটবলের টীমও গঠন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দু দু'জন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয় তাঁকে দিয়ে নিয়মিত পাঠ অভ্যাস করার জন্য। খেলাধুলোর টানে এই দু'জন নিরীহ মাষ্টারের চোখে ধুলো দিয়ে যতীন্দ্র মোহন প্রায়ই পালাতেন। শেষ পর্যন্ত মাষ্টারদের নালিশ গিয়ে পৌঁছিল বিনোদিনী দেবীর কাছে। তিনি এবার শক্ত হাতে তাঁর আদুরে ছেলের শিক্ষার ভার নিলেন।

মায়ের কাছে তবু আদর আবদার চলত, বাবাকে কিন্তু যতীন্দ্র মোহন খুবই সমীহ করে চলতেন, তাঁর কথা অমান্য করার মতো সাহস ছিল না।

যাত্রা মোহনের বিশেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর একটি ছেলে ভালো ব্যারিষ্টর হিসাবে নাম করে। যতীন্দ্র মোহনের মধ্যে তিনি সেই সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই যখন ছেলের বয়স তেরো এবং তিনি নিজে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, যতীন্দ্র মোহনকে সঙ্গে করে তিনি এলেন কলকাতা এবং ভবানীপুর সাউথ সাবার্বন স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন। পরে তাঁকে দিয়েছিলেন হেয়ার স্কুলে—সেখানে থেকেই যতীন্দ্র মোহন এনট্রান্স পাশ করেন। হেয়ার থেকে এবার গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই সময়টা ছেলের পড়াশোনা তদারকি করার জন্যই সম্ভবত যাত্রা মোহন কলকাতায় একনাগাড়ে বছর দু'তিন ছিলেন। চট্টগ্রামে ফিরে যাবার পর তাঁকে বন্ধুরা অনেকে বলতে লাগলেন ছেলেকে বিলেত পাঠাতে। বিনোদিনী সেকথা কানে তুলতে চাইলেন না, যতীন্দ্র মোহন যে তাঁর নয়নের মণি, সে যদি সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর বিদেশে চলে যায় তিনি বিচ্ছেদ বেদনা সইবেন কেমন করে! অগত্যা বিলেত যাওয়া আপাতত স্থগিত রইল, যতীন্দ্র মোহন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়াশোনা করে চললেন। ছেলেরও কি ইচ্ছা হয় অমন স্নেহময়ী মাকে ছেড়ে যেতে?

পরে বিলেত যাত্রা ঘটল একটু অন্যভাবে। জেঠতুতো দাদা সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিলেত যাবেন বলে সব ঠিক। কিন্তু যাবার কিছুদিন আগে তাঁর বাবার মৃত্যু হল। মা তো এই অবস্থায় কিছুতেই সতীশচন্দ্রকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। অনেক বলাকওয়ার পর শেষ পর্যন্ত বললেন যতীন্দ্র মোহন যদি দাদার সঙ্গে যায় তাহলে তাঁর অমত নেই। শেষ পর্যন্ত ১৯০৪ সনের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে দু'জনা একসঙ্গে একই জাহাজে পাড়ি দিলেন। বিদেশে লেখাপড়া করার মতো সতীশচন্দ্রের সঙ্গতি ছিল না। যাত্রা মোহনই তাঁর সব খরচ-খরচা দিতেন। ছাত্র হিসাবে সতীশচন্দ্রের সুনাম ছিল। বিলেতের পরীক্ষা পাশ করে তিনি কলকাতায় এসে বসেন এবং সুযোগ্য সার্জেনরূপে তাঁর বেশ নাম

হয়। উপার্জন করে তিনি যাত্রা মোহনের দেওয়া সব টাকা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। ছেলেকে বিদায় দেওয়া বিনোদিনীর পক্ষে হয়েছিল মর্মান্তিক, দেশে ফিরে যতীন্দ্র মোহন তাঁর মাকে আর দেখতে পাননি।

বিলেত গিয়ে কেম্‌ব্রিজের ডাউনিং কলেজে যতীন্দ্র মোহন ভর্তি হলেন। সেখানে তাঁর এক ইংরেজ বন্ধু ধরে বসলেন তাঁকে আই.সি.এস. পরীক্ষায় বসতেই হবে। সেকালে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের কাছে সিভিলিয়ান হওয়া বিশেষ গৌরবের বলে মনে হত। কিন্তু যাত্রা মোহন বেঁকে বসলেন, তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিলনা যে ছেলে তাঁর সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরে এসে ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার হবে। তাঁর বাসনা ছিল যতীন্দ্র মোহন স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করবেন এবং দেশের ও দশের সেবা করবেন। ইংরেজ বন্ধুটি যাত্রা মোহনের বক্তব্য ঠিকই বুঝেছিলেন এবং সিভিলিয়ান হবার প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করেননি।

কেম্‌ব্রিজে পা দিয়ে যতীন্দ্র মোহন বুঝেছিলেন প্রাচ্যদেশের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রাচ্যদেশে কেবল বুদ্ধি বৃত্তি ও সেই সঙ্গে মুখস্থ বিদ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিমে মনের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে শরীর চর্চার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। খেলা-ধুলোকে কেম্‌ব্রিজ যে পড়াশোনার পরিপন্থী বলে মনে করে না বরং পরিপূরক বলে মনে করে, ভালো ছাত্র সেখানে যেমন সম্মান পান ভালো খেলোয়াড় তার চেয়ে কম সম্মান পান না—এইসব দেখে যতীন্দ্র মোহন খুব খুশী হয়েছিলেন, বুঝেঝিলেন কেম্‌ব্রিজে তাঁর স্বভাবগত খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট স্ফুর্তিলাভ করবে। চট্টগ্রামে বসে যাত্রা মোহনের বরঞ্চ আশঙ্কা হয়েছিল খেলার ঝোঁকে ছেলে না আবার লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়। কিন্তু তেমন আশঙ্কার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না, দেখা গেল যতীন্দ্র মোহন খেলাধুলো ও লেখাপড়া উভয় ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শিতা দেখাতে লাগলেন। ক্রিকেট ও টেনিসে তিনি কেম্‌ব্রিজের সব খেলোয়াড়ের একজন হিসাবে য়ুনিভার্সিটির 'ব্লূ' লাভ করলেন। নৌকা

বাইচেও তাঁর উৎকর্ষ ছিল প্রশংসনীয়। ওদিকে ইণ্ডিয়ান মজ্‌লিসের বিতর্ক সভাতেও তিনি বেশ নাম করলেন, শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের এবং ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। কেম্‌ব্রিজে তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন গুরু সদয় দত্ত। ইনি সিভিলিয়ান হয়েছিলেন এবং ব্রতচারী সমিতির প্রতিষ্ঠাতারূপে সুনাম অর্জন করেছিলেন। হ্যারো থেকে বেরিয়ে ১৯০৭ সনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন কেম্‌ব্রিজে ভর্তি হন, সে সময় তাঁর সঙ্গেও যতীন্দ্র মোহনের দেখাশোনা হয়েছিল।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সনের মধ্যে ভারতের ঘটনাবলী নিয়ে বিলেতের কিছু লোক মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। বিলিতী কাগজে এইসব ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ না দিলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে ভারতে যে সব কাণ্ড ঘটছিল সেগুলি হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংকে দীপান্তর দণ্ড দেবার ফলে তখন বাংলার অধিকাংশ লোক বিক্ষুব্ধ।

বর্হিভারতের ভারতীয়েরা এই প্রথম শুনতে পেলেন টিলকের নাম, ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করার কথা ও স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে জওহরলাল লিখেছেন, তিনি যখন হ্যারোর ছাত্র, ছুটিছাটা ছাড়া অপর কোনো সময়ে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতই হত না। খবরের কাগজে ভারতের বিষয়ে দু'চারটে খবর পড়তেন কিন্তু তাই নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন তার কোনো জো ছিল না। এই বহু লোকের মধ্যে একলা থাকার বিষাদ মাঝে মাঝে তাঁর সমস্ত মন অধিকার করে থাকত। কেমব্রিজে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ১৯০৭ সনে, এবং সেখানে তিন বছর থেকে বিজ্ঞানে ট্রাইপস হয়ে পাশ করেন। যে বছরে তিনি কেম্‌ব্রিজ গেলেন, সেই বছরেই ভারতে বিদ্রোহের ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে লেগেছে যেমন জ্বলেছিল সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ সনে। টিলকের কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষকে নিয়ে বোমার মামলা এবং বাংলা দেশের জনসাধারণের ব্যাপক ধর্মঘট ও বয়কটের কথা—বিলেতের ভারতীয় সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কেম্‌ব্রিজের ইণ্ডিয়ান

মজলিস্ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সমস্যাবলী বিচার করে বলে তখন তার খুবই নামডাক। এই সময়েই বিপিন চন্দ্র পাল, লাজপত রায় ও গোপাল কৃষ্ণ গোখলের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা কেম্‌ব্রিজে বেড়াতে এসেছিলেন। নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে * লিখেছেন, "কেম্‌ব্রিজে আমার সমসাময়িক ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা পরে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমি ভর্তি হবার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা সমাপ্ত করে চলে যান। সেফুদ্দীন কিচ্‌লু, সৈয়দ মাহ্‌মুদ ও তাসাদ্দুক আহ্‌মদ শেরওয়ানী—এঁরা ছিলেন মোটামুটী আমারই সমসাময়িক।"

সুতরাং দেখা যায় যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গী সাথী যাঁরা ছিলেন কেম্‌ব্রিজে, তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বাধীনতা অনুরাগী। আইন ট্রাইপসের প্রথম ভাগ তিনি পাশ করেন ১৯০৭ সনে, ডিগ্রী পাবার জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম তিনি শেষ করেন ১৯০৮ সনে এবং পরের বছর এল.এল.বি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি গ্রেইজ্ ইন্-এর সদস্য ছিলেন বলে ব্যারিষ্টর হবার আনুষ্ঠানিক আচার ও নিয়ম তাঁকে লণ্ডন সহরে এসে পালন করতে হয়। ১৯০৯ সনে ব্যারিষ্টরি পাশ করে যতীন্দ্র মোহন স্বদেশে ফিরে আসেন।

---

* *An Autobiography*, by Jawaharlal Nehru, John Lane, The Bodley Head, London, 1936, p. 22.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

কেম্‌ব্রিজে থাকতেই যতীন্দ্র মোহন তাঁর জীবন সঙ্গিনীর পরিচয় লাভ করেছিলেন। কন্যাটির নাম ছিল নেলী গ্রে। মা মিসেস গ্রে-র স্বভাব ছিল সন্তানবৎসল মায়ের মতো—স্নেহে মমতায় পরিপূর্ণ। ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ দরদ। বেচারারা ঘর ছাড়া হয়ে সুদূর বিদেশে নিঃসঙ্গ হয়ে আছে—তাই তাঁদের প্রতি মমতাপরবশ হয়ে কখনো কখনো চায়ের নেমন্তন্ন করে তাঁদের খাওয়াতেন। যতীন্দ্র মোহন এইভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে একদিন গ্রে পরিবারের বাড়ি আসেন। তারপর থেকে নিত্যই তাঁর সে বাড়িতে যাতায়াত। ক্রমে নেলীর প্রতি তাঁর আসক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে, নেলীর মা-বাবা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান নেলী যদি একজন ভারতীয়কে বিবাহ করে ঘর ছেড়ে দূর দেশে চলে যায়—সে তো তাঁরা সহ্য করতে পারবেন না। অপর পক্ষে যতীন্দ্র মোহন যখন তাঁর বাবাকে একটি ইংরেজ তনয়ার পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন, যাত্রা মোহনও এই মর্মে আপত্তি তুললেন যে ছেলে সদ্য ব্যারিষ্টারী পাশ করেছে যদিচ, বিদেশিনী পত্নীর ভরণপোষণের মতো অর্থ সঙ্গতি হতে তার এখনো অনেক দেরী। তাছাড়া বিদেশিনী বিবাহ করলে ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকেও নানা হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে। সুতরাং দেশ থেকে চিঠি গেল বিবাহের সঙ্কল্প পরিহার করে যতীন্দ্র মোহন যেন অগৌণে দেশে ফিরে যান। কেবল ছেলেকে নয় মিসেস্ গ্রে-র নামেও যাত্রামোহন চিঠি লিখে এই বিবাহ প্রস্তাবের বিপক্ষে তাঁর তিনদফা আপত্তির কথা তুললেন। প্রথম দফায় উভয় পক্ষের ধর্মীয় পার্থক্যের কথা বললেন ; দ্বিতীয় দফায় বললেন যে ভারতের যৌথ পরিবার পরিবেশে একান্নবর্তী বহু আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করা ইংরেজ মেয়ের পক্ষে সুখকর নাও হতে পারে ; তৃতীয় দফা আপত্তির বিষয় এই যে যতীনের নিজস্ব কোনো

অর্থ সঙ্গতি নেই এবং ব্যারিষ্টারি পেশায় সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া তার পক্ষে সময়সাপেক্ষ। শেষ পর্যন্ত এই আশা প্রকাশ করলেন যে বিবাহের বিপক্ষে এই তিনদফা যুক্তির সারবত্তা মিসেস্ গ্রে নিশ্চয় স্বীকার করবেন। মিসেস্ গ্রে-র আপত্তির প্রধান কারণ আর কিছু নয়—একমাত্র সন্তান নেলী যেন তাঁদের কাছছাড়া হয়ে সুদূর বিদেশে চলে না যায়। মিসেস্ গ্রে-র জবাব পেয়ে যাত্রা মোহন সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখলেন যতীন্দ্র মোহন যেন পত্রপাঠ স্বদেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর ফিরতি জাহাজের টিকিট বাবদ টাকাও পাঠিয়ে দিলেন যতীন্দ্র মোহনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের নামে। নেলী ও যতীন্দ্র মোহন দু'জনেই নিজ নিজ বাবা মার কাছ থেকে জানলেন যে এ বিয়ে হবার নয়। যে মেয়েকে এত গভীর ভাবে ভালবেসেছেন এখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্তপ্ত চিত্তে যতীন্দ্র মোহন স্বদেশগামী জাহাজে পাড়ি দিলেন।

সমুদ্র পথে এক একটি দিন যায়, বিলেত থেকে যত দূরে যান ততই যেন বিদায় বেলায় নেলীর অশ্রুসজল মুখখানি মনে পড়তে থাকে, বিচ্ছেদ বেদনায় যতীন্দ্র মোহন বড়ই কাতর বোধ করেন। আবার কি কখনো ফিরে আসতে পারবেন বিলেতে, আর কি কখনো দু'জনের দেখা হবে? এই রকম নানা চিন্তায় অনেকগুলি বিনিদ্র রজনী কেটে গেল সমস্যা সমাধানের বৃথা উপায় অন্বেষণে। অবশেষে জাহাজ যখন পোর্ট সৈয়দ পৌঁছল তিনি মনে মনে স্থির করলেন—নেলীর প্রতি প্রেমের দায়িত্ব তাঁকে যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেই পথে চলা ছাড়া তাঁর অন্য উপায় নেই। আর সমস্ত চিন্তা ভাবনা অবান্তর। পোর্ট সৈয়দ পৌঁছে দেখলেন বন্দরে বিলেতগামী একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝলকে আপন কর্তব্যে স্থির সঙ্কল্প হয়ে যতীন্দ্র মোহন সেই জাহাজে উঠে পড়লেন, মনে মনে ঠিক করলেন আর কোনো কথা চিন্তা না করে বিলেতে গিয়ে নেলীর পাণি গ্রহণ করা আপাতত তাঁর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

প্রেমাস্পদের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাগমনে নেলী গ্রে-র হৃদয় যে কী গভীর আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল—সে তো সহজেই অনুমেয়। কন্যার এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাব

দেখে মিসে গ্রেস্ বড় অসহায় বোধ করতে লাগলেন, দুশ্চিন্তার আতিশয্যে তিনি নেলীকে শাসালেন পর্যন্ত এই বলে যে যতীন্দ্র মোহনকে সে যদি বিবাহ করে তা হলে তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা দূরের কথা তাকে একটি পয়সাও দেবেন না। তখন যতীন্দ্র মোহন তাঁকে অনেক করে বোঝাতে চাইলেন জাহাজে কটা দিন কী রকম অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে—বার বার নিজেকে বোঝাতে চেয়েছেন যে ইংরেজ মেয়ে বিবাহ করা তাঁর কোনো ক্রমেই উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কিন্তু নিজের কাছেই হার স্বীকার করতে হয়েছে, তিনি সম্যক বুঝতে পেরেছেন এবার কালবিলম্ব না করে নেলীকে যদি তিনি বিবাহ না করেন তা হলে এ বিবাহ কোনো কালেই ঘটবে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েও নেলীর মা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্মতি দিলেন না, তখন কেম্ব্রিজ থেকে মাইল পনের দূরে রয়ষ্টন্ সহরের এক রেজিষ্ট্রি অফিসে নেলী ও যতীন্দ্র মোহন গোপনে পরিণয়বদ্ধ হন। বিবাহের পর তাঁরা মিসেস্ গ্রে-কে সব কথা জানালেন। তিনি বিচলিত হলেন খুবই, কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মমতার বসে অনিবার্য পরিস্থিতিটুকু স্বীকার করে নিয়ে নববিবাহিত দম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন, প্রচুর উপহার দিলেন দু'জনকে এবং তাঁদের সংবর্ধনায় একটি ভোজ সভার আয়োজন করে কয়েক জন আত্মীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করলেন।

এদিকে তো যাত্রা মোহন পুত্রের প্রত্যাবর্তন আশায় দিন গুণছেন, মনে তাঁর দুশ্চিন্তার অবাধ নেই। যে জাহাজে যতীন্দ্র মোহনের ফেরবার কথা, সে জাহাজ দেশের বন্দরে নোঙর ফেলল, কিন্তু যতীন্দ্র মোহনের দেখা নেই। পিতা চিন্তিত হয়ে কেম্ব্রিজে তারবার্তা পাঠালেন, কারণ অল্প কিছু কাল আগেই পুত্রের চিঠিতে জেনেছেন পিতৃ-আজ্ঞা ও নেলীর প্রতি সুগভীর প্রেম—এই দুয়ের দোটানার মধ্যে তিনি কী মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। বিবাহের প্রায় অব্যবহিত পরেই নব-পরিণীতা ইংরেজ বধূকে নিয়ে যতীন্দ্র মোহন আবার একবার স্বদেশের পথে পাড়ি দিলেন। মা ও মেয়ে চোখের জলে বিদায় নিলেন পরস্পরের কাছ থেকে। একমাত্র সন্তান সুদূর বিদেশ চলে যাচ্ছে, আপনার বলতে কেউ

আর কাছে থাকবে না—এইসব কথা ভেবে তিনি একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন।

যতীন্দ্র মোহন তাঁর নব-পরিণীতা বধূকে নিয়ে তো দেশে পৌঁছিলেন। যাত্রা মোহন ও পরিবারের অন্য সকলের মনে 'মেমবৌকে' নিয়ে যেসব দ্বিধাসংকোচ ভয় বা সন্দেহ ছিল, নেলীকে দেখে ও তাঁর আচরণে সে সমস্ত অতি সহজেই কেটে গেল। নেলী পাঁচজনের একজন হয়ে, পরিবারের সকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে সুখে ঘরসংসার করতে লাগলেন। কয়েক মাস কেটে যাবার পর যাত্রা মোহন মিসেস্ গ্রে-কে চিঠি লিখে জানালেন নেলী যে তাঁর পুত্রবধূ হয়ে তাঁর গৃহ পরিবারে এসেছেন—এতে তিনি খুবই খুশি।

অনেক বছর পরে, ১৯২৫ সনে, যতীন্দ্র মোহনের সর্বকনিষ্ঠ ভাই রণেন্দ্র মোহন যখন কেম্‌ব্রিজে পড়তে যান, মিসেস্ গ্রে আপন ছেলের মতো স্নেহে ও সমাদরে তাঁর দেখাশোনা করতেন। যতদিন মিসেস্ গ্রে বেঁচে ছিলেন, নিয়মিত চিঠিপত্র লিখে নেলী সর্বদা মায়ের খবরাখবর রাখতেন। যতীন্দ্র মোহন ও নেলী যখন ১৯২৩ সনে তাঁদের দুই ছেলে শিশির ও অনিলকে সঙ্গে করে বিলেত যান, মেয়ে জামাই ও নাতিদের দেখে মিসেস্ গ্রে-র কি আনন্দ। ১৯০৯ সনে বিবাহের পর সেই হল নেলীর প্রথম বিলেত যাওয়া। যতীন্দ্র মোহন তখন দেশের নেতা, ভারতজোড়া তাঁর নাম—জামাতার কৃতিত্বে শাশুড়ি আনন্দে ও গর্বে অধীর হয়েছিলেন। যতীন্দ্র মোহন ও নেলী আবার একবার বিলেত গিয়েছিলেন ১৯৩১ সনে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহজীবন ও কর্মজীবনের সূচনা

কেমব্রিজ থেকে বি. এ. ও এল. এল. বি. পরীক্ষা পাশ করে, লণ্ডনের গ্রেইজ্ ইন্ থেকে ব্যারিষ্টারের সনন্দ লাভ করে যতীন্দ্র মোহন দেশে ফিরেছিলেন পুরোদস্তুর ব্যারিষ্টার হয়ে। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে প্র্যাকটিস্ শুরু করার আগে একটা বছর তিনি চট্টগ্রাম সহরেই ছিলেন। সে একটা বছর এক হিসাবে বলা যায় দীর্ঘায়িত মধুচন্দ্র যাপন। অপর দিক থেকে বলা যায় যে সেই অবসরে বিদেশিনী নেলী এ দেশকে এবং বিশেষত একান্নবর্তী সেনগুপ্ত পরিবারকে ভালো করে চেনবার জানবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। অচিরেই বাড়ির এই নতুন বৌটি পরিবারের মধ্যে নিজের আসনটুকু রচনা করে নিলেন। তারপর ১৯১০ সনের ১১ই মে তারিখে যখন প্রথম খোকা হয়ে শিশির তাঁর কোলে এল—তখন যাত্রা মোহনের কাছেও বৌমায়ের সমাদরের সীমা রইল না। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এই বিদেশিনীকে বাড়ীর বধূ করে এনে যতীন্দ্র মোহন ভুল করেননি, কালে নেলী হিন্দু সমাজের সাধ্বী স্ত্রীর মতো স্বামীর সত্যকার সহধর্মিনী হতে পারবেন। চট্টগ্রাম সহরে প্রায় এক বছর কাটিয়ে যতীন্দ্র মোহন সপরিবার কলকাতায় চলে এলেন হাই কোর্টে প্র্যাকটিস্ করার জন্য। তাঁর তখন টাকার টানাটানি, ব্রীফ্ নিয়মিত পাচ্ছেন না সুতরাং প্রথম দিকে তাঁদের ছোট ছোট ফ্ল্যাট বাড়ীতে থাকতে হয়েছে। শুরুতে তাঁরা ছিলেন ল্যান্সডাউন রোডে, পরে যান রায় স্ট্রীটে। ঢিমে তেতালায় জীবন চলছে, বিশেষ কোনো উত্তেজনা নেই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের হট্টগোল শেষ হয়ে থিতিয়ে গিয়েছে। মডারেট পন্থীরা আবার দেশের আশা-আকাঙ্খার ধারক-বাহক হয়ে হাল ধরেছেন।

একটু একটু করে প্র্যাকটিস্ জমতে লাগল, ব্যারিষ্টার হিসাবে পসার হল। কিন্তু ফী থেকে উপার্জন এমন নয় যে তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে। আয় বৃদ্ধির জন্য যতীন্দ্র মোহন রিপন ল কলেজে লেকচারারের পদ গ্রহণ করলেন।

এই সময়েই কনিষ্ঠ ভাই রণেন্দ্র মোহনকে তিনি চট্টগ্রামে থেকে নিজের কাছে আনলেন। দাদাতে ভায়েতে একুশ বছরের ব্যবধান, যতীন্দ্র মোহনের ইচ্ছা ভাই যেন তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গে মানুষ হন। কলকাতায় তাঁর আরো দুটি ছেলে হয়—মেজো অমর বাল্যেই মারা যায়।

কলকাতার গৃহজীবন যতীন্দ্র মোহনের পক্ষে খুবই মধুর হয়েছিল। দেশপ্রেম ও রাজনীতির টানে তিনি তখনো তো ঘরছাড়া হননি। টেনিস ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। বাড়ির হাতার মধ্যে একটা টেনিসের মাঠ ছিল বলে প্রায়ই তিনি বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এনে টেনিস খেলতেন। ঘরের বাইরে টেনিস এবং ঘরের ভেতরে ব্রীজ খেলা—এই দুটি নিয়ে তিনি বেশ মশগুল থাকতেন। ব্রীজ খেলতে হলে পার্টনার চাই—স্ত্রীকে তিনি তাই ব্রীজ খেলা শেখাতে বসলেন। কিন্তু নেলী কিছুতেই শিখে নিতে পারলেন না। একদিন হল কি—যে রঙ খেলা হচ্ছে সে রঙের তাস নেলীর হাতে নেই। তিন হাত খেলার পর চতুর্থ হাতে নেলীর দান—তিনি জিজ্ঞাসুভাবে যতীনের দিকে তাকালেন। যতীনের টেক্কাটাই যে সে দানের সবচেয়ে বড় তাস—সে তাঁর মাথায় ঢুকলনা। যতীনও ঠাট্টা করে বললেন, 'দাও একটা তুরুপ ঠুকে'। স্বামীর কথায় নেলী সত্য সত্য তুরুপ করলেন দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি—সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নেবার পর নেলী নিজেও হাসলেন কিছু কম নয়। নেলী সহজ খুশী মানুষ ছিলেন, হাসিঠাট্টা ভালোবাসতেন, নিজে ঠাট্টার পাত্র হলে আমোদ পেতেন—চটতেন না।

যতীন্দ্র মোহন একাধিক ক্লাবের মেম্বার হলেন—তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ক্যালকাটা ক্লাব ও ওরিয়েন্ট ক্লাব। নিজে তিনি দিলদরিয়া মানুষ সুতরাং তাঁর বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। এঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের দাদা সুবোধ চন্দ্র। খেলাধূলো, মেলামেশা ছাড়া আর যে জিনিযটি যতীন্দ্র মোহনের বিশেষ প্রিয় ছিল সে হল বই পড়া। তাঁর এই বই পড়ার শখ অনেকখানি মিটত হাই কোর্টের বার লাইব্রেরিতে। পরবর্তী কালে যখন মাসের পর মাস তাঁকে

জেলখানায় কাটাতে হয়েছে, বই পড়া ছিল তাঁর সময় কাটানোর প্রধান অবলম্বন।

পূজোর ছুটির সময় প্রতি বছর যতীন্দ্র মোহন সপরিবারে দেশে যেতেন প্রথমে চট্টগ্রাম পরে বরমা গ্রামে। যাতায়াত করতে হত নদী পথে। কর্ণফুলী নদী দিয়ে বজরায় যেতে হত। কর্ণফুলী থেকে অনেকগুলি খাল পেরিয়ে নৌকা পড়ত শঙ্খ নদীতে। বরমার ঘাটে বজরা এসে লাগত ভোর বেলায়—বোধনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে। ঘাট থেকে বাড়ি যেতে হত আলে আলে—ধানখেতের মধ্য দিয়ে। গ্রামে তখন উৎসবের ধূম—চারিদিকে ছুটির আনন্দ। পূজামণ্ডপে সাজ-সজ্জার কী ঘটা! পূজোর আনুসঙ্গিক ছিল যাত্রা গান, হাডুডু ও কুস্তি খেলা, কবিগান ও তরজা, সাঁতার ও নৌকাবাইচ। বৎসরান্তে ঐ একটিবার ছড়িয়ে পড়া পরিবারের মানুষ গ্রামে এসে নিজ নিজ বাড়ীতে একত্র হয়ে আমোদ আহ্লাদ করত। যাত্রা মোহন নিজে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হবার পর বাড়ীতে দুর্গাপূজা আর হতনা বটে, কিন্তু আশপাশ থেকে উৎসব আনন্দের ছোঁওয়া অবশ্যই এসে লাগত সেনগুপ্তদের বাড়িতেও। বাড়িতে পূজো হতনা বলে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পূজো দেখতে যেত যতীন্দ্র মোহনের জেঠতুতো দাদা ডক্টর সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্তের বাড়ী। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তখন দু'বাড়ীতে আর তফাৎ থাকতনা। হয় এ বাড়ীতে নয় তো ও বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের পাত পড়ত। আর খাওয়া হত যেমন তেমন নয়—নেমন্তন্ন বাড়ির ভোজ। পূজোর মরসুমে চাষী প্রজারা কেউ কেউ সম্বৎসরের বকেয়া খাজনার পরিবর্তে জমিদার বাড়িতে মাছটা, পাঁঠাটা কিংবা তরিতরকারী ভেট আনত। গোমস্তারা মূল্য ধরে জমার খাতায় লিখে নিয়ে বাকী খাজনার দায় থেকে তাদের রেহাই দিয়ে দিতেন। বরমা গ্রামটি আয়তনে ছোট—এর বেশিরভাগ অধিবাসী হিন্দু, জমিদারও হিন্দু। বরমার আশেপাশে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বসবাস করত মুসলমানরা—তাদের অনেকেই ছিল হিন্দু জমিদারদের প্রজা। সংখ্যায় অধিক হলেও মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিবেশীর মতোই আচরণ করত। দুই

সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। হিন্দুদের পূজাপার্বণে মুসলমানদের যোগ দিতে বাধত না, হিন্দুরাও মুসলমানদের উৎসবে পরবে সানন্দে যোগ দিত। তখনকার দিনে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের লেশমাত্র দেখা যেত না। উভয় সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার সংস্কার নির্বিবাদে পালন করত। পূজার শেষে সেনগুপ্ত পরিবারের অনেকেই ফিরে যেতেন চট্টগ্রামে।

সহরে ফিরেই যাত্রা মোহন তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস অনুসারে ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে সকাল নটা অবধি একটানা কাজ করতেন। সেই সময় মক্কেল আসত এবং সেদিন যেসব মামলার শুনানী হবার কথা—সেই সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ ও নথীপত্র তিনি পড়ে নিতেন। তারপর স্নানাহার শেষ করে তিনি যেতেন কাছারী। চট্টগ্রামের কোর্ট ছিল একটি টিলার উপর অবস্থিত। সেখানকার ছাদ থেকে দেখা যেত সমস্ত সহরটা, গাছপালা, ঘরবাড়ি, খালবিল, নদীনালা সবকিছু, দেখা যেত ব্রহ্ম দেশের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরাকানের পর্বতমালা।

ছুটির শেষে যতীন্দ্র মোহন সপরিবারে কলকাতায় ফিরে আসতেন। তখনো তাঁর গৃহপরিবার রাজনীতির আবর্ত থেকে মুক্ত ছিল বলে ছুটিতে অনাবিল শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করায় বাধা ছিল না। সে সময় যতীন্দ্র মোহন তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে খেলাধুলো হৈ-হল্লা করতে খুবই ভালবাসতেন। ছোট ভাই রণেন্দ্র মোহনকে ইতিমধ্যে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে—১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তবে ছুটি হলেই রণেন্দ্র মোহন চলে আসতেন তাঁর দাদার বাড়ী, তখন খেলা আরও ভালো জমত। শান্তিনিকেতনের পাঠ সেরে রণেন কলকাতার কলেজে ভর্তি হলেন, সেই সময়ের স্মৃতি তাঁর মনে এখনো উজ্জ্বল। তাঁর মুখে শুনেছি প্রতি রবিবার সকালবেলা যতীন্দ্র মোহন ছেলেদের সবাইকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, গাড়ি হাঁকিয়ে। গাড়ী যেদিন স্ট্র্যাণ্ড রোড পার হয়ে আউট্রাম

ঘাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াত, ছেলেরা কি খুশিই না হত! সেখানে হুগলী নদীর ঠিক উপরেই একটি রেস্তোরাঁ ছিল—সে রেস্তোরাঁর আইসক্রীম খেয়ে মনে হত যেন অমৃত। তারপর গার্ডেনে গিয়ে গাছে চড়া, খেলাধুলো, হুটোপাটি। আবার কখনো নিরিবিলি বসে ইডেনের ছোট ছোট লেক-এ পদ্ম ফুলের নাচ দেখেও অনেকটা সময় কেটে যেত। বাড়ী ফেরা হত ঠিক প্রাতরাশের আগে। তারপর ঘরে বসে ব্রে, লুডো কিংবা ক্যারম খেলা। সারা বৈঠকখানা সেদিন ছেলেদের আনন্দ কোলাহলে সরগরম থাকত। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবেরাও কখনো কখনো বেড়াতে আসতেন। মেজ মামা হেম খাস্তগীর যেদিন সপরিবারে আসতেন ছেলেদের আনন্দের অবধি থাকত না—সেনগুপ্ত বাড়িতে তাঁর খুব সমাদর ছিল কারণ তিনি আমুদে মানুষ ছিলেন ও জমাতে পারতেন।

দেশের রাজনীতিক জীবনে যতীন্দ্র মোহনের প্রথম প্রবেশ ঘটে ১৯১১ সনে। সে বছর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ফরিদপুর কনফারেন্সে যোগদান করেন। পরের বছর কনফারেন্স যেন চট্টগ্রামে বসে—এই মর্মে যতীন্দ্র মোহন একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। চট্টগ্রাম কনফারেন্সে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন মিঃ এ রসুল। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন যাত্রা মোহন। বিশেষ অভ্যাগতদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—তাঁর অভ্যর্থনা হয়েছিল জমকালো রকম। যে ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁকে সভাস্থলে প্রচুর বাদ্যভাণ্ড সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে গাড়ি টেনেছিল সহরের উৎসাহী যুবকেরা। যতীন্দ্র মোহনের তখন বয়স অল্প—খুব কম লোকই তখন তাঁর কদর বুঝত। তাঁর যা কিছু নামডাক সে তিনি যাত্রা মোহনের ছেলে বলে। সে যাই হোক দেশের কাজে স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ তিনি কনফারেন্সের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ লক্ষ্য করেছিলেন, প্রত্যেকটি অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯১৪ সনে। তখন ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইনে ইংরেজরা ভারতের মুক্তিকামী বহু ভারতীয়কে হয় জেলে পাঠিয়েছে নয়

তো অন্তরীণ করেছে। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী কুতুবদিয়া দ্বীপে বেশ কিছু লোককে অন্তরীণ করা হয়েছিল। লাইন দিয়ে চালাঘর বেঁধে তাদের রাখা হয়েছিল। কিন্তু অন্ন-বস্ত্র কিংবা রোগের চিকিৎসার জন্য কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না। ফলে বন্দীদের মধ্যে অল্পে অল্পে অনেকখানি অসন্তোষ জমে উঠেছিল। কিন্তু নালিশ অভিযোগ করার মতো লোক কোথায়? প্রহরার জন্য যাদের রাখা হয়েছিল তারা তো ইংরেজ প্রভুদের হুকুমের চাকর মাত্র। কেউ তো তাদের বলে দেয়নি যে বন্দীদের সুখ-সুবিধার দিকে তাদের নজর দিতে হবে। যে অভিযোগের প্রতিকার নেই সে অভিযোগ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে পর্বত প্রমাণ হয়। ক্রমে অবস্থা যখন অসহ্য হল, বন্দীরা নিজেদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করে স্থির করল প্রহরীদের অজান্তে নৌকায় করে তারা পালাবে ও খোদ চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে নালিশ জানাবে। নৌকা চট্টগ্রামের বন্দর সীমানায় পৌঁছুবার আগেই কুতুবদিয়ার পুলিশ তারবার্তা পাঠিয়ে সহরের কর্তৃপক্ষদের সাবধান করে দিয়েছিল যে বন্দীরা পালিয়েছে। জমিতে পা দেবার আগেই আবার তাদের গ্রেফতার করা হল ও তাদের বিরুদ্ধে নূতন করে নালিশ রুজু হল। অন্তরীণ বন্দীরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে অনুনয় জানিয়ে বলল তিনি যেন তাদের হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়েন, কারণ তারা জানত কেবল দেশব্রতীরূপে নয় ওকালতীতেও দেশবন্ধুর তুলনা মেলা ভার। তিনি চট্টগ্রাম এলেন, মামলাও লড়লেন সর্বশক্তিতে, কিন্তু কুতুবদিয়ার বন্দীদের মুক্ত করতে পারলেন না। আদালত হুকুম দিলেন তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

মামলা যখন হচ্ছে যতীন্দ্র মোহনও গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। সেই সময় যাত্রা মোহন ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে আলাপক্রমে কংগ্রেসের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষত সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য নরমপন্থী মডারেটদের বিরুদ্ধে তিনি খুব কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। এর অল্প কাল পরেই কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট রূপে অ্যানি বেশান্তকে নির্বাচন করা নিয়ে নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ নির্বাচনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন কিন্তু

অপরপক্ষ সংকল্পে দৃঢ় হয়ে বললেন যেন তেন প্রকারেণ অ্যানি বেশান্তকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে বসাতেই হবে। ইতিপূর্বেই অ্যানি বেশান্ত প্রতিষ্ঠিত হোম রুল লীগের প্রভাব দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, নানা সহরে লীগের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশজোড়া এই আন্দোলনের ধকল সইতে না পেরে, মাদ্রাজের প্রাদেশিক সরকার অ্যানি বেশান্ত, ওয়াদিয়া ও আরানডেল্‌কে অন্তরীণবদ্ধ করলেন। এর ফলে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেসের গরমপন্থী ও হোমরুল লীগের সদস্যেরা একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে লাগলেন। এই আন্দোলনের বিপক্ষে সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন, ঠিক হল কলকাতার টাউন হলে বক্তৃতা করে তিনি বুঝিয়ে দেবেন তাঁর বিরোধিতার যথার্থ কারণটা কি। কিন্তু টাউন হলে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল, বক্তৃতা দেওয়া তো দূরের কথা এক প্রকার জোর করেই সুরেন্দ্রনাথকে সভাস্থল থেকে বের করে দেওয়া হল। এই ঘটনার পর থেকে নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ তীব্রতর হতে লাগল, সেই যে ভাঙন শুরু হল আর জোড়া লাগল না।

রাজনীতিক দিক থেকে ভারতের পক্ষে ১৯১৭ সন ছিল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। সেই বছরেই ভারতের সেক্রেটারি অব ষ্টেট এডুইন মণ্টেগু তাঁর বিখ্যাত ঘোষণায় বললেন যে ব্রিটিশ সরকারের নীতি এই যেন ভারত ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পায়। সেই বছর নভেম্বর মাসে ভারতে এসে, ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহযোগক্রমে এ দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তিনি অনুসন্ধানাদি করেন, নেতৃস্থানীয় বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাতক্রমে দেশের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন। ছয় মাস একনাগাড়ে এ দেশে থাকার পর তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান। ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনের জুন মাসে। এর দু'মাস পরে বোম্বাই সহরে জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে কংগ্রেস রায় দেন যে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড

রিপোর্টে প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের খসড়া ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। বিশেষ অধিবেশনের এই মত ১৯১৮ সনের ডিসেম্বরে দিল্লীতে আহূত কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় সমর্থিত হয়।

১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সনের একটা বছরের মধ্যে আরো অনেক ঘটনা ঘটে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইন অনুসারে বহু বিপ্লবী তরুণকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েও, ইংরেজ শাসকের মনে স্বস্তি ছিল না, তাঁরা প্রচ্ছন্ন বিপ্লবের চিহ্ন দেখতে লাগলেন দেশের সর্বত্র। সেই বিপ্লবী ভাব দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার রৌলট কমিটি নিযুক্ত করলেন। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট বেরোবার কিছু কাল পরেই বের হল রৌলট কমিটির রিপোর্ট। সেই রিপোর্টের সুপারিশক্রমে সরকার ব্যবস্থাপক সভার সামনে দুটি বিল পেশ করলেন—এই দুটিই হল সেই কুখ্যাত রৌলট বিল। এই বিল অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিনা বিচারে কয়েদ করবার ক্ষমতা চেয়েছিলেন ভারত সরকার। বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত তার জনবল অর্থবল নিয়ে এগিয়ে এসেছিল বৃটিশ রাজের সাহায্যকল্পে। এখন বিনা বিচারে দণ্ড দিয়ে কি ইংলণ্ড তার প্রতিদান দেবে? হৃদয়হীন প্রভুশক্তির এই নির্লজ্জ আচরণে দেশময় বিক্ষোভ দেখা দিল। রৌলট বিল যখন রৌলট অ্যাক্ট-এ পরিণত হল, লোকে তার নাম দিল 'কালা আইন'। দেশব্যাপী হতাশা ও দুঃখের চরম ও মর্মান্তিক পরিণতি হিসাবে সংঘটিত হল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

১৯১৯ সনে বাংলার প্রাদেশিক কনফারেন্স বসল ময়মনসিংহে। দেশ জুড়ে তখন কী উত্তেজনা। কনফারেন্সের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হলেন যাত্রা মোহন সেনগুপ্ত। তাঁর তখন সত্তরের কাছাকাছি বয়স কিন্তু তবু দেশের ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন কেবলমাত্র প্রদেশের সবার সেরা লোকদেরই প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। দেশের সংকট মুহূর্তে তিনি ঠিক পথের দিশা দেবেন—সেই জন্যই তো তাঁর কাছে ডাক এসেছে। কেবল জরা নয়, তখন তাঁর জীবনে মৃত্যু শোকও

প্রবল হয়ে দেখা দিল। কনফারেন্স-এর অব্যবহিত পূর্বে বিলেতে পুত্র নীরেন্দ্র মোহন এবং চট্টগ্রামে কন্যা নলিনী অল্প সময়ের ব্যবধানে অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুজনিত শোকে বৃদ্ধ যাত্রা মোহন একেবারেই ভেঙে পড়লেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা তিনি দেননি।

ময়মনসিংহ কনফারেন্সের সভাপতিরূপে বক্তৃতা দেবার সময় স্বদেশ বিষয়ে তাঁর আজীবনসিদ্ধ প্রত্যয় ও ভাবনার কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ যাত্রা মোহন কম্পিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন: 'দেশের প্রতি প্রেমে কিংবা দেশের কাজে আত্মনিবেদনে আমি নিজেকে কারো চেয়ে ন্যূন বলে মেনে নিতে পারি না।' পরিণত বয়সের এই দেশপ্রেমী সেদিন যে কথা বলেছিলেন অনেকের মনেই তা গভীর দাগ কেটেছিল। কিন্তু অসুস্থ ও অশক্ত ছিলেন বলে লিখিত বক্তৃতার সবটুকু তিনি নিজে পড়তে পারেননি। পিতার পরিচয়ে পুত্র তখন বহু পরিচিত তাই উদ্যোক্তাদের অনুরোধে যতীন্দ্র মোহনই বাকী অংশটুকু পড়ে শোনান।

কনফারেন্স শেষ হবার কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতায় সামান্য রোগভোগের পর যাত্রা মোহন মারা যান ১৯১৯ সনের ২রা নভেম্বর তারিখে। পিতার মৃত্যুর ফলে যতীন্দ্র মোহনের পারিবারিক দায়-দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। চট্টগ্রামে জমিদারীর তদারকি, একান্নবর্তী ভাইবোন আত্মীয়-কুটুম্বের ভরণপোষণ এবং সেই সঙ্গে কলকাতায় নিজের পরিবারবর্গের দেখাশোনা—সমস্ত কর্তব্য তাঁর একার উপর পড়ল। অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করতে করতে চট্টগ্রাম বরমার বিষয় আশয়ের সবরকম ব্যবস্থাদি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণেই বিষয় আশয় তদারকির ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন তাঁর পিতার অনুগত অনুচর উমেশচন্দ্র নন্দীর হাতে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজনীতিক জীবনে প্রথম সাফল্য

যাত্রা মোহনের যে সময় মৃত্যু হয়, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে সেই সময়ে সমস্ত ভারতে একটা তুমুল আলোড়ন চলছে। অমৃতসরের এই শোকাবহ ঘটনায় ক্ষোভে দুঃখে সারা দেশের হৃদয় পরিপ্লুত। এতগুলি অসহায় মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে মারা ও পাইকারী হারে খুন করা—একই কথা। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য অথবা ডায়ারের কলঙ্ক স্খালন করার জন্য, হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত হলে পর বিদেশী শাসনের প্রতি ধিক্কার ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পেতে লাগল। আলাদা কমিটি নিযুক্ত করে কংগ্রেস নিজেরাই তদন্ত চালাবেন বলে স্থির করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করলেন, মহাত্মা গান্ধীও তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ পদক ব্রিটিশ সরকারের হাতে প্রত্যর্পণ করে অসহযোগের কার্যসূচি দেশের লোকের সামনে তুলে ধরলেন।

এই সংকট সময়ে সারা দেশ যাতে একটি সর্ববাদীসম্মত নীতি অনুসরণ করে চলতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ সভা আহূত হবে বলে স্থির হয়। তার কিছু কাল আগে লালা লাজপত রায় আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। বহু বছর আমেরিকায় থেকে সেখানকার জনমত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকুল করার জন্য তিনি বহুবিধ প্রচারকার্য চালিয়ে এসেছেন। স্থির হল কলকাতার এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়। যতীন্দ্র মোহন এই সভার অতিরিক্ত সেক্রেটারী মনোনীত হন। অসহযোগ নীতি প্রবর্তনের জন্য এই অধিবেশনটি কংগ্রেসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমর্থক ছিলেন দু'জন—বিপিন চন্দ্র পাল ও যতীন্দ্র মোহন। শেষ পর্যন্ত সংখ্যাধিক্যের সমর্থনক্রমে

গান্ধীজীর প্রস্তাবিত অসহযোগ নীতিই কার্যক্রমরূপে স্বীকৃত হয়। কংগ্রেসের পরবর্তী সভা বসে নাগপুরে—বিজয়রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিত্বে। তাঁর দলবল সব নিয়ে দেশবন্ধু এই অধিবেশনেও যোগ দেন এবং বলেন যে সত্যাগ্রহে তাঁর অনাস্থা নেই কিন্তু অসহযোগ কার্যক্রম অনুসারে কাউন্সিল বয়কট করা তাঁর মতবিরুদ্ধ। পরে অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ উপরোধ তিনি ঠেলতে পারেননি, এমনকি নিজেই অসহযোগ নীতির সমর্থনে প্রস্তাবও এনেছিলেন। সমবেত সকলে দেশবন্ধুর এই প্রকার কাণ্ড দেখে তো অবাক। বিপিন চন্দ্র পাল কিন্তু তখনো পর্যন্ত এই নীতি মেনে নিতে পারেননি। শেষে দেশবন্ধুর সমর্থন লাভ করে গান্ধীজীর প্রস্তাব সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয় এবং বাংলা দেশে একটি জোরদার অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

কলকাতায় যে প্রস্তাবের সূত্রপাত নাগপুরে তা এভাবে বহাল হওয়ায় সারা দেশে একটা সাড়া পড়ে যায় এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পঞ্জীতে ১৯২১ সন একটি বিশিষ্ট স্থান পায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট, বাংলার অগণিত লোক তাঁর কথায় উঠত বসত। হাইকোর্টের বার-এ তিনিই ছিলেন সকল ব্যারিষ্টারের নেতৃস্থানীয়। কিন্তু অসহযোগের স্বপক্ষে নিজেই যখন প্রস্তাব তুলেছেন, আর কি তিনি প্র্যাকটিস্ চালিয়ে যেতে পারেন? এক কথায় হাইকোর্ট যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন, হাজার হাজার টাকার ব্রীফ ধুলোমুঠোর মতো ফেলে দিলেন। তাঁর দেখাদেখি আরো অনেকে প্র্যাকটিস ছাড়ল, পেশা ছাড়ল, চাকরী ছাড়ল। স্কুল কলেজ থেকে দলে দলে ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল কারণ অসহযোগ অন্দোলনের ভাষায় বিদেশী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তো গোলামখানা। এমনকি সুদূর চট্টগ্রাম সহরে যাত্রা মোহনের প্রতিষ্ঠিত স্কুলেরও দরজা গেল বন্ধ হয়ে। খাস্তগীর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা কাজ ছেড়ে চলে গেলেন। এই ধরনের আন্দোলন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। যতীন্দ্র মোহনও কলকাতা থেকে চলে এলেন চট্টগ্রামে। প্রথম প্রথম ঠিক হয়েছিল যে তিনি তিনমাসের জন্য প্র্যাকটিস বন্ধ রাখবেন এবং তিন মাসে নিজের সহরে অসহযোগ

আন্দোলন জোরদার করে গড়ে তুলবেন। তিন মাস হাইকোর্টে যাওয়া মুলতবী রাখবেন বলেছিলেন বটে, কিন্তু প্র্যাকটিসে ফিরে যেতে তাঁর সময় লেগেছিল পাক্কা দুই বছর। চট্টগ্রামে এসে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে অক্লান্ত পরিশ্রমে যে পসারটুকু জমিয়েছিলেন তা জলাঞ্জলি দিলেন দেশের কাজে। সূচনাতেই যতীন্দ্র মোহন বুঝেছিলেন চট্টগ্রামে যদি জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় তা হলে কেবল সমাজের উপর তলার মধ্যে সে আন্দোলন সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বিশেষত নিচের তলার মানুষকে, টেনে নিয়ে একই কাজে একই ব্রতে সংহত করতে হবে। তিনি তাই লেগে গেলেন চট্টগ্রামের চাষী-মজুরকে জন-আন্দোলনের অংশীদার রূপে সংঘবদ্ধ করতে। জেলার সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে তিনি সবাইকে ডাক দিলেন বিদেশী সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করবার জন্য আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের দেশ নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। প্রতি মহল্লার জন্য তিনি স্থানীয় সমিতি গঠন করে দিলেন, চট্টগ্রামের লোক বুঝতে পারল তাদের মধ্যে এমন একজন নেতা এসেছেন যিনি সমাজের সকল স্তরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন, সবাইকে একই সূত্রে বাঁধতে পারেন দেশ ও দশের কাজে।

যতীন্দ্র মোহন যখন এইসব কাজে ব্যস্ত—একদিন বর্মা অয়েল কোম্পানীর একদল লোক এসে তাঁকে ধরল তাদের জন্য একটা ইউনিয়ন গঠন করে দিতে। চট্টগ্রামে কোম্পানীর এজেন্ট ছিল বুলক ব্রাদার্স এণ্ড কোং। চাকুরেদের সুখ-সুবিধের প্রতি না ছিল এদের দৃষ্টি, না দিত ভালো মাইনে। চাকুরেরা অনেক আবেদন নিবেদন করেও কিছুই আদায় করতে পারেনি, কারণ তাদের নিজেদের মধ্যেই ছিল একতার অভাব। যতীন্দ্র মোহন বাবুদের ও মজুরদের একটা সভা ডাকলেন, বুঝিয়ে বললেন—একতাই শক্তি, নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়ানো যায় না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বিরোধ বিবাদ যদি থাকে তাহলে কর্তাব্যক্তিরা সেই সুযোগে কেবল মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ হাঁসিল করেন। এইভাবে আলাপ আলোচনার পর বর্মা অয়েল

কোম্পানী কর্মীদের একটি ইউনিয়ন গঠিত হল, ইউনিয়নের সদস্যেরা একবাক্যে যতীন্দ্র মোহনকেই তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করল। অতঃপর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল : বাবুদের মধ্যে একজন ছিলেন বিনোদবাবু। অন্য কেরাণীবাবুদের তুলনায় তাঁর মাইনে কিছু কম ছিলনা, তৎসত্বেও তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। পরদিন অফিসে পা দিতেই বিনোদবাবুর ডাক পড়ল, কোম্পানীর খোদ ম্যানেজার মিঃ মার্টিন এত্তেলা পাঠিয়েছেন। বিনোদবাবু হাজির হয়ে দেখলেন হুজুরের মুখখানি রাগে বিরক্তিতে লাল। সাহেব রাগতভাবে বললেন, বিনোদবাবু কেন এমন কর্ম করেছেন তার কারণ দর্শাতে হবে এবং কোম্পানীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। বিনোদবাবু নম্রভাবে মার্টিন সাহেবকে বললেন, কই, তিনি তো কোনো অন্যায় কাজ করেননি। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে সাহেব বিনোদবাবুকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার অর্ডার লিখে দিলেন। এর পরের দিনই ইউনিয়নের একটি জরুরী সভা ডাকা হল—প্রায় হাজার দুই বিক্ষুব্ধ কর্মীর সমাবেশ হল যতীন্দ্র মোহনের সভাপতিত্বে। স্থির হল মার্টিন সাহেব তাঁর অর্ডার প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কোম্পানীর কোনো কর্মী কাজে যোগ দেবেনা। এরকম বিরাট ও ব্যাপক ধর্মঘট দেখে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ খুবই বিব্রত হলেন, সহরের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিও বিচলিত বোধ করতে লাগল। যতীন্দ্র মোহন ইউনিয়ন নেতাদের বোঝালেন যে পুলিসেরা মালিকের দলে, একটা কোনো ছুতো পেলেই ধরপাকড় করে তারা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিতে পারে। সুতরাং সবাইকে শান্ত থাকতে হবে, কোনোরকম হম্বিতম্বী করা চলবেনা—মনে রাখতে হবে এ সংগ্রাম, অহিংস সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম। তাঁর সাবধানবাণী শুনে সকলে শান্ত সংযত ভাবে ধর্মঘট পালন করতে লাগল। এবার সমস্যা হল ধর্মঘট চালাতে হলে যে টাকার দরকার সে টাকা আসবে কোথা থেকে। যতীন্দ্র মোহন ধর্মঘটীদের সাহায্যে একটি তহবিল খুললেন। এ তহবিলে প্রথম চাঁদা দিলেন স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি। ধর্মঘট যখন পুরোদস্তুর চলছে, সেই সময় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। 'লংকা' নামে একটি যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ এসে ভিড়ল

চট্টগ্রাম বন্দরে। অন্য সময়ে জাহাজ নোঙর ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট থেকে সারি সারি সাম্পান সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে পড়ত যাত্রী ও মাল খালাসের জন্য। কিন্তু আজ এ কী হল! সাম্পান নৌকা আসা তো দূরের কথা, কেউ যেন ফিরেও তাকাচ্ছেনা 'লংকার' দিকে। জাহাজের লোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর দমকে দমকে বহু কণ্ঠের একত্র মিলিত ধ্বনি আসছে ভেসে—'আল্লা-হো-আকবর' 'বন্দেমাতরম' 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়'! জাহাজের খালাসীরা দেখল তীরে দাঁড়িয়ে একজোট ধ্বনি যারা দিচ্ছে তারা তাদের নিজেদেরই লোক। ক্রমে তাদের মধ্যেও উত্তেজনা সঞ্চারিত হতে লাগল। যতীন্দ্র মোহন তখন মেগাফোন যোগে জানিয়ে দিলেন ধর্মঘটের খবর। সেই কথা শোনামাত্র কাপ্তেনের নিষেধ সত্বেও খালাসীরা টুপটুপ করে লাফিয়ে পড়ল জলে। এইবার সাম্পান ছুটল সাঁ সাঁ করে, তাদের তুলে নিয়ে এ পারে আনার জন্য। নোঙর-বাঁধা অবস্থায় 'লংকা' পড়ে রইল যাত্রী ও বামালশুদ্ধ দরিয়ায়। পরে কোনো প্রকারে জাহাজ জেটিতে ভিড়ানো হয় এবং যাত্রীরা নিজ নিজ মোট বয়ে তীরে এসে নাবেন। মোট বইবার কুলিরা পর্যন্ত ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। অন্যান্য মালপত্র জাহাজেই পড়ে রইল। 'ভদ্রা' নামে আরেকটি জাহাজ এই সময়ে কর্ণফুলীর মোহনায় এসে নোঙর ফেলে। দূরবীণ দিয়ে 'ভদ্রা'র কাপ্তেন 'লংকা'র দুরবস্থা দেখে বুঝলেন জাহাজ তীরে ভিড়ানো কিংবা মাল নামানো সম্ভবপর হবে না। তিনি তখন জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আরাকানের দিকে চলে গেলেন। এই দুটি জাহাজের খবর পেয়ে ধর্মঘটীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হল। পক্ষকাল অতীত হয়ে গেল কিন্তু কেউ কাজে ফিরে গেল না। মিটমাটের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেলনা, ধর্মঘটীরাও তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করল না। কর্তৃপক্ষ নীরব নিশ্চেষ্ট রইলেন। শেষ পর্যন্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্র মোহনের উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করে বললেন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত থেকে সাত মাইল পরিধির মধ্যে তিনি যেন শোভাযাত্রা বের না করেন অথবা জনসভা আহবান না করেন। সেই সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ছাড়া

বক্তৃতা দেবার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হল। কেবল যতীন্দ্র মোহন নয়, তাঁর এগারো জন সহকর্মীর উপরেও অনুরূপ নোটিশ ও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

বলা বাহুল্য ম্যাজিষ্ট্রেটের এইসব আদেশ অগৌণে অমান্য করা হয়। সমগ্র চট্টগ্রাম জুড়ে ১৯২১ সনের ৪ঠা মে তারিখে সম্পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। এরকম নিশ্ছিদ্র হরতাল ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে আর দেখা যায়নি। পরদিন বিকেল পাঁচটার সময় ১২,০০০ ধর্মঘটীদের এক সমাবেশে যতীন্দ্র মোহন এক উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দেন। মহিমচন্দ্র দাস প্রমুখ আরো কেউ কেউ তাঁর পথ অনুসরণ করে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেন। স্থির হয় সকল জায়গায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে। 'লংকা' জাহাজের ভারতীয় কর্মীরা জাহাজ ছেড়ে চলে আসায় ডাকের চিঠিপত্র বিলি হল না। দোকানপাট সব বন্ধ, যানবাহন আর চলে না, মেথর-ঝাড়ুদার সবাই হাত গুটিয়ে বসে রইল, সাহেব বাড়ির চাকর খানসামারাও ধর্মঘটে যোগ দিল। পাহাড়তলীর রেল কারখানার হাজার হাজার মিস্ত্রি ও মজুর কাজে আর গেল না। হাসপাতালের যাবতীয় কাজ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের হাতে তুলে নিলেন—যাতে রোগীদের কষ্ট না হয়। দিনের শেষে যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর সহকর্মীরা বিরাট শোভা-যাত্রার পুরোভাগে চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করলেন। কাউকে সেদিন গ্রেফতার করা হলনা বটে, কিন্তু ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিষয়ে সরকার বিভিন্ন রাস্তায় নোটিশ লট্‌কে দিলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে মিঃ মার্টিন যতীন্দ্র মোহনকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন যদি ম্যুনিসিপ্যাল অফিসে তিনি একবার আসতে পারেন, তাহলে ধর্মঘট মিটিয়ে নেবার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হতে পারে। মিটমাটের যতগুলি শর্ত যতীন্দ্র মোহন উপস্থাপিত করলেন মার্টিন সবগুলি মেনে নিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্র মোহনকে বিশেষভাবে বললেন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেটের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতারা একটি আলোচনা সভায়

বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে মিলিত হলেন। ফলে স্থির হয় ১৪৪ ধারা অনুসারে যে অর্ডার জারি হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হবে। এমনকি সরকারী মুখপাত্রেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্মঘট পরিচালনা করার জন্য যতীন্দ্র মোহনকে অভিনন্দিতও করলেন। তার চেয়ে অনেক বড় কথা এই যে এবার তিনি সারা জেলার জনসাধারণের হৃদয়ে একটি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। লোকে যতীন্দ্র মোহনকে বলতে লাগল চট্টগ্রামের 'মুকুটবিহীন রাজা'। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর কথা রেখেছিলেন, ধর্মঘটীদের কাউকে তিনি হেনস্থিত হতে দেননি। ধর্মঘট যারা সফল করল তাদের বারো আনা লোকই ছিল মুসলমান। সম্প্রদায়নির্বিশেষে যতীন্দ্র মোহন হয়েছিলেন সারা জেলার সকল মানুষের অবিসম্বাদী নেতা। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এমন গভীর ঐক্য আর কখনো দেখা যায়নি। তখন 'আল্লা হো আকবর' ও 'বন্দে মাতরম্'—এই দুই শ্লোগানের মধ্যে রেষারেষি ছিল না, পাশাপাশি উচ্চারিত হত সমান শ্রদ্ধায় ও সুগভীর দেশপ্রেমে। কিন্তু ধর্মঘট সফল করে তোলার জন্য একদল লোক যতীন্দ্র মোহনের উপর হাড়ে চটেছিলেন—তারা ছিল য়ুরোপীয় সমাজ ও রাজশক্তির অন্তর্ভুক্ত। য়ুরোপীয়দের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে যতীন্দ্র মোহন হলেন চাটগাঁইয়া চ্যাংড়াদের শিরোমণি, অনেক নিন্দামন্দও করেছিলেন যতীন্দ্র মোহনের কার্যকলাপের।

প্রত্যেকটি খবর কাগজ কিন্তু যতীন্দ্র মোহনের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। 'সারভেন্ট' কাগজ বলেছিল তিনি 'মেথর ঝাড়ুদারদের রাজা', বলেছিল 'তাঁর সাহস ও সততা হল নিশ্চিত প্রত্যয়ের দ্বিধাবিহীন প্রকাশ।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্মঘট ও তার জের

সিলেট সন্নিহিত অঞ্চলে বেশিরভাগ চা-বাগানের মালিক ছিলেন য়ুরোপীয়ান। অধিকাংশ কুলি আমদানি করা হত অন্যান্য প্রদেশ থেকে। এজন্য মালিক নিযুক্ত করতেন এজেন্ট, আর এজেন্টরা ফড়ে বা দালাল লাগিয়ে নানা জায়গা থেকে কুলি সংগ্রহ করত। যাদের চাল নেই চুলো নেই—এই রকম নিতান্ত গরীব লোককে ফুসলে ফাসলে, আগাম কিছু টাকা কব্‌লিয়ে এরা ধরে আনত। সবাইকে বলা হত চা-বাগানে কাজ পাবে, টাকা পাবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে। বাগানে কাজ করার নানা সুখ-সুবিধার লম্বা ফিরিস্তি শুনে এইসব দৈন্যপীড়িত বেকার লোক ফড়েদের ফাঁদে পা দিত। তালিকায় নাম লেখার সময় এজেণ্টের লোক ফড়েদের দেওয়া ভাঁওতার সূত্রে এদের কিছু কিছু টাকাও দিত। খাতায় দেখানো হত টাকাটা ধার—প্রাপকের টিপ্‌সইও নেওয়া হত। বাগানে এসে কুলি যখন দেখত আসল অবস্থা এবং বুঝত যে ফড়ে তাকে মিছে আশা দিয়ে ভুলিয়ে এনেছে, তখন কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ। খাতা খুলে দেখানো হত তার নামে মোটা টাকা ধার বলে দেখানো আছে এবং খাতায় তার টিপসইও আছে। এজেণ্টের কেরাণীবাবু বলতেন ধার শুধলে যার ইচ্ছা চলে যেতে পারে। কিন্তু ধার শুধবে এমন তাদের সাধ্য কোথায়? অগত্যা তারা অনুনয়-বিনয় করত, হাতে পায়ে ধরত কিন্তু এজেণ্টের খর্পর থেকে বেরুবার পথ কিছুতেই খুঁজে পেত না। অনুপায় হয়ে তাদের সেই চা-বাগানেই থেকে যেত হত, মালিকের কাছ থেকে মজুরী যা পেত তার মোটা একটা অংশ যেত এজেণ্টের ধারের কিস্তি শুধতে। প্রতি মাসে সুদের অঙ্ক বেড়ে যেত চক্রবৃদ্ধি হারে। দেনার দায়ে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত হত মালিকের ক্রীতদাস। যতদিন যেত, দাসত্বের দৈন্য ও হীনতা ততই যেন প্রকট হত। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলেও প্রতিবাদের কোনো উপায় ছিলনা, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে নিজেদের

দিকটা যে দেখবে তেমন তাদের বুদ্ধি ছিল না। যৎসামান্য বেতনে ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যে পশুর মতো তাদের থাকতে হত।

সেই সময় অসহযোগ আন্দোলন ভারতের সর্বত্র খুব জোরদার। চা-বাগান শ্রমিকদের শোচনীয় দুরবস্থার কথা জানতে পেরে, গোলামী ও অজ্ঞতার এইসব তিমিরাবৃত অঞ্চলে কংগ্রেসের কর্মীরা স্বাধীনতার বাণী বহন করে নিয়ে যাবেন বলে স্থির হল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সতর্ক প্রহরা ভেদ করে ঢুকেও পড়েছিলেন বাগানে বাগানে। নির্যাতিত কুলিরা তাঁদের মুখে স্বাধীনতা আন্দোলন, চট্টগ্রামের শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতির কথা শুনে একটা যেন ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পেল। ক্রমে কংগ্রেস কর্মীদের কাছে কুলিদের ভিড় বাড়তে লাগল, চা-বাগানের মালিকেরা প্রমাদ গুণলেন ও বহিরাগতদের আওতা থেকে কুলিদের বের করে আনবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু ঘুম একবার ছুটেছে যাদের তাদেরকে আবার কি ভুলিয়ে ঘুম পাড়ানো যায়! ১৯২১ সনের মে মাসেই শ্রীহট্ট জেলার চা-বাগানের কুলিরা মালিকদের বহু যত্নে-বোনা দাসত্বের জাল ছিড়ে বেরিয়ে পড়ল। হাজার হাজার কুলি তাদের যৎসামান্য পোঁটলা পুঁটলি মাথায় নিয়ে বৌ ও ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাগানের কয়েদখানা ছেড়ে যে যার ঘরে ফিরে যাবে বলে বেরোল। পথে পথে ভিখ্ মেগে খাবে তবু দাসত্ব আর নয় এ বিষয়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দালালেরা অনেক করে বোঝাল আগাম টাকা নিয়ে তারা মুচলেকা দিয়েছে—গিরমিটিয়া কুলি—চুক্তির সময় না পেরোলে কাজ ছেড়ে চলে যাবে বললেই হল? আইন নেই, আদালত নেই? কিন্তু স্বাধীনতার জোয়ার একবার যখন এসেছে তখন কি আইনের বাঁধ দিয়ে তাকে ঠেকানো যায়? নিরুপায় হয়ে মালিকের লোকেরা করিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারকে শাসিয়ে এল যে গিরমিট-খেলাপ করা কুলিদের যদি দেশে ফিরে যাবার টিকিট বেচা হয়, তাহলে সে হবে বে-আইনী কাজ। প্ল্যাটফর্মে কাতার দিয়ে কুলিরা দাঁড়িয়ে রইল, কেউ তারা টিকিট পেলনা। তারা তখন স্থির করল পায় হেঁটেই চাঁদপুর ঘাট চলে যাবে। সে তো বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বেগতিক

দেখে করিমগঞ্জের কংগ্রেসকর্মীরা জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে চট্টগ্রামের যতীন্দ্র মোহন ও কুমিল্লার অখিল চন্দ্র দত্তকে অনুরোধ জানাল তাঁরা যেন করিমগঞ্জ এসে একটা সুরাহা করেন। যতীন্দ্র মোহন কালবিলম্ব না করে চলে এলেন এবং কুলিদের দুরবস্থা দেখে জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট ও ট্রাফিক ম্যানেজারকে অনুরোধ জানালেন কুলিদের যেন টিকিট কিনতে দেওয়া হয়।

এই অবসরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের বিষয়ে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া ভালো। পূর্বাঞ্চলে যতগুলি রেল কোম্পানী ছিল, তাদের মধ্যে এ.বি. রেলওয়ের কর্মীরা সবচেয়ে কম বেতন পেতেন। উত্তর-পূর্ব আসামের তিনসুকিয়া জংশন থেকে দক্ষিণ বঙ্গের চট্টগ্রাম পর্যন্ত এদের শত শত কর্মীর অর্থাভাবজনিত দুর্দশার অবধি ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই এঁদের দুর্গতির প্রতি যতীন্দ্র মোহন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ফলে রেল কোম্পানীর ভারতীয় কর্মীরা যে ইউনিয়ন গঠন করেন তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন তার প্রেসিডেণ্ট। চা-বাগানের ধর্মঘট যে সময় আরম্ভ হয়েছে ঠিক সেই সময়েই এই ইউনিয়ন কর্মীরা রেল কর্মচারীদের দাবীদাওয়া সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছিলেন। ঠিক ছিল সব তথ্য একত্র হলে পর তার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নামা যাবে।

যতীন্দ্র মোহনের জরুরী তারবার্তার ফলে বহুসংখ্যক কুলি টিকিট কেটে রেলপথেই চাঁদপুর ঘাট অবধি যেতে পেরেছিল। এদের একটা বড় দল ষ্টিমার যোগে নদী পেরিয়ে গোয়ালন্দ পৌঁছায়। জাহাজ ঘাটে গিয়ে লাগল যখন দেখা গেল লাল পাগড়ী পুলিস সেখানে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে। মালিকের দালালেরা আগাম গোয়ালন্দ এসে কুলিদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের কাগজপত্র দাখিল করে—তাদের জোর করে বাগানে ফিরিয়ে নেবার জন্য পুলিসের সাহায্য চেয়েছে। কেবল পুলিস নয়, ফরিদপুর জেলার পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট স্বয়ং—এমনকি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত গোয়ালন্দ ঘাটে হাজির। চা-বাগান মালিকেরা নালিশ করেছে যে এ তো কুলি-বিদ্রোহ, এখনি যদি শক্ত হাতে দমন করা না যায় তাহলে

মহামান্য বৃটিশ সরকারের এই উপনিবেশে শান্তি শৃঙ্খলা আর ফিরবে না। ওদিকে মওকা বুঝে সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর জেলায় ১৪৪ ধারা ঠুকে দিলেন—অর্ডারে বলা হল যে কোনো চা বাগানের সাত মাইলের মধ্যে লোক জমায়েত হতে দেওয়া হবে না, জনসভায় বক্তৃতাদি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। যেসব কুলি বাগান থেকে বেরিয়ে এসে আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছিল এখন তাদের জোর করে ট্রেনে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল করিমগঞ্জ থেকে সোজা চাঁদপুর ঘাটে—সেখানকার' পুলিস এদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে। চাঁদপুরে এই কুলিদের দুর্গতির সীমা রইল না—নিরন্ন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল তাদের অবস্থা। প্রথম প্রথম যখন অল্প সংখ্যায় এসেছিল স্থানীয় লোকেরা চাঁদা তুলে লঙ্গরখানা খুলেছিল, তত্ত্বতদারক করেছিল—এমন কি কিছু লোকের দেশে ফেরার টিকিট পর্যন্ত কিনে দিয়েছিল। শেষে যখন উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় চার হাজারে গিয়ে দাঁড়াল, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে হাজির হল আরো কয়েক হাজার। চারিদিকে যখন এমনি দুরবস্থা, আসামের চা মালিক অ্যাসোসিয়েশনের একজন য়ুরোপীয় প্রতিনিধি চাঁদপুরে এসে সেখানকার এস.ডি.ও-কে সঙ্গে করে কুলিদের সঙ্গে দেখা করলেন ও কাজে ফিরে যাবার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। এঁদের হুমকিতে ভয় পেয়ে কুলিরা হুড়মুড় করে ষ্টিমারে চেপে গোয়ালন্দ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। শোনা যায় স্টিমার কর্তৃপক্ষ হঠাৎ পাটাতন সরিয়ে নেবার ফলে বহু কুলি আচম্‌কা ঘাটের জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। অবশিষ্ট কুলিদের জোর করে তাড়িয়ে নিয়ে রেল ষ্টেশনের গুদামে ঠেলে দেওয়া হয়। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে গিয়ে তাদের চাল দেয়, পানীয় জল দেয়। গুদামে যাদের ঠাঁই হলনা তাদের অনেকে সপরিবারে খোলা আকাশের তলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। একদিন রাত্রে হঠাৎ চাঁদপুর ঘাটের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে, একদল গুর্খা পল্টন পাঠিয়ে নাকি কুলিদের বুটের লাথিতে শায়েস্তা করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। শোনা যায় বেধড়ক মারধোর করার ফলে প্রায় একশো জন কুলি গুরুতর ভাবে আহত হয়।

শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনার ও এস.ডি.ও-এর মিলিত চেষ্টায় গুর্খা পল্টনদের গোরা কমাণ্ডারকে এই ধরনের আতিশয্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। শোনা যায় রেল কোম্পানীর একজন সাহেব অফিসারকে ভার দেওয়া হয় কুলিদের উপর এই নৃশংস অত্যাচারের তদন্ত করতে। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনার পর, আর কোন ঘটনা বাংলার লোককে এত গভীর ভাবে বিচলিত করেনি। প্রতিবাদে চাঁদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় হরতাল ঘোষণা করা হল। চাঁদপুরের নেতা হরদয়াল নাগ জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে যতীন্দ্র মোহনকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন চাঁদপুরে এসে সমস্ত অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করেন। সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্র মোহন এলেন ও চাঁদা তুলে কুলিদের ত্রাণকার্যে লেগে গেলেন।

এই সময়ে তিনসুকিয়া থেকে চট্টগ্রাম অবধি কানাঘুষো চলতে লাগল যে চা-বাগান শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য এ.বি. রেলওয়ের কর্মচারীদেরও ধর্মঘট করা উচিত। তাদের নিজেদের মধ্যেও রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ জমা হয়েছিল, চাঁদপুরের দুর্ঘটনার পর তা আর চাপা রইলনা—একেবারে ফেটে পড়ল। চাঁদপুরের ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯২১ সনের ২০শে মে তারিখে। ২৪শে মে তারিখে চাঁদপুর ও লাকসাম্ জংশনের রেল-কর্মচারীরা কাজে যোগ দিলেন না। এ ধর্মঘট ছিল একেবারেই স্বতঃপ্রণোদিত—এর পিছনে পূর্বপরিকল্পিত কোনো কার্যসূচী ছিল না, বাইরের লোকের উস্কানিও ছিলনা। রেল হেড কোয়ার্টার চট্টগ্রাম সহরে ইউনিয়নের একটি অধিবেশন হয় ২৫শে মে তারিখে। অনেক পর্যালোচনার পর স্থির হয় সরকার যতদিন কুলিদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা না করেন, ততদিন পর্যন্ত কুলিদের প্রতি সহানুভূতিতে রেল কর্মচারীরাও কর্মবিরতি পালন করবে। নদীমাতৃক দেশে যানবাহনের অন্যতম উপায় হল ষ্টিমার—চাঁদপুর-গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে বেশির ভাগ যাত্রী জলপথেই যাতায়াত করে। রেল কর্মচারীদের দেখাদেখি এই তিন জায়গার সব সারেঙ ও খালাসী বেঁকে বসল—তারাও আর কাজ করবেনা,

ফলে সমস্ত জাহাজ অচল। সারঙ-সংঘের সেক্রেটারী আবদুল মজিদকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফ্‌তার করা হল। এ বি. রেলওয়ের প্রেসিডেণ্টরূপে যতীন্দ্র মোহন বিবৃতি দিলেন যে মাঝ রাত্রে অসহায় কুলিদের উপর গুর্খা পল্টনদের অমানুষিক অত্যাচার এবং অন্য কোম্পানীর তুলনায় এই কোম্পানীর বেতনের হার ন্যূন বিধায়—ইউনিয়নভুক্ত তাবৎ কর্মচারী ধর্মঘট পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চাঁদপুরস্থিত কুলিদের মধ্যে কলেরা রোগ দেখা দেওয়ায় তাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছল। এঁদের মধ্যে কারো কারো দেশে ফিরে যাবার সব ব্যবস্থাদি হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে আটকা পড়ল, কেউ বা এমন দেশে চলে গেল যেখান থেকে কেউ ফিরে আসেনা। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে ত্রাণকার্য চালাতে লাগলেন। ডাক্তার নিযুক্ত করা হল, ওষুধ যোগাড় করা হল, মহামারীর বিস্তার দমন করা হল—এবং শেষ পর্যন্ত সকল কুলিকেই নিজ নিজ দেশে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থাও করা হল।

এ বি. রেলওয়ে ধর্মঘট যখন ঘোষণা করা হয় তখন যতীন্দ্র মোহন চট্টগ্রামে ছিলেন না, ছিলেন চাঁদপুরের পথে। কিন্তু চট্টগ্রামে থাকলে তিনি নিশ্চয় ধর্মঘটের সপক্ষেই মত দিতেন। যাহোক, ধর্মঘট যখন শুরু হয়ে গেল তিনি তার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, ধর্মঘটকারীদের আত্মবিশ্বাস জিইয়ে রাখা থেকে ধর্মঘট পরিচালনার যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ তাঁকেই দেখতে হয়েছিল। বেতন-ভোগী কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছে—ভারতে এই প্রথম। এ আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য যতীন্দ্র মোহন যেন সর্বস্ব পণ করলেন। ২৭শে মে তারিখ থেকে ষ্টিমার সার্ভিস-এর লোকেরাও যখন ধর্মঘটে যোগ দিল, জলপথ কিংবা স্থলপথে চলাচলের সমস্ত উপায় গেল রহিত হয়ে। সারা চট্টগ্রাম সহরই যেন হরতাল পালন করতে লেগেছে। যতীন্দ্র মোহনের কড়া নজর কোনো ধর্মঘটী যেন শান্তিভঙ্গ না করে, সাইকেল আরোহী একদল স্বেচ্ছাসেবক তাঁর উপদেশ নির্দেশ নিয়ে এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লা টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। পানীয় জলের সরবরাহ চালু রাখল।

ধর্মঘট চলেছিল দীর্ঘ কাল ধরে। ধর্মঘটীদের মধ্যে যারা নিতান্ত গরীব, দিন-আনি-দিন-খাই গোছের অবস্থা যাদের—তাদের অন্ন যতীন্দ্র মোহনই জুগিয়েছিলেন টাকা তুলে অথবা ধারকর্জ করে। তবু ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত যখন মিটল, অনেকে তাঁকে দুষেছিল তিনি নাকি অনেকদিন ধরে ধর্মঘট টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য লোকে বুঝেছিল এজন্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে ত্যাগ স্বীকার বিশেষ কিছু কম করতে হয়নি। প্রায় ২৫,০০০ কর্মী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়ে সকলের কল্যাণের জন্য এরকম সমবেত প্রচেষ্টা—ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। লোকে বুঝতে শিখল দশের জন্য কাজ করা দেশসেবারই নামান্তর। একজোট হলে একতার শক্তি যে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে—বাংলার মানুষ সে কথার সত্যতার প্রমাণ পেল হাতে হাতে। সাহেব প্রভুর সম্পর্কে যে অনাবশ্যক কাপুরুষোচিত ভয় ছিল—ঘুচে গেল একেবারে। কিন্তু এই নবজাত সাহসের মধ্যে কোনো স্পর্ধা ছিল না। ধর্মঘটের সময় কেবল সাহেব ড্রাইভাররাই এঞ্জিন চালাত, ভারতীয় ড্রাইভার এঞ্জিন চালালে তার সঙ্গে থাকত সশস্ত্র পুলিস। কিন্তু সে সময় একটিও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি, ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত করার জন্য ছলবলকৌশলের সহায় নিতে হয়নি। শান্তি পূর্ণত রক্ষিত হয়েছিল যতীন্দ্র মোহনের নেতৃত্বের গুণে। ধর্মঘট চালু থাকতে থাকতে অনেক ধর্মঘটীকে ছাঁটাই করা হয়। কিন্তু এইসব ভয় বা হুমকিতে ধর্মঘটীরা পেছ্‌পাও হয়নি—কারণ তাদের পিছনে তিনি ছিলেন। বেচাকেনা বন্ধ দেখে বণিক সমাজের মুখপাত্রেরা এবার রেলওয়ের এজেন্ট নোলাণ্ড সাহেবকে ধরলেন সব মিটমাট করে নিতে, কিন্তু তিনি যে মচ্‌কাবেন এমন লক্ষণ দেখা গেলনা।

কিছুকাল ধর্মঘট চললে পর যতীন্দ্র মোহন বুঝতে পারলেন এ যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলে এবং ধর্মঘটীরা ততদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকে কোনো দিন একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। অকর্মা অনড় হয়ে বসে থাকলে ভূতে মানুষকে ঠেলে নিয়ে যায় কুকর্মের দিকে। তাই তিনি একটা রচনাত্মক কাজের ক্ষেত্র গড়ে তুলবেন স্থির করলেন। যাত্রা মোহনের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল ঘরে তিনি শিক্ষা

শিবির স্থাপন করে চরকায় সুতো কাটা ও হাতে চালানো তাঁতে কাপড় বোনায় তালিম দিতে লাগলেন। ধর্মঘটীরা সুতো কাটা ও তাঁত বোনা অভ্যাস করতে লাগল। এ নিয়ে সহরময় তুমুল উদ্দীপনার সঞ্চার হল। দুঃসহ ধর্মঘটীরা সপ্তাহে দু'বার যতীন্দ্র মোহনের হাত থেকে অর্থ সাহায্য পেত। কেউ ভেবে দেখতনা কেন তিনি টাকা জোগাবেন, কোথা থেকে জোগাবেন। যুগপৎ টাকা জোগাড় করা ও ধর্মঘট পরিচালনা করা সহজ ছিলনা। এ কাজে তিনি ক্লান্ত বোধ করেছেন, বিব্রত বোধ করেছেন, কিন্তু কাজ তিনি ছাড়েননি। নিজের বলতে যাকিছু আছে সেই যথাসর্বস্ব দিয়েও দুঃস্থ ধর্মঘটীদের দুর্গতি মোচন করার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। ফলে জমিজমা বন্ধক রেখে তাঁকে চল্লিশ হাজার টাকা কর্জ করতে হয়েছিল। ধর্মঘট পুরোদমে চলছে যখন সরকার রেল কোম্পানীকে মদত দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর সহকর্মীদের উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বললেন এক মাস কাল তাঁরা কোনো জনসভার আয়োজন করতে পারবেন না। যতীন্দ্র মোহন গোড়ায় ভাবলেন নিষেধাজ্ঞাটা মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু এক সপ্তাহ পার হতে না হতে দেখা গেল সরকার পক্ষের অত্যাচার যেন বেড়েই চলেছে। ধর্মঘটীদের রেল কোয়ার্টার থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হল কিন্তু তাদের নিজেদের জিনিসপত্র নিতে দেওয়া হলনা। কংগ্রেস কমিটি বললেন তা কেন হবে, ধর্মঘটীরা একজোট হয়ে নিজ নিজ জিনিস কোয়ার্টার থেকে বের করে নেবে। তারা যখন পাহাড়তলী গিয়ে পৌঁছায় পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় যতীন্দ্র মোহন খুবই বিচলিত হলেন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করলেন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি শোভাযাত্রা বের করবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্পর্ধিত প্রতিবাদ

ধর্মঘটের একচল্লিশ দিনের দিন শোভাযাত্রা বের হবে প্রচার করা হয়। পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট ভাবলেন শোভাযাত্রা বের হলে তো শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা, সুতরাং শুরু থেকেই এই বে-আইনী কাজ দমন করতে হবে কঠোর হাতে। যতীন্দ্র মোহন নির্বিকারভাবে শোভাযাত্রার সবরকম আয়োজন সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। গোড়াতেই সাবধান করে দিলেন হাতকড়া পরতে যাদের ভয় বা আপত্তি আছে তারা যেন শোভাযাত্রার সামিল না হয়। ১৯২১ সনের ২১শে জুলাই তারিখের নির্দিষ্ট দিনে ভোর থেকে ছোট ছোট দলে লোক জমায়েত হতে লাগল। শোভাযাত্রা বেরোবার সময় দেখা গেল ছ' থেকে সাত হাজার মতন লোক জমায়েত হয়েছে। যতীন্দ্র মোহন সমবেত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন :

পুলিসের নিষেধাজ্ঞা আমরা ভাঙতে চলেছি, সুতরাং পুলিসও আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না, মারবে ধরবে চাইকি হাতকড়া পরিয়ে কয়েদখানাতেও পুরতে পারে। আপনারা সেই সব সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কি শোভাযাত্রায় যোগ দিতে চান ?

জনতা একবাক্যে জবাব দিল :

—হ্যাঁ ! আমরা এই সম্ভাবনার কথা জেনেশুনেই এসেছি।

যতীন্দ্র মোহন বললেন :

—আমরা যারা এই শোভাযাত্রায় যোগ দিতে এসেছি—আমাদের মধ্যে নানা ধর্মের লোক রয়েছেন। কিন্তু সকল ধর্মেই বলে সত্য ও ন্যায়ের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়া যায়। যদি সর্বস্ব যায় তবু সত্য ও ন্যায়ের পথ আমরা ছাড়বনা, আজ এই কথা আমরা নিজ নিজ ধর্মস্থানে—গুরুদ্বারে, মসজিদে, মন্দিরে—গিয়ে বলব ও নিজ নিজ ধর্মমত অনুসারে প্রার্থনা করব যেন সত্য ও ন্যায়ের পথে চলবার শক্তি আমরা লাভ করি। কিন্তু পুলিস শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, পুলিস হয়তো বলবেন আমাদের এই সর্বধর্মীয় শোভাযাত্রাও আইন সংগত নয়।

তাঁরা বাধা দিতে পারেন, গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারেন, মারধোর, অপমান লাঞ্ছনা করতে পারেন—এমনকি কয়েদও করতে পারেন। আপনারা কি এই ধরনের সমস্ত জুলুম জবরদস্তি মুখবুজে শান্তভাবে সইতে পারবেন ? যদি পারবেন মনে করেন তাহলে এগিয়ে আসুন, যদি মনে বিন্দুমাত্র ভয় বা সংশয় থেকে থাকে……

জনতা একবাক্যে আবার বলল :

—আমরা সব জেনেশুনেই এসেছি। আপনারা পথ দেখান, আমরা সেই পথেই চলব।

একটি লোকও ফিরে গেলনা।

অতঃপর শোভাযাত্রা চলতে শুরু করল, সবার আগে এগিয়ে চললেন যতীন্দ্র মোহন ও মহিম চন্দ্র দাস। শুরুতে শোভাযাত্রা ছিল এক মাইল লম্বা। চলতে যখন আরম্ভ করল, উদ্বেগে ঔৎসুক্যে ফেটে পড়া জনতা রাস্তার দুধারে জমায়েত হতে লাগল। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আবার সামিলও হল শোভাযাত্রায়। শোভাযাত্রার লাইন ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। শিখ গুরুদ্বার ও হিন্দু মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শোভাযাত্রার গতি মন্থর করা হল। খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কাছাকাছি জামা মসজিদের সামনে যখন শোভাযাত্রা এগিয়ে এসেছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপার পঞ্চাশ জন গুর্খা পল্টন সঙ্গে করে পথ রোধ করলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে এই শোভাযাত্রা বে-আইনী, শোভাযাত্রাকারীরা যে যার নিজের ঘরে যদি শান্তভাবে ফিরে যায় তো ভালো, নচেৎ পল্টনেরা এ শোভাযাত্রা জোর করে ভেঙ্গে দেবে। জনতা যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইল—এক চুলও নড়লনা। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট, হুকুম দিলেন যতীন্দ্র মোহন, মহিমচন্দ্র ও নেতৃস্থানীয় আর পনেরো জনকে গ্রেফ্‌তার করতে। পুরোভাগ থেকে নেতাদের সরিয়ে দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট আবার শোভাযাত্রাকারীদের আপন আপন এলাকায় ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কেউ যখন নড়লনা, ম্যাজিষ্ট্রেটের ইংগিতে গুর্খা পল্টনেরা শান্তিপূর্ণ জনতার উপর

উৎক্ষিপ্ত হয়ে চড়াও হল ও নিমিষে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে ফেলল। পুলিস সুপার মিষ্টার কর্ণিশ নেতাদের নিয়ে জেল-এর পথে রওনা হলেন, তখন আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

যতীন্দ্র মোহনকে বলা হয়েছিল যে তিনি জামিনে খালাস হতে পারেন, কিন্তু তিনি মুচলেকা দিতে রাজি হলেন না। সেদিন বিকেলেই শুনানী হবার কথা। জেল ফটকের সামনে কাতার দিয়ে উত্তেজিত জনতা দাঁড়াল—হাজার হাজার লোক—কে তাদের বাগ মানাবে? চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠতে লাগল, 'যতীন্দ্র মোহনকি জয়', 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়', 'বন্দে মাতরম', 'আল্লা হো আকবর'! জেল কর্তৃপক্ষ দিশাহারা হয়ে পড়লেন, জেল-ফটকের সামনে একটি চেয়ার বসিয়ে সেখানে যতীন্দ্র মোহনকে বসতে বললেন। নেতাকে দেখে প্রথমে তারা অধীর হয়ে উঠলেও তিনি সুস্থ আছেন দেখে তারা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। যতীন্দ্র মোহন ও অন্য নেতাদের যখন কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল, জনতাও চলল তাঁদের পিছু পিছু, পিল পিল করে ঢুকে পড়ল কাছারির হাতার মধ্যে। তবে যখন একেবারে এজলাসের সামনে এসে ভিড় করল, গুর্খা পল্টনের একটা বিরাট দল তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিল। মামলা রুজু হতেই যতীন্দ্র মোহন বললেন যে তাঁদের বে-আইনীভাবে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে এবং কয়েদ করার পর সারাদিন তাঁদের খেতে দেওয়া হয়নি। এজলাসে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা একথা শুনে বিশেষ বিচলিত বোধ করেন। খবরটা জনতার কাছে পৌঁছনো মাত্র তারা সমস্বরে ধ্বনি দিতে থাকে। জজ সাহেব বুঝলেন এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে শুনানী যে এগোবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি যতীন্দ্র মোহনকেই অনুরোধ করলেন যেন কোর্টের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জনতাকে তিনি শান্ত হতে বলেন। মন্ত্রের মতো কাজ হল—জেল-ফটকের সামনে তাঁর দেখা পেয়ে জনতা যেমন শান্ত হয়েছিল এবারও ঠিক তেমনি হল। জনতার উপর তাঁর এই গভীর প্রভাবের প্রমাণ পেয়ে ইংরেজ অফিসারও আশ্চর্য হয়ে গেলেন—শতমুখে 'আসামীর' নেতৃত্বের প্রশংসা করতে লাগলেন।

জজ সাহেব ব্যক্তিগত মুচলেকার বলে যতীন্দ্র মোহনকে জামিনে খালাস করতে চাইলেন—কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। সেদিন ছিল শনিবার, সুতরাং স্থির হল ৪ঠা জুলাই সোমবার মুলতবী বিচার পুনরায় চলবে। জর্জ সাহেবের রায় শুনে সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম সহরে হরতাল শুরু হয়ে গেল। আশপাশের সমস্ত গ্রাম থেকে লোক ভেঙ্গে পড়ল সহরে। মন্দিরে মসজিদে যতীন্দ্র মোহন ও অন্য নেতৃবৃন্দের মঙ্গলে প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিবেশী নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা থেকে হাজারে হাজারে লোক এল মামলা দেখার জন্য, কাছারি হাতায় তিলধারনের ঠাঁই রইলনা, অনেকে গাছের ডালে চড়ে বসল—সবাই উদ্গ্রীব পাছে আদালতের বিচারে নেতারা দোষী সাব্যস্ত হন। কর্ণফুলি নদীর বুকে যাত্রী বোঝাই সাম্পান এত এল দূর দূর অঞ্চল থেকে যে নদীর জল যেন একটা বিস্তীর্ণ ডাঙ্গায় পরিণত হল। পুলিসের সাধ্য কি এরকম বিরাট জনতাকে সামাল দেয়। তুমুল হট্টগোলে কোর্টের শুনানীর সময় সওয়াল জবাব শুনতেও বেগ পেতে হল।

কলকাতায় বসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরা খবর নিচ্ছিলেন। মনের উদ্বেগে ঘন ঘন তারবার্তা পাঠাচ্ছিলেন যতীন্দ্র মোহনকে। সর্বশেষ টেলিগ্রামে তিনি নির্দেশ দিলেন যে জনতার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে নেতাকে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তা না হলে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কিংবা ভাবাবেগের আতিশয্যে জনতাকে বাগ মানানো যাবেনা, হিংসাত্মক কার্যকলাপে রত হওয়াও আশ্চর্য নয়। সুতরাং অগৌণে যতীন্দ্র মোহন যেন জামিনে মুক্তি নেন। দেশবন্ধুর নির্দেশ যে অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যতীন্দ্র মোহন একথা ঠিকই বুঝেছিলেন। শান্তি ও অহিংসার পথে আন্দোলন চালাতে হলে তাঁকে বেরিয়ে যেতে হবে জেলখানা থেকে। অন্য সহকর্মীরা জামিনে খালাস পেতে চাইলেন না, তৎসত্ত্বেও দেশবন্ধুর আদেশ শিরোধার্য করে যতীন্দ্র মোহন মুচলেকা লিখে দিলেন। ৫ই জুলাই তারিখে দুপুর ১১টার সময় নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। জেলের বাইরে জনতা 'বন্দে মাতরম', 'যতীন্দ্র

মোহনকি জয়' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিল। তখুনি তখুনি জনতার মধ্যে দুটো দলে মতবিরোধ দেখা দিল—একদল বলল যে দেশবন্ধুর নির্দেশ অনুসারে মুচলেখা দিয়ে যতীন্দ্র মোহনের কারামুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। তারা বুঝতে চাইলনা যে তিনি মুচলেকা দিয়ে যদি বেরিয়ে না আসতেন তাহলে আন্দোলন পর্যবসিত হত হিংসাত্মক কার্যকলাপে।

মুক্তির পরে স্থানীয় মুসলিম হলে একটি বৃহৎ জনসভা বসল। যতীন্দ্র মোহন হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন তারা যেন দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হয়, যেন শান্তি রক্ষা করে, হিংসার পথে পা না বাড়ায়। তিনি আরো বললেন যে তিনি স্বয়ং ও অন্য নেতারা এবং তাঁদের অনুগামী আর সকলে—কেউ-ই শান্তিভঙ্গ করেননি, করতে চাননি। আন্দোলনে যদি বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী একমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের আপোষহীন অনমনীয় মনোভাব। তিনি সবাইকে বিশেষ করে বললেন তাঁরা যেন গান্ধীজীর প্রদর্শিত শান্তি ও অহিংসার পথ পরিহার না করেন।

এই সভার সভানেত্রী হয়েছিলেন যতীন্দ্র মোহনের সহধর্মিনী নেলী সেনগুপ্ত। স্বামী যখন জেলে ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম তিনিই পরিচালনা করেছিলেন। এই সভায় দুর্গত ধর্মঘটকারীদের ত্রাণকার্যের জন্য যতীন্দ্র মোহনকে একটি মোটা টাকার তহবিল উপহার দেওয়া হয়। মুচলেকার শর্ত অনুসারে তিন মাস কাল যতীন্দ্র মোহন চট্টগ্রামের কোনো আন্দোলনে যোগ দিতে পারবেন না—এই ছিল কড়ার। এই তিন মাসে তিনি ত্রাণ তহবিল গড়ে তুলবেন মনস্থ করলেন।

তহবিল সংগ্রহের অভিযান শুরু হল বরিশাল থেকে। বরিশালের অবিসম্বাদী প্রবীণ নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত ছিলেন যতীন্দ্র মোহনের অগ্রজতুল্য। তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বরিশালের লোক যতীন্দ্র মোহনকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা করলেন ও পূর্ববঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা বলে স্বীকার করে নিলেন।

রেল কর্তৃপক্ষ কর্মী সংগ্রহ করার একটি কেন্দ্র স্থাপন করে নূতন কর্মী ভর্তি

করতে লাগলেন—ধর্মঘট ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। শ'য়ে শ'য়ে নূতন লোক কাজে বহাল করে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে তাদের পাঠানো হল তিনসুকিয়া থেকে চট্টগ্রাম ব্যাপী রেল লাইনের ষ্টেশনে ষ্টেশনে। এতে বহু সংখ্যক ধর্মঘটীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেল, অনেকেই ফিরে যেতে চাইল আপন আপন কাজে। কিন্তু বেশিরভাগ প্রার্থীকে কোম্পানী ফিরিয়ে দিলেন। যারা ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেছিল তাদের পুনরায় বহাল করা দূরের কথা, তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বোনাস ও অন্যান্য প্রাপ্যও বাজেয়াপ্ত হল।

এইরকম যখন পরিস্থিতি অসহযোগ আন্দোলন চট্টগ্রামে কতটা সফল হচ্ছে সরেজমিনে স্বচক্ষে দেখার জন্য গান্ধীজী চট্টগ্রাম সফরে আসবেন বলে মনস্থ করলেন। সে সময় মৌলানা মহম্মদ আলীর সঙ্গে তিনি সারা ভারত পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত কার্যকলাপে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। চট্টগ্রামে যখন তিনি এলেন ধর্মঘট তখনো চলছে। চট্টগ্রামের লোক গান্ধীজীর আগমন সম্ভাবনায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। মাঠের রাখাল ও নৌকার মাঝিরাও তাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়।'

সংবর্ধনা প্রস্তুতি হতে লাগল এলাহীভাবে। যতীন্দ্র মোহন ঠিক করলেন বড়লাটকে যে রকম সংবর্ধনা দেওয়া হয়, গান্ধীজীর সংবর্ধনা হবে তার চেয়েও জমকালো। হাজার হাজার লোককে স্বেচ্ছাসেবকের তালিকাভুক্ত করা হল, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে তালিম দেওয়া হল শুভাগমনের ঘটনাটিকে সফল করে তোলার জন্য। সেপ্টেম্বর মাসের যে দিনটিতে গান্ধীজী এলেন, সেদিন ছিল দস্তুরমত গরম, সেই গরমেও রেল ষ্টেশন থেকে যতীন্দ্র মোহনের বাড়ি অবধি দু'মাইলব্যাপী রাস্তার দু'ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকেরা। মহাত্মার ট্রেন এসে পৌঁছুতেই সমবেত জনতা একযোগে ধ্বনি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল। ষ্টেশনে লোক এসেছিল প্রায় দুই লাখেরও বেশী—অধিকাংশের পরনে ছিল সাদা ধব্ধবে খদ্দর। এরকম একটি বিরাট জনতাকে সুনিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে

রাখতে গেলে সেই পরিমাণে সংগঠন-ক্ষমতা থাকা দরকার। মহাত্মা ও মৌলানা সেই ক্ষমতার পরিচয় লাভ করে বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন। জনসমুদ্রের এই সংহত জোয়ার তাঁদের মনে যে গভীর ছাপ এঁকেছিল, তার পরিচয় দেখা যায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে গান্ধীজীর ছুটি লেখায়—"Chittagong to the Fore" (আগুয়ান চট্টগ্রাম) ও "Chittagong Speaks" (চট্টগ্রামের জবাব)। তিনি বলেছিলেন যে চট্টগ্রামে তিনি নিয়মানুবর্তিতার পরাকাষ্ঠা দেখে এসেছেন—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় পূর্ববঙ্গের এই সহর সমস্ত দেশে একটি অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছে। গান্ধী ময়দানে যে জনসভা হল সেখানেও তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মঘটজনিত যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেগুলি অনুধাবন করে গান্ধীজী একটি কর্মপদ্ধতি স্থির করে দেন। সকল ধর্মঘটী তাতে সায় দিতে পারেনি। গান্ধীজী বললেন কর্মবিরতি পালন করতে গিয়ে অনেকে সব রকম কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিছক ছুটি উপভোগ করছে, উদ্বৃত্ত সময়ের যথাযথ উপযোগ করেনি, ঘরে বসে দিন কাটিয়েছে এই আশায় যে স্থানীয় কংগ্রেস ও নেতারা তাদের মুখে অন্ন তুলে দেবেন, ভেবেছে কেবল ধর্মঘট করেই স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা যথেষ্ট মদত দিয়েছে। মহাত্মা বললেন এরকম মনোভাব নিন্দনীয় এবং একে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়। দৃঢ় ভাষায় তিনি নির্দেশ দিলেন ধর্মঘটীরা সকলেই যেন স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনো গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং যদি তা না করতে পারে তাহলে যেন নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়। দেশের ও দশের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে তা বরং ভালো। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর এই উক্তি কোনো ধর্মঘটীর মনঃপূত হয়নি।

গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও যারা হাত গুটিয়ে থাকার দলে—তারা বেশ বুঝতে পারল ঘরে বসে আর তারা অর্থ সাহায্য পাবেনা। আখেরে কী হবে তা নিয়ে তারা চিন্তা করতে লাগল এবং ধীরে ধীরে স্বভাব-অলস ধর্মঘটীরা ধর্মঘটের কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর তো কেউ তাদের মুখে ভাতের গ্রাস

তুলে দেবেনা! অপরপক্ষে গান্ধীজীর ব্যক্তি মাহাত্মে আকৃষ্ট হয়ে শত শত ধর্মঘটী রেলের কাজে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের স্থায়ী কর্মীরূপে যোগ দিল। এইসব দেশব্রতীদের অন্যতম ছিলেন ক্ষিতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী। গান্ধীজীর ভাষণের পরদিন থেকে এই ভূতপূর্ব রেলকর্মচারী অনুরাগী ভক্তরূপে যতীন্দ্র মোহনের অনুচর হলেন। পরে তিনি হয়েছিলেন যতীন্দ্র মোহনের একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। ১৯৩৩ সনে দেশপ্রিয়ের মৃত্যুর পর সেনগুপ্ত পরিবারের তিনিই হয়েছিলেন একান্ত নির্ভর ও পরম সহায়, পরিবারের সকল কাজে তাঁর যুক্তি পরামর্শ ছিল অপরিহার্য।

গান্ধীজীর আগমনের পর অসহযোগীরা একটি নূতন কার্যসূচী গ্রহণ করে। চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান জোলারা এক ধরনের মোটা কাপড় বুনত। বাড়ীর মেয়েরা কাপড়ের জন্য চরকায় সুতো কাটত। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কেউ কেউ পৈতার সুতো কাটত। আলস্যের প্রধান প্রতিষেধক হিসাবে গান্ধীজী যখন চরকায় সুতো কাটার কথা বললেন, তিনিও জানলেন লোকেও বুঝল যে একটি লুপ্তপ্রায় গ্রামশিল্পকে তিনি পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে সুতো কাটা ও সুতো বোনার কাজ একটি নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে জনসাধারণের মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করল। সারস্বত সমাজ বলে একটি গ্রাম শিল্প প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে শাখা অফিস খুলে জেলায় জেলায় তাদের তরুণকর্মী পাঠালেন খাদির কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের তালিম দিতে। গ্রাম দেশের লুপ্ত-প্রায় বস্ত্রশিল্প আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। পুরানো চরকায় তেল দেওয়া হল,পুরনো তাঁত মেরামত করা হল। তাঁতি জোলাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য লোকও উঠেপড়ে লাগল হাতে-বোনা খাদি উৎপাদনের কাজে।

সারা চট্টগ্রামের উপর গান্ধীজীর প্রভাব হয়েছিল ইন্দ্রজালবৎ। তার জের চলেছিল বহুকাল ধরে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস সংগ্রামে চট্টগ্রাম পরে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—তার মূলে ছিল গান্ধীজীর প্রভাব ও যতীন্দ্র মোহন প্রমুখ নেতাদের নিষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ
প্রথম কারাবরণ

দেশবন্ধুর নির্দেশে যতীন্দ্র মোহন যে মুচলেকা লিখে দেন, ১৯২১ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তার মেয়াদ শেষ হয়। চট্টগ্রামের নেতাদের গ্রেফ্‌তার করা হয়েছিল ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারা মতে। নিষেধাজ্ঞা থেকে নেতাদের মুক্তি লাভ উপলক্ষে কংগ্রেস কর্মীরা ও বেশ কয়েকজন সহরবাসী যতীন্দ্র মোহনের বাড়িতেই একটি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। জনসমাগম হয়েছিল বেশ। যতীন্দ্র মোহন কীর্তন ভালোবাসতেন বলে, উৎসবের অঙ্গ হিসাবে 'নিমাইসন্ন্যাস' পালাকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। পালা বেশ জমে উঠেছে, সবাই মন দিয়ে শুনছেন—এমন সময় এক পুলিসবাহিনী অতর্কিতে আসরে এসে যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেফ্‌তার করল। পরওয়ানায় লেখা ছিল যেহেতু পাহাড়তলার দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেই কারণে ফৌজদারী আইনের ১০৯, ১১১ এবং ১৪৭ ধারা অনুসারে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। পুলিস তাঁকে জামিনে ছেড়ে দিতে চাইলেও তিনি ছাড়া পেতে চাইলেন না। কীর্তনের আসর ছেড়ে জেল হাজতে যাবার সময় সমবেত সবাইকে উদ্দেশ্য করে যতীন্দ্র মোহন বললেন যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁরা প্রস্তুত থাকেন এবং কোনো ক্রমেই যেন অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত না হন।

যতীন্দ্র মোহন গ্রেফ্‌তার হলেও তরুণ নেতা ও কর্মীরা গঠনমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখলেন—সূতো কাটা, খাদি প্রচার ও বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কার্যসূচিতে কোনো ছেদ পড়ল না। নেলী সেনগুপ্ত পরম উৎসাহে এ-কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করার ফলে দ্রুত কাজের উন্নতি হতে লাগল। কিছুকাল পরে নেলীর উপরেও ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হল তাঁকে এ-সব কাজ ছাড়তে হবে। তিনি নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি হলেন না, কাজ পূর্বের

মত চালিয়ে যেতে লাগলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি একটি চিঠি লিখলেন :

প্রিয় মহাশয়,

গতকাল সন্ধ্যায় একজন পুলিস অফিসার আমার হাতে ১৪৪ ধারা অনুসারে একটি নোটিশ দিয়ে গেলেন। নোটিশে আপনার স্বাক্ষর রয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে যে পুলিস-রিপোর্ট সূত্রে আপনি জেনেছেন যে বিদেশী বস্ত্র বেচাকেনা বন্ধ করতে গিয়ে আমি যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করছি ও অনাবশ্যক ভাবে লোকের ভিড় জড়ো করছি। আপনি তাই এ-কাজ থেকে আমায় নিবৃত্ত হতে বলেছেন। আপনাদের ১৪৪ ধারা কী বলে আমি ঠিক জানিনা। আমার সম্বন্ধে পুলিস যে-অভিযোগ উপস্থিত করেছে তার কোনো যথার্থ প্রমাণ আছে বলে আমি মনে করিনা, বরঞ্চ আমার দৃঢ় ধারণা এ-অভিযোগ দুরভিসন্ধিপ্রসূত ও সর্ব্বৈ মিথ্যা। আপনার পুলিস অফিসার যে এতখানি নীতিভ্রষ্ট, মিথ্যাচারী ও অন্যায়পরায়ণ হতে পারেন দেখে আমি ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত বোধ করছি। আজ সকালে আমি একটি বাজার অঞ্চলে গিয়েছিলাম। আমি দেখতে চেয়েছিলাম আমাদের এখানকার নগরবাসীদের কাছে তাঁদেরই স্বদেশজাত কাপড় বেচাকেনার ব্যাপারে যদি সনির্বন্ধ অনুরোধ করি তো তার কোনো ফল হয় কিনা। কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা আমরা বাধাইনি, যানবাহন চলাচলে বাধার সৃষ্টি করিনি, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ঈপ্সিত কাজ আমরা করছিলাম—কোনো দিক থেকে আমরা বাধাও পাইনি। কোনো বেপারী বা দোকানী আমাদের আচরণে আপত্তি তোলেননি, কোনো খদ্দের অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। আমাদের চারদিকে কোনো ভিড়ও জমেনি। বরঞ্চ বলা যায় ঘন ঘন বাজারে টহল দিতে গিয়ে পুলিসই শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করেছে। একজন পুলিস অফিসার সম্পূর্ণ বিনা কারণে আমার সঙ্গী একটি ছেলেকে গ্রেফ্তার করায় আমি এই অযথা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করি। আমি তাঁকে বলি যে-হেতু আমার দায়িত্বে আমি ছেলেটিকে সঙ্গে এনেছি, যদি গ্রেফ্তার করতে হয় তো আমায় করাই উচিত।

আমার কথা শুনে অফিসারটি আমায় শাসান। বোধ করি মিথ্যা আমায় ভয় দেখাননি সেই কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি বাজার থেকে সোজা ছুটে গিয়েছিলেন আপনার কাছে তাঁর বানানো অভিযোগ পেশ করতে এবং সন্ধ্যায় আপনার স্বাক্ষরিত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে। দেশের লোক দেশেরই শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের পৃষ্ঠপোষকতা করবে এমন অনুরোধ করা কি পাপ? দোকানী ও পসারীদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো করে সাজিয়ে রাখতে বলে আমি কি অপরাধ করেছি? দেশের আইন কি দেশের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ধ্বংস করতে চায়?

যতীন্দ্র মোহন ও অন্য নেতাদের বিচার শুরু হয় ১৯২১ সনের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে। তাঁকে জামিন দেবার কথা হয়েছিল কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি দৃঢ় ভাবে বলেন তাঁকে গ্রেফ্‌তার করার মতো আইনসঙ্গত কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তাঁকে যেন অগৌণে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিস সে সময় প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে না পারায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই গ্রেফ্‌তারের ব্যাপার নিয়ে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন:

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোনো অভিযোগ উপস্থিত করতে না পেরেও যদি ব্যারিষ্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের মতো চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকদের গ্রেফ্‌তার করে, যদি দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ ধর্মঘটে মদত দিলে অথবা আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে আদালতে অভিযুক্ত হতে হয় অথবা নির্যাতিত হতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে আইনসংস্কার সত্ত্বেও আমরা যে-তিমিরে ছিলাম সে-তিমিরেই আছি।

মুচলেকা না লিখিয়ে, জামিন না নিয়েই যতীন্দ্র মোহনকে ছেড়ে দেওয়া হল এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কোর্ট শুনানী মুলতবী রাখলেন। আবার ২০শে অক্টোবর তারিখে তাঁকে কোর্টে হাজির করা হল। এবার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় ও পুলিস আইনের ৩২নং ধারায়, একটি শোভাযাত্রার পুরোভাগে

নেতৃত্ব করেছিলেন এই অপরাধে, তাঁকে ও সতের জন অন্যান্য নেতাকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এর ফলে সহরের সর্বত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেদিন দণ্ড দেওয়া হয় সেইদিনই বিকেলে স্থানীয় জেল থেকে তাঁদের স্থানান্তর করা হয়। আসামীদের পিছন পিছন হাজার হাজার লোক চলল রেল ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশন পৌঁছনো অবধি জনতা চলেছিল বেশ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে, সেখানে গুর্খা পল্টনেরা হঠাৎ তাদের উপর হামলা করে। রুলের ঘায়ে অপর্ণাচন্দ্র কানুনগো গুরুতর ভাবে আহত হন। এরপর গুর্খারা তেড়ে এসে তাদের রাইফেলের কুঁদো দিয়ে এলোপাতাড়ি বাড়ি দিতে শুরু করল। পরে তদন্ত করে কংগ্রেস জেনেছিল যে সর্বসমেত ১০৪ জন লোক এর ফলে আহত হয়। বন্দী নেতারা কলকাতা পৌঁছলে পর সেখানেও ষ্টেশনে বহুলোক তাদের সংবর্ধনা করে। নেলী সেই একই ট্রেনে কলকাতা এসেছিলেন, শেয়ালদ ষ্টেশনে তাঁর দেবর রণেন্দ্র মোহন এসে বৌদিকে নিয়ে যান। চট্টগ্রাম থেকে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পুলিস অফিসার আসামীদের সঙ্গে করে কলকাতায় এনেছিলেন। গাড়ি পৌঁছল রাত্রে, অফিসার সে-রাতটা যতীন্দ্র মোহনকে তাঁর কলকাতার বাড়িতেই থাকতে দিয়েছিলেন এবং ভোর হতেই পরের দিন তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে হাজির করেছিলেন। শোনা যায় এই অপরাধের জন্য আমলাতন্ত্রীরা তাঁর উপর খুবই বিরক্ত হয়েছিল। এই হল যতীন্দ্র মোহনের সর্বপ্রথম কারাদণ্ড, এর পরে অবশ্য মাসের পর মাস তাঁকে জেলখানাতেই কাটাতে হয়েছে।

যতীন্দ্র মোহন জেলে থাকতে একটা মজার ঘটনা ঘটে। প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আলিপুর জেলে তার মেয়াদ শেষ করে ছাড়া পেয়েই সেনগুপ্ত-বাড়িতে এসে হাজির। সেখানে সে পুলিস অফিসাররূপে নিজের পরিচয় দিয়ে রণেন্দ্র মোহনকে গোপনে বলে যে যারা জেলে যতীন্দ্র মোহনকে দেখতে যায়, তারা যে লুকিয়ে ছুপিয়ে চুরুট ও আর পাঁচটা ছোটখাটো বিলাসের সামগ্রী তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে আসে—এ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

সাক্ষাতের সময় যে সব পুলিস আশেপাশে থাকে তারা যদি ধরে ফেলে তাহলে কেলেঙ্কারী কাণ্ড। তিনি স্বয়ং ভিতর জেলের অফিসার, সুতরাং তাঁর হাত দিয়ে পাঁচটা জিনিষ পাঠালে ধরা পড়ার কোনো ভয় থাকে না। তিনি সেগুলি নিরাপদে যতীন্দ্র মোহনের হাতে পৌঁছে দিতে পারেন। রণেন্দ্র মোহন সরল বিশ্বাসে এই তথাকথিত 'অফিসারকে' দাদার জন্য কিছু দামী চুরুট দেন এবং সেই সঙ্গে ট্যাক্সি ভাড়া বাবদ কিছু টাকাও। পরের সাক্ষাতকারের দিনই অবশ্য টের পাওয়া গেল 'অফিসার' আর কেউ নয় সদ্যোমুক্ত এক প্রতারক কয়েদী! এই ঘটনায় সবাই খুব মজা পেয়েছিলেন, দাদাভক্ত ছোট ভায়ের এভাবে ঠকজোচ্চরের হাতে নাজেহাল হবার খবরে যতীন্দ্র মোহন হেসেছিলেন হো হো করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব তুলে ধরার জন্য এই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতে আগমন করার ফলে কয়েকটা মাস বিসম্বাদ ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। একদিকে চলল বয়কট ও গ্রেফ্তারের পালা, অন্যদিকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যসূচিও এগোতে লাগল। বরমার প্রতিবেশী গ্রাম সুচিয়া এক কালে হাতে বোনা কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কলকাতায় সুচিয়ার খদ্দরের বেশ কদর হবার ফলে সেখানকার সুতো-কাটা ও তাঁত-বোনার কেন্দ্রে নূতন প্রাণের সঞ্চার করলেন জেলা কংগ্রেস। অনেক কাতাই কর সুচিয়া কেন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন। তাঁদের কাছ থেকে সুতো নিয়ে জোলা ও তাঁতিরা অধিক পরিমাণে কাপড় বুনতে লাগল। ক্রমে সুচিয়া খদ্দরের এমন সুনাম হল যে কলকাতার খাদি প্রতিষ্ঠান এই কেন্দ্রকে সুনজরে দেখতে লাগলেন ও সুতো কাটার জন্য প্রচুর তুলো সরবরাহ করতে লাগলেন।

নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করার একটা সুযোগ এল। প্রিন্স অব ওয়েল্সের আগমনের ফলে কলকাতায় ও দেশের অন্যত্র হরতাল পালিত হল। ১৯২১ সনের ১৭ই নভেম্বর তারিখে প্রিন্স যখন এদেশে পা দিলেন সে সময় সর্বত্র অশান্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করছে—সময়টা রাজসন্দর্শনের পক্ষে

ঠিক অনুকুল ছিল না। কলকাতার হরতাল পরিচালনা করেছিলেন কংগ্রেস ও খিলাফত দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা। হরতালে যত লোক যোগ দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হুজুগে লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল হরতাল কেমন চলছে দেখতে। আর রাস্তায় বেরিয়েছিল শ'য়ে শ'য়ে পুলিস—যদিচ হরতাল ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রীরা হরতালের সার্বিক সাফল্য দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমানের এই মিলিত উদ্যোগ ভাঙবার জন্য তাঁরা উপায় স্থির করে নিলেন; আসলে শান্তিপূর্ণ হলেও দেখাতে হবে যে এ হরতাল হিংসাত্মক। সরকার তাই ঘোষণা করলেন কংগ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছা-সেবক সংস্থা বে-আইনী। ১৯শে নভেম্বর তারিখে তদন্তকারী পুলিস বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে বহুলোক গ্রেফ্‌তার করে, ১৪৪ ধারা জারি করে সকল রকম সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বেচ্ছাসেবকদের বললেন তারা যেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে খদ্দরের কাপড় ফেরী করে বেড়ায়। এইসব স্বেচ্ছাসেবকদের অনেককেই গ্রেফ্‌তার করা হয়—তাদের মধ্যে ছিল দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিরঞ্জিৎ। স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগ্নী উর্মিলা দেবীও রাস্তায় খদ্দর ফেরী করতে গিয়ে পুলিসের কবলে পড়েন, অবশ্য পুলিস তাঁদের গ্রেফ্‌তার করার কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে দেয়। এইসব গ্রেফ্‌তারীর ফল হয় উল্টো—এতে লোকের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং হাজার হাজার লোক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে রাস্তায় খদ্দর ফেরি করতে শুরু করে। যতীন্দ্র মোহন যখন কারাগারে, তাঁর ছোট ভাইও এ কাজে নাবেন। ১৯২১ সনের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দেশবন্ধুকে পুলিস গ্রেফ্‌তার করে। তাঁর বহু সহকর্মী তাঁর অনুগামী হয়ে কারাবরণ করে। জেলে আর তিল ধারণের ঠাঁই না থাকায় অনেক দণ্ডিত আসামীকে মেয়াদ শেষ করার আগেই খালাস করে এইসব রাজনীতিক 'অপরাধীদের' জন্য স্থান সংকুলান করতে হয়।

দেশবন্ধু যখন আলিপুর জেলে বন্দী, ভাইসরয় লর্ড রিডিং কলকাতায় এলেন, ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের কলকাতা সহরে শুভাগমন উপলক্ষে

আয়োজন প্রস্তুত করতে। বয়কট আন্দোলন যাতে বন্ধ হয় সে জন্য তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যকে ধরলেন দেশবন্ধুকে প্রতিনিবৃত্ত করতে। পণ্ডিত মালব্য এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ চাইলে পর গান্ধীজী বললেন অসহযোগ আন্দোলনকারীদের সবাইকে ছেড়ে দিলে পর এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলতে পারে। দেশবন্ধুও একই কথা বললেন। ভাইসরয় এই শর্ত মেনে নিতে না পারায় ১৯২২ সনের মার্চ মাসে যে গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর সফরসূচি অনুসারে ডিসেম্বরের শেষে প্রিন্স তো কলকাতায় পদার্পণ করলেন। সার্বিক অসহযোগ ও সমস্ত সহরব্যাপী হরতালের মধ্যে দিয়ে কলকাতা তাঁকে অভ্যর্থনা করে। সে বছর আমেদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু। তিনি তখনো জেলে থাকায়, হাকিম আজমল খাঁ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভাপতির আসনে দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি রাখা হয়। দেশবন্ধুর অভিভাষণ এমন মর্মস্পর্শীভাবে সরোজিনী নাইডু পাঠ করেন যে মনে হয় দেশবন্ধু স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।

ছ'মাস পরে ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশবন্ধুর বিচার হয় এবং রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে দণ্ড দেওয়া হয়। দেশবন্ধু অভিযোগের কোনো জবাব দেননি। ইত্যবসরে যতীন্দ্র মোহনের কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সভার সদস্যরূপে এবার তিনি মনোনীত হলেন। ১৯২২ সনের এপ্রিল মাসে দেশবন্ধু যখন জেলে আছেন, লোকে বলাবলি করতে থাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার নেতৃত্ব করবেন কে? যতীন্দ্র মোহন তখনো চল্লিশের কোঠায় পা দেননি, যদিচ চট্টগ্রাম জেলার সবাই তাঁর প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন এবং সারা বাংলাতেও তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। অল্প কিছুকাল আগে লোকে তাঁর নাম দিয়েছে 'দেশপ্রিয়'। যতীন্দ্র মোহনের বিশেষ ইচ্ছা সে বছর কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্স চট্টগ্রামে বসে—তিনি সেই মর্মে একটি প্রস্তাবও পেশ করলেন। গোড়ায় কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধতা হলেও

আখেরে তাঁর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। তিনি প্রাদেশিক কনফারেন্সের বক্তৃতামঞ্চ, মণ্ডপ ইত্যাদি প্রস্তুত করার আয়োজন করার জন্য চট্টগ্রাম চলে গেলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী সভানেত্রী হবেন এই স্থির হল।

দশম পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রাম কনফারেন্স

সমগ্র জেলায় যতীন্দ্র মোহন এমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে তাঁর সামান্যতম ইচ্ছাকেও লোকে আদেশ বলে মেনে নিত। কিন্তু সে সময় সরকার যেভাবে কংগ্রেসকে নির্যাতন করছিলেন, তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও স্থানীয় সহকর্মীদের অনেকের মনে সংশয় জেগেছিল সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চট্টগ্রাম অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করা যাবে কিনা। মুখ্য নেতারা তখন প্রায় সকলেই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ১৯২২ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর যে ঐতিহাসিক বিচার হয় তার ফলে তাঁকে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যতীন্দ্র মোহন স্বয়ং জেল থেকে ছাড়া পেয়েই কনফারেন্সের জন্য অর্থ সংগ্রহ, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রস্তুতির কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি কংগ্রেস কর্মীরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, চট্টগ্রামের জনসাধারণও উৎসাহভরে এগিয়ে এল। কিন্তু দুটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হল। তখন ছিল কালবৈশাখীর সময়, একদিনের প্রচণ্ড ঝড়ে বিরাট বক্তৃতামঞ্চ ও দর্শকদের গ্যালারি সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। করগেট টিন দিয়ে চারিদিকে যে বেড়া বাঁধা হয়েছিল—তাও নির্দিষ্ট দিনের সপ্তাহকাল আগে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কনট্রাক্টররা বলল এক সপ্তাহের মধ্যে নূতন করে বক্তৃতামঞ্চ বানানো কিংবা টিনের বেড়া লাগানো কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। যতীন্দ্র মোহন তখন আরাকানে চাঁদা তুলতে ব্যস্ত। তাঁকে খবর দিতে তিনি ফিরে এসে দেখেন সর্বনাশ হয়ে গেছে। তখন কনফারেন্স বসতে মোটে তিন দিন বাকী। ব্যাপারগতিক দেখে মনে হল কনফারেন্স স্থগিত রাখা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। যতীন্দ্র মোহন দোটানায় পড়লেন : স্থগিত রেখে তিনি কি হার স্বীকার করবেন না প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝে জয়ী হবেন ? নামজাদা একজন কনট্রাক্টরকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন : একটা কাজ তিনদিনের

মধ্যে আপনি করে ফেলতে পারবেন এই আশায় আপনাকে ডেকেছি। টাকা যা লাগে আপনি পাবেন, কিন্তু আপনি 'না' বলতে পারবেন না।

যতীন্দ্র মোহনের ঐকান্তিক আগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়ে, চট্টগ্রামের নাম রাখবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কন্‌ট্রাক্‌টর রাজি হয়ে গেলেন অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য। যতীন্দ্র মোহন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন :

আসুন ভাই, সবাই মিলে হাত লাগিয়ে কাজটা সেরে ফেলা যাক।

কন্‌ট্রাক্‌টর বললেন রাজ রেজা কুলি ঘরামীকে মজুরী যা দিতে হয় তার অতিরিক্ত একটি পয়সাও তিনি নেবেন না। এক ঘণ্টা বাদে হাজারে হাজারে মজুর এসে ময়দানে জড়ো হল। দেশের নামে তারা একবার করে জিগির দেয় আর পরমূহূর্তে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে চলে। দিনরাত্তির দলে দলে কাজ চলতে লাগল। কাজ যখন শেষ হল তখন কন্‌ফারেন্স বসতে ঘণ্টা দুই বাকি। কন্‌ট্রাক্‌টার অপর্ণা চরণ কানুনগোর প্রতি যতীন্দ্র মোহনের কৃতজ্ঞতার অবধি রইল না। পরে ইনি দেশহিতৈষীরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কাজ তো শেষ হল, কিন্তু যাঁরা গোড়ায় কন্‌ফারেন্সের সাফল্য নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, মাঝে যাঁরা কনফারেন্স স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের একটি দল এতে খুব খুশি হতে পারেননি।

তখন সহরময় ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে দেশাত্মবোধক জিগির ও বন্দেমাতরম্। আমলাতন্ত্রীদের কান তো ঝালাপালা হয়ে গেল, তাঁরা একটু শঙ্কিতও হলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে যতীন্দ্র মোহনের উপর নোটিশ জারি করে বলে দিল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া চলবে না। কেউ কেউ বললেন এ আদেশ অগ্রাহ্য করতে হবে, কেউ বললেন আদেশ অমান্য করে জিগির দিলে কর্তৃপক্ষ কন্‌ফারেন্স ভেঙ্গে দিতে পারেন। যতীন্দ্র মোহন খুবই হতাশ বোধ করলেন এবং স্থির করলেন পুলিসের অর্ডার মানা হবে কি হবেনা—এনিয়ে তিনি জেলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। অভ্যর্থনা সমিতিতে তাঁর বিপক্ষ দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই সংকল্পের সমালোচনা করলেন। যতীন্দ্র মোহন

বললেন যে বাংলার দূর দূর অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা আসছেন অধিবেশনে যোগ দিতে। এখন কেবল একটা নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে কনফারেন্স যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তা ঠিক হবে না। স্বেচ্ছাসেবকদের বলে দেওয়া হল তারা যেন জিগির না দেয়। রেল ধর্মঘটের ব্যাপারটা তখনো এলোমেলোভাবে চলছে বলে স্থির হয়েছিল যে কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট বাসন্তী দেবী ও জেলা প্রতিনিধিরা ষ্টিমারযোগে আসবেন। জাহাজ এসে কর্ণফুলী নদীতে পড়ল, ঘাটে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যেরা, তাঁদের পিছনে স্বেচ্ছাসেবকদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা, তাঁদেরও পিছনে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনতা। কিন্তু কারো মুখে কোনো 'রা নেই। জাহাজে ডেলিগেট্‌রা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন চট্টগ্রামের লোক অভ্যর্থনাসূচক জিগির দিচ্ছে না কেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ধ্বনি তুললেন বন্দেমাতরম্—তীর থেকে কোনো সাড়া এলনা। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হবে—কেউ কেউ বললেন এ তো ডেকে এনে অপমান! এর একটা বিহিত না হলে চট্টগ্রামে পা দেওয়াই হবে না। জাহাজ দাঁড়িয়ে রইল মাঝ নদীতে। যতীন্দ্র মোহন তখন কতিপয় সহকর্মীসহ একটি নৌকায় চেপে জাহাজে গেলেন। সেখানে পৌঁছে বাসন্তী দেবী ও ডেলিগেট্‌দের বললেন যে জিগির না দেওয়া বিষয়ে পুলিসের নিষেধাজ্ঞা মানা হবে কি না হবে সে বিষয়ে তাঁরাই চরম সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তিনি আপন দায়িত্বে জিগির তোলা স্থগিত রেখেছেন, যদি তাঁরা বলেন পুলিসের অর্ডার অগ্রাহ্য করা হবে তাহলে তিনি সবার আগে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেবেন। ডেলিগেট্‌দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স যাঁদের তাঁরা বললেন এমন লাঞ্ছনা ও অপমান মেনে নেবার চেয়ে বরং ভালো হবে তাঁরা যদি এ অধিবেশনে আদৌ যোগ না দেন। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও বিচক্ষণ নেতারা বললেন যে কনফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়াটাই যখন আমলাতন্ত্রের অভিপ্রায়, নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করার অর্থ হবে পুলিসের ফাঁদে পা দেওয়া। বাসন্তী দেবীও তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন। তরুণের দল খুব খুশি না হলেও সংখ্যা গরিষ্ঠের

সিদ্ধান্ত মেনে নিল। ডেলিগেটরা মুখে একটি কথা না বলে ঘাটে নামলেন, নেমে দেখলেন জনতার লাইন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র পুলিসের একটা প্রকাণ্ড বাহিনী। ক্ষোভে বিরক্তিতে তরুণের দল ফেটে পড়লেন, কিন্তু বাসন্তী দেবীর নির্বন্ধাতিশয়ে ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ালনা। নীরব শোভা যাত্রা বেরুল—যেন শবযাত্রার মতো, এ শান্তি যেন গা-ছম্‌ছম্ করা শ্মশানের শান্তি। যতীন্দ্র মোহন এক এক পা এগোচ্ছেন আর ভাবছেন : যে আদেশের কোনো অর্থ নেই তা মেনে নেওয়া তো এক প্রকারের ভীরুতা। ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গোড়াতেই—প্রথম থেকেই প্রতিবাদে দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল, বলা উচিত ছিল দেশের নামে যেমন আমরা জিগির তুলি তুলব, পরিণামে যাই হোক না কেন। কিন্তু···তা করলে তো সেই পুলিসের ফাঁদেই পা দেওয়া হত, প্রতিনিধিদের সবাইকে ওরা গ্রেফতার করত, চট্টগ্রামে এ অধিবেশন তাহলে হতনা।······আখেরে দেখা যায় চট্টগ্রামের এই অধিবেশনের ফলে জেলার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, জেলায় আন্দোলন জোরদার হয় এবং জেলার লোক নিজেদের মতামত লোকগোচর করার জন্য তৎপর হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্র মোহন যে ভাষণ দেন ওজস্বিতাগুণে তা অনন্য হয়েছিল, বাগ্মীরূপে তিনি পরে যে সাফল্য অর্জন করেন এটা ছিল তারই সূচনা। ডেলিগেট্‌দের স্বাগত করার পর তিনি বলেছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ যাঁরা অলঙ্কৃত করতে পারতেন তাঁদের সকলে কারাগারের অন্তরালে থাকায় তাঁর মতো অযোগ্য পাত্রকে এই বিরাট দায়িত্ব বহন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আরো বললেন :

যখন এই কনফারেন্সের প্রস্তুতিপর্ব চলছিল, পদে পদে, তাঁদের অনুপস্থিতির অভাব আমার সমস্ত মন অধিকার করেছিল—একথা আজ স্বীকার করতে বাধা নেই। তাঁদের অভাবে এ বছরের অধিবেশন চট্টগ্রামে বসতে পারবে কিনা সে নিয়েও আমাদের অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। আজ মনে পড়ছে বহু বৎসর আগে এই জায়গাতেই আমার স্বর্গত পিতৃদেব

যাত্রা মোহন অনুরূপ পদাধিকার বলে যে কর্তব্য সুসম্পাদিত করেছিলেন, আমার মতো অযোগ্যের হাতে সে কর্তব্য সাধনের ভার এসে পড়েছে। আজ তিনি ইহ জগতে নেই, এই জেলার শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরাও আজ কারাগারে। এমন অবস্থায় আমার পক্ষেও গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত না হলেও উচ্চাশা-প্রসূত—একথা নিশ্চয় বলা যায়। আমাদের যতখানি আশা বা সাধ ছিল, সে তুলনায় সাধ্য ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ তবে আমরা আশা রাখি আমাদের আয়োজনের ত্রুটি আপনারা ক্ষমার চোখে দেখবেন, যে কয়েকটি দিন আমাদের এখানে আপনারা আছেন সম্বর্ধনায় ও অতিথি সেবার যদি কিছু অভাব ঘটে নিজ গুণে আপনারা সে সব মার্জনা করে নেবেন।

তাঁর স্বাগত ভাষণে যতীন্দ্র মোহন আরো বলেন গত এক বছর ধরে যদিচ চট্টগ্রামকে নানা দুর্গতির মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে, নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও স্থানীয় নেতারা গঠনমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। গত বছরে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছে দেবার কথা ছিল, কিন্তু সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন মাত্র ছত্রিশ হাজার। মজদুরদের ধর্মঘট ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যাপারে টাকার সংস্থান করতে হয় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। টিলক স্বরাজ্য তহবিলের জন্য তাই যথানির্দিষ্ট টাকা চট্টগ্রাম থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। অপরপক্ষে জেলায় প্রায় আঠারো হাজার চরকা ও ষোলো হাজার তাঁত চালু রাখা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও স্বদেশী কাজের দিক থেকে বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় চট্টগ্রাম খুব বেশি পিছিয়ে পড়েনি। বাংলার যে সব সহর আমলাতান্ত্রিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, চট্টগ্রাম তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম সারির নামজাদা নেতাদের গ্রেফ্‌তার করে দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এই সকল কারণে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীদের অনেকে এই সঙ্কট মুহূর্তে চট্টগ্রামে কনফারেন্সের অধিবেশন আহ্বান করার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বলেছেন এজন্য যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় হবে তা

কংগ্রেস নির্ধারিত গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করলেই ভালো হত। আপত্তি যাঁরা তুলেছেন তাঁরা এমন কথাও বলেছেন যে বাজার এখন মন্দা থাকায় দেশের লোকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না আর্থিক ও বৈষয়িক দিক থেকে কংগ্রেস নির্দিষ্ট কার্যসূচির কি পরিণাম হতে পারে। এইসব আপত্তি ও বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

আমাদের এই সম্বাৎসরিক কনফারেন্স যেমন প্রতি বছর বসে তেমনি যদি এ বছরেও বসতে পারে, তাহলে আমাদের সকল কর্মী সকল অনুরাগীর মনে এই প্রত্যয় জাগবে যে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার কোনো কারণ নেই। তাহলে এই অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধি মণ্ডলীর মারফত আমরা সারা দেশকে জানাতে পারব যে গঠনমূলক কার্যসূচি আমাদের সামনে ধরা হয়েছে, তার প্রকৃত তাৎপর্য কি। আর বাজার মন্দা হবার ফলে দেশের লোকে সত্যই যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের দিনগত যাবতীয় কৃত্য সাময়িকভাবে মূলতবী রেখে কি আমরা আমাদের সমস্যাবলীর সমাধান করব ?

বয়কট ও স্বদেশী বলতে কংগ্রেস কী বোঝাতে চান, সেই কথা বিশদ করতে গিয়ে যতীন্দ্র মোহন বললেন ল্যাংকাশায়ার কিংবা ইংলণ্ডকে আঘাত দিতে কংগ্রেস চান না, কংগ্রেস চান স্বদেশী শিল্পগুলি পুনরুদ্ধার করে দেশকে স্বয়ম্ভর করার পথে এগিয়ে দিতে। তিনি বললেন :

বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদেশের যন্ত্রপাতি বা উদ্‌ভাবিত দ্রব্যসম্ভার যদি আমাদের দেশের ও দশের মঙ্গলসাধন করে, তাহলে তা বর্জন করা তো পাপ। আশা করি আমায় আপনারা ভুল বুঝবেন না। যেসব বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে আমাদের কোনো উপকার বা মঙ্গল নেই অথবা যা আমরা নিজেদের দেশেই উৎপাদন করতে পারি, সে সকল বিদেশী দ্রব্য পরিহার করা নিশ্চয়ই উচিত। আমাদের ঘরে ঘরে যেসব বিদেশজাত জিনিস আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি, সেগুলির বদলে যেদিন স্বদেশজাত জিনিস

ব্যবহার করতে পারব—সেদিন বলতে পারব আমাদের দেশের শিল্প উন্নতি লাভ করেছে। সেই লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

যতীন্দ্র মোহন বললেন, কংগ্রেসের সংগ্রাম পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃণার ঊর্দ্ধে থাকতে চায়। তাঁর অহিংসা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী কোথাও ঘৃণাকে স্থান দেননি। তিনি কেবল চেয়েছেন তাঁর স্বদেশের সার্বিক মঙ্গল। আমলাতন্ত্রী ঔপনিবেশিক সরকার যে দৃষ্টি নিয়ে তার শাসিত প্রজাসাধারণকে 'ছোট' করে দেখে আমরা যেন সেই সেই দৃষ্টি নিয়ে ইংরেজকে ঘৃণার চোখে না দেখি। আমাদের নিজেদের সমাজে যতকাল ছুঁৎমার্গ থাকবে আমরা যেন না বলি যে ইংরেজ প্রভু সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে সমান চোখে দেখেন না, ইতর বিশেষ করে থাকেন। যতীন্দ্র মোহন স্পষ্ট ভাষায় বললেন :

> যতদিন না আমাদের দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা ও জাতি ভেদের অভিশাপ ঝেঁটিয়ে দূর করা যায়, ততদিন আমাদের দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয়না।

অতঃপর যতীন্দ্র মোহন তাঁর ভাষণে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার গুরুত্ব কতখানি—সেই বিষয়ে বললেন। প্রতিটি ভারতীয় সাধু-মহাত্মা হয়ে উঠবেন—এমনটা যদি সম্ভবপর নাও হয়, প্রত্যেক নেতা জনসাধারণকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন যেন তাদের মধ্যে কেউ হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়। পূর্ব কথার পুনরুক্তি করে বললেন :

> দেশের নেতৃস্থানীয় সকলেই আজ জেলে, মহাত্মাও আজ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। একটা বিরাট দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের কারান্তরালে না রাখলে যে শাসনযন্ত্র চলেনা সেই দানবীয় যন্ত্রকে সর্বশক্তিমান বলে যদি স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে, বলতে হবে অন্যায় ও অসত্যের চাকার তলায় ন্যায় ও সত্য চিরকাল চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে।

সর্বশেষ সমবেত সকলকে তাঁর একান্ত মিনতি জানিয়ে বললেন তাঁরা যেন

রুদ্রপ্রকৃতি পরিহার করে বিষ্ণুপ্রকৃতি সবলে অবলম্বন করেন, ধ্বংসের শক্তির পরিবর্তে যেন প্রেমের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে প্রেমের শক্তিকেই তিনি জীবনে বড় করে দেখতে চেয়েছেন বলে তিনি কখনো ভাঙতে চাননি—গড়তে চেয়েছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ
স্বরাজ্য পার্টি

চট্টগ্রাম কনফারেন্সের তিন মাস পরে ১৯২২ সনের জুলাই মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারামুক্ত হন। গান্ধীজী তখনো কারাগারে, অসহযোগের সাফল্য বিষয়ে লোকে ক্রমেই হতাশ্বাস হয়ে পড়েছে। যে গতি ও শক্তি নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ক্রমেই তা মন্দীভূত হতে লেগেছে। কংগ্রেস থেকে তাই একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে স্থির হল অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য বিষয়ে বিচার করে দেখা হবে। দেশবন্ধুর কারামুক্তির কিছুদিন পরে মতিলাল নেহেরু কলকাতায় আসেন। বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তিনি অনুরোধ করেন যেন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত, আন্দোলনের সফলতা বা বিফলতা সম্পর্কে তাঁরা যেন বক্তৃতা বা বিবৃতি না দেন। কিছুদিনের মধ্যেই রিপোর্ট ছাপা হয়ে বের হল ; কমিটি সুপারিশ করলেন যে যেহেতু দেশ জীবন ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে অসহযোগ আন্দোলন চালু করার জন্য প্রস্তুত নয়, নূতন কোনো কার্যসূচি গ্রহণ করতে হবে। দেশবন্ধুর প্রতীতি হল বিধান সভা ও ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামা দরকার। তাঁর ধারণা হল স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে অসহযোগ তেমন কার্যকর হবে না।

ততদিনে যতীন্দ্র মোহনের সংগতি ফুরিয়ে এসেছে, সংসার চালানো মুস্কিল, অগত্যা তিনি আবার প্রাকটিস শুরু করলেন। এজন্য লোকে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। কিন্তু গোড়ায় তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন তিন মাসের জন্য প্রাকটিস মুলতবী রাখবেন বলে। ইতিমধ্যে তিন মাস গড়িয়ে প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেছে। তিনি ভাবলেন কংগ্রেস যদি তার সদস্যদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অনুমতি দেন, তাহলে নিশ্চয় তাঁর জীবিকার্জনে বাধা দেবেন না। দেশবন্ধু তাঁর কাজে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন যে যতীন্দ্র মোহনের মতো

লোককে দেশের কাজ ছেড়ে পেটের ধান্দায় যদি বেরোতে হয় তাহলে দেশের পক্ষে তা দুর্ভাগ্যবিশেষ। বিরুদ্ধবাদীরা তাতে বিরত হলেন না, খোলাখুলিভাবে যতীন্দ্র মোহনের নামে কুৎসা রটনা করতে লাগলেন—এমনকি সভা ডেকে তাঁর ছবি ছিঁড়ে কুটিকুটি করলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর যে প্রস্তাব অনুসারে কলকাতায় স্বরাজ্য পার্টির জন্ম হয় তার কথাগুলি ছিল এইরকম :

যেহেতু লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলগুলির প্রথম পর্বের কার্যধারা দেখে মনে হচ্ছে খিলাফত আন্দোলন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবিধানে কিংবা সত্বর স্বরাজ লাভের অনুকূলে তাঁরা কোনো কাজ করেননি বা করতে পারেন নি বরঞ্চ এমন সব কাজ করেছেন যার ফলে দেশের লোকের দুঃখদুর্গতি বৃদ্ধি পেয়েছে ; যেহেতু অহিংস অসহযোগের স্থির নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া বাঞ্ছিত নয় উচিতও নয় ; সেই হেতু সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক এই সভা প্রস্তাব করে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সুপারিশ করা হোক যেন খিলাফত আন্দোলন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবিধানে ও অবিলম্বে স্বরাজলাভের অনুকূলে কাজ করার জন্য অসহযোগী কর্মীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হোক এবং যাতে সংখ্যাধিক্যে গরিষ্ঠ হয়ে তাঁরা কাউন্সিলে প্রবেশ করতে পারেন তার জন্য সর্বপ্রকার উদ্‌যোগ করা হোক।

যতীন্দ্র মোহন এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে বিপক্ষ দলের সকল আপত্তি খণ্ডন করলেন। তিনি বললেন আজ যাঁরা অসহযোগী কাল যদি তাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দেশের লোকের দরজায় দাঁড়ান, যদি তাঁরা বলেন যে কংগ্রেস তাঁদের অসহযোগ করতে বলেছিলেন সেই কংগ্রেসই অত্যাচারের হাত থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্য নির্বাচন যুদ্ধে তাঁদের নামতে বলেছেন, তাহলে ভোটদাতারা নিশ্চয় তাঁদের বিমুখ করবে না। তিনি আরো বলেন নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে

বলে আশা করা অযৌক্তিক নয়। কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধীর দোহাই দিয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, বলেছিলেন মহাত্মা ও অন্যান্য নেতারা যখন জেলে রয়েছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানার কোনো উপায় নেই, তখন অসহযোগ কার্যসূচির বদলে অন্য কার্যসূচী গ্রহণ করা ঠিক হয়না। এর উত্তরে যতীন্দ্র মোহন বলেছিলেন স্বয়ং মহাত্মাই বলেছেন জেলের বাইরে যারা রয়েছে তাদের হয়ে কোনো কাজ করতে হলে জেলের ভিতরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মতামতের অপেক্ষায় না থাকাই সঙ্গত। তেমন যদি করা হয় তাহলে মহাত্মাই সর্বপ্রথমে তাঁদের দুষবেন। কেউ কেউ বলেছেন যে কাউন্সিল নির্বাচনে দাঁড়ানো সরকারের সঙ্গে এক প্রকারের সহযোগ—কিন্তু মুখ্য বিচার্য বিষয় নির্বাচনে যাঁরা দাঁড়াবেন তাঁরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়াবেন।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য প্রস্তাব করলেন ১৯২২ সনের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হবার কথা, সেই অধিবেশনে আলোচনা করার জন্য আপাতত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রস্তাবিত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হোক। কংগ্রেসে এখন দুটো দল দেখা দিল—একদল পরিবর্তন চাননা অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান, আরেক দল পরিবর্তন চান অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করে সেইখানে প্রয়োজন মত সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করতে চান। দুই দলের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা গেল। গয়া কংগ্রেসের ডেলিগেট্ নির্বাচন নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার হল। দেশবন্ধু, মতিলাল নেহরু ও যতীন্দ্র মোহন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে নিজ নিজ সদস্যপদে ইস্তফা দেবার ফলে লোকচক্ষুতে উপহাসাস্পদ হলেন। নবগঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন না-বদলের দলে। যদিচ দেশবন্ধু ছিলেন অপর দলের নেতা—দল হিসাবে এরা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ। ১৯২২ সনের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশন হল দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে। সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু কাউন্সিলে যোগ দেবার সপক্ষে বললেন, কিন্তু অধিকাংশের ভোটে মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল।

অগত্যা দেশবন্ধু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদে ইস্তফা দিয়ে, কাউন্সিলে যোগদানের সমর্থকদের নিয়ে একটি নূতন পার্টি সংগঠন করলেন, নাম দিলেন কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্য পার্টি। দেশবন্ধুর পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হবার ফলে তিনি নামেই কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট থেকে গেলেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই নূতন পার্টি গড়ে তুলতে লাগলেন। নতুন পার্টি কংগ্রেস থেকে বিযুক্ত হলনা, কংগ্রেসেরই একটি সংখ্যা লঘিষ্ঠ উপদল হয়ে রইল। কিন্তু দেশবন্ধু ও যতীন্দ্র মোহনের সম্মিলিত উদ্‌যোগে ও অনলস প্রচারের ফলে স্বরাজ্য পার্টির শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং অচিরে গরিষ্ঠতা অর্জন করল। অবশেষে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস স্বরাজ্য পার্টির কার্যসূচী অনুমোদন করলেন কিন্তু সেই সঙ্গে বয়কটও বহাল রাখলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখন সত্ত কারামুক্ত হয়েছেন, তাঁর হাত দিয়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে একটি বাণী প্রেরণ করলেন :

> আপনারা যে আমার কার্যসূচিই আঁকড়ে থাকবেন এমন আমি চাইনা, আমার কার্যসূচির সবটুকুই প্রতিপালিত হোক—এমনও আমি চাইনা। দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে যদি আপনাদের মনে হয় বয়কট কার্যসূচির দু'একটা দফা বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা নিতান্তই প্রয়োজন, তাহলে দেশের নামে দোহাই দিয়ে আপনাদের প্রতি আমার এই আদেশ তদনুসারে সেই সব অংশ বাদ দেবেন অথবা অদলবদল করে নেবেন।

এতদনুসারে দিল্লী কংগ্রেস কংগ্রেসীদের কাউন্সিল কিংবা এসেম্বলি নির্বাচনে দাঁড়াবার অনুমতি দিলেন এবং অচিরে ভোটাধিকারের বলে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যেরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে শক্তিশালী সরকার-বিরোধী দলে পরিণত হলেন। তাঁরা দলে দলে কাউন্সিলে নির্বাচিত হলেন, দেশের লোকও ভোটের অধিকার প্রয়োগে প্রচুর আগ্রহ দেখালেন। বাংলার স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন যতীন্দ্র মোহন, দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত হয়ে বাংলাদেশের বিধান সভার নির্বাচন অভিযান চালনার মুখ্য দায়িত্ব পড়েছিল তাঁরই ওপর। পার্টির

মুখপাত্র হিসাবে 'ফরওয়ার্ড' নামে দৈনিক কাগজ দেশবন্ধু বের করলেন। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'ফরওয়ার্ড' কাগজে স্বরাজ্য পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত হল। বাংলার বিধানসভায় নির্বাচনের জন্য স্বরাজ্য পার্টি থেকে সাতান্ন জন হিন্দু ও মুসলমান প্রার্থী মনোনীত হন। চট্টগ্রাম হিন্দু কেন্দ্র থেকে মনোনীত হয়েছিলেন যতীন্দ্র মোহন। ভারতের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে স্বরাজ্য পার্টির স্থান তখন অগ্রগণ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল

১৯২৩ সনের নভেম্বর মাসে বাংলা বিধানসভার নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির মনোনীত চল্লিশ জন সাফল্য লাভ করেন। তাঁদের এই জয়লাভে অনেকে আশ্চর্য বোধ করেন। যতীন্দ্র মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল আনন্দচরণ দত্ত পরাজিত হলেন। বিধানসভার ভিতরেও একাধিক ছোট ছোট পার্টি ছিল। দেশবন্ধু স্থির করলেন ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন। অন্য দলের মধ্যে ছিল মডারেট পার্টি, মুসলমান সদস্যদের একটি গোষ্ঠী এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যেরা। দেশবন্ধুর চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের মধ্যে একটি সমঝোতা হবার ফলে, স্বরাজিস্ট দল সরকারকে পদে পদে নাজেহাল করতে লাগলেন। বার বার চেষ্টা করেও সরকার একটি স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারলেন না। এই সময় কংগ্রেস স্থির করেন ম্যুনিসিপালিটি নির্বাচনেও নামবেন। দেশবন্ধু চাইলেন দ্বৈত শাসনের গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে। কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে মনোনীত কংগ্রেসীরা দাঁড়ালেন। যতীন্দ্র মোহন স্বয়ং প্রার্থী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি তখন স্বরাজ্য পার্টির সেক্রেটারী আবার কংগ্রেস ম্যুনিসিপাল এসোসিয়েশনরও সেক্রেটারী। এছাড়া তিনি ছিলেন বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরও সম্পাদক। এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ—অসুস্থতা নিবন্ধন দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এই তিন ক্ষেত্রেই যতীন্দ্র মোহন নেতৃত্ব করতেন। একাধিক বিশিষ্ট কংগ্রেসী অতঃপর ম্যুনিসিপালিটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন : কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়ররূপে নির্বাচিত হলেন স্বয়ং দেশবন্ধু, বিঠলভাই প্যাটেল বোম্বাই করপোরেশনের এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদ ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হলেন। দ্বৈতশাসনের ভিত্তিমূল নড়ে উঠল।

লর্ড লীটন্ তখন বাংলার লাট। গভর্ণমেণ্ট হাউসে আমন্ত্রণ করে দেশবন্ধুকে

তিনি অনুরোধ করলেন যেন স্বরাজ্য পার্টি মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি হয়। দেশবন্ধু লাট সাহেবের এই প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য কিঞ্চিৎ সময় চেয়ে নিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন না। তখন লীটন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, আবুল কাসেম গজনভী ও ফজলুল হক্‌কে নিয়ে তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। ইতিপূর্বে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ হালদার আদালতের সামনে আপত্তি তুললেন। তাঁর আপত্তি ন্যায়সংগত প্রমাণ হওয়ায় সুরেন্দ্র নাথ মল্লিকের আসন ছেড়ে দিতে হয়। পরে তাঁকে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে একটি কাজ দেওয়া হয়। ১৯২৪ সনের ২৪শে মার্চ তারিখে মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে কাউন্সিল আলোচনা করেন—আলোচনার ফলে সরকারী পক্ষের প্রস্তাব ৬৯ বনাম ৬৩ ভোটে বর্জিত হয়ে যায়। বার বার মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার চেষ্টা করেও লর্ড লীটন স্বরাজিস্টদের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন—কারণ তাঁদের ভোটের জোর বেশি। সেই সময় ব্রিটিশ তাঁবেদার কোনো কলকাতার কাগজ তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেশবন্ধুকে বলেছিল 'ভারতের কুচক্রী প্রধান'।

১৯২৪ সনের অগষ্ট মাসে অসুস্থতা নিবন্ধন দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে, লীটন যতীন্দ্র মোহনকে মন্ত্রীসভা গঠনের সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করেন। যতীন্দ্র মোহন তাঁকে জানান যে নীতিগতভাবে মন্ত্রীসভার তিনি বিরোধী নন, কিন্তু দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। যতদিন না কাউন্সিলের তাবৎ সদস্য জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ না আসেন, ততদিন স্বরাজিস্টরা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারেন না।

সরকার এবার বুঝলেন স্বরাজিস্টদের হটিয়ে দিতে না পারলে তাঁদের পরিকল্পনামতে বিধানসভার কাজ চালানো সম্ভবপর হবেনা। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্র চরণ মিত্র—প্রমুখ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। কতিপয় তরুণ বয়স্ক নেতাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে অর্ডার জারি করা হয়। বাংলায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধিত আইন অনুসারে সরকারের ধরপাকড় করার যে ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা বিস্তৃততর করার জন্য

রৌলট আইনের কিছু কিছু কড়া শর্ত যোগ করে, সরকার এবার কাউন্সিলের সামনে একটি বিশেষ অর্ডিনান্স বিল উপস্থাপিত করলেন। ১৯২৫ সনের ৭ই জানুয়ারি তারিখে এই বিল আলোচিত হবে বলে স্থির হয়। স্বরাজিস্টরা এই বিলের বিরোধিতা করবেন বলে বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু, অনিল বরণ রায় ও সত্যেন্দ্র চরণ মিত্রকে ইতিপূর্বেই গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, অপর কয়েক জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে—এমত অবস্থায় স্বরাজিস্টরা যথেষ্ট সংখ্যায় ভোট সংগ্রহ করতে পারবেন বলে ভরসা কম। এঁরা কাউন্সিলে হাজির থাকতে না পারলে ভোটের গরিষ্ঠতায় সরকারের প্রস্তাব নাকচ করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। দেশবন্ধু তখন অসুস্থ হয়ে কলকাতার বাইরে রয়েছেন বায়ুপরিবর্তনের জন্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে যতীন্দ্র মোহন কাউন্সিলের সেক্রেটারির নামে দুটি চিঠি পাঠালেন। প্রথম চিঠিতে বললেন ৭ই জানুয়ারি তারিখে তিনি কাউন্সিলের সামনে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করতে চান। প্রস্তাবের বিষয় হল এই : কাউন্সিলের বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে প্রস্তাবিত বিল সম্বন্ধে সকল সদস্যের সাক্ষ্য গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজন বিধায়, আটকবন্দী ও গণ্ডীবদ্ধ সদস্যদের উপর শমন জারী করে বলা হোক কাউন্সিল অধিবেশনের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা যেন সাক্ষ্যদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে অতি অবশ্য হাজির থাকেন। দ্বিতীয় চিঠিতে যতীন্দ্র মোহন সেক্রেটারীকে অনুরোধ জানালেন ৭ই জানুয়ারি তারিখের অধিবেশন পিছিয়ে দিতে।

অপর এক চিঠিতে তিনি কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ জানালেন যে যেহেতু তিনজন আটক বন্দীর অনুপস্থিতিতে ৭ই জানুয়ারির অধিবেশন পরিচালনা করা সম্ভবপর হবেনা, সেজন্য প্রেসিডেণ্ট যেন যতীন্দ্র মোহনকে সভা মুলতবী রাখার প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেন। প্রেসিডেণ্ট অনুমতি না দেওয়ায় বেশ বুঝতে পারা গেল যে আটক বন্দীদের অধিবেশনে হাজির করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাবেনা। কিন্তু স্বরাজিস্ট নেতারা এতৎসত্ত্বেও বিরত হলেন না, ডাক্তারদের আদেশ অমান্য করে দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরে এলেন, বললেন

যতক্ষণ তাঁর দেহে প্রাণ আছে তিনি সেই দুরভিসন্ধিমূলক অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে লড়বেন, দেশের তরুণ নেতারা বিনা বিচারে আটক থাকবেন—এ তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না।

কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয়ে গেছে এমন সময় ষ্ট্রেচার যোগে দেশবন্ধু এসে পড়লেন, অন্য সদস্যদের সঙ্গে বিল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে বললেন এই 'কালা আইনের' বিরুদ্ধতা করার জন্য তিনি সকলের ভোট করযোড়ে ভিক্ষা করেছেন। ভোট গ্রহণের পর দেখা গেল বিপুল ভোটাধিক্যে বিলটি পরিত্যক্ত হয়েছে। দেশবন্ধুর মুমূর্ষু দেহে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হল। কিন্তু স্বরাজিস্টদের স্বল্পক্ষণস্থায়ী বিজয় গৌরব ধূলিসাৎ করে লর্ড লীটন তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে নূতন অর্ডিনান্স চালু করলেন। দেশবন্ধু মনে মনে এতটুকু সান্ত্বনা পেলেন যে এই জবরদস্তির ফলে সরকার প্রমাণ করতে বাধ্য হলেন যে তাঁদের শাসনের পিছনে জনগণের সমর্থন নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯২৪ সনে কলকাতা করপোরেশন সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টি করপোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করতে শুরু করেন। করপোরেশনের প্রথম মেয়র দেশবন্ধু দ্বিতীয় বছরের জন্যও মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সনের ১৬ই জুন তারিখে তাঁর 'মৃত্যুহীন প্রাণের' অবসান ঘটলে পর যতীন্দ্র মোহন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
ত্রি-মুকুট

দেশবন্ধুর মৃত্যু এসেছিল সমস্ত দেশের পক্ষে চরম আঘাতের বেদনা বহন করে। তাঁর মৃত্যুতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হয়। তিনি একাধারে ছিলেন বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট, স্বরাজ্য পার্টির সর্বগণমান্য নেতা ও কলকাতা করপোরেশনের মেয়র। দেশবন্ধুর তিরোধানের বারো দিন পরে বিজয় কুমার বসুর সভাপতিত্বে স্বরাজ্য পার্টির একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই সভায় প্রায় চারশো জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আমন্ত্রণক্রমে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য যতীন্দ্র মোহন ও মৌলানা আক্রম খানের নাম প্রস্তাবিত হয়। মৌলানা আক্রম খান নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবার ফলে সর্বসম্মতিক্রমে যতীন্দ্র মোহন ওই পদে নির্বাচিত হন। পরে যখন মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় আসেন, স্বরাজ্য পার্টির এক সভায় উপস্থিত থেকে সদস্যদের বলেছিলেন যে দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারীরূপে তাঁরা সুযোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছেন এখন তাঁদের উচিত সকল কাজে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা করা।

২৯শে জুন তারিখে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য যতীন্দ্র মোহন ও ললিত মোহন দাসের নাম প্রস্তাবিত হয়। ললিত মোহন নিজ নাম প্রত্যাহার করায়—যতীন্দ্র মোহন যুগপৎ এই কমিটি এবং বাংলার স্বরাজ্য পার্টির প্রেসিডেণ্ট হন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রে এই সময় 'নেতৃ সম্বর্ধনা' (Hail the Leader) শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়ঃ

> বাংলার স্বরাজ্য পার্টি তথা বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি—এই উভয় সংস্থার প্রেসিডেণ্টরূপে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত নির্বাচিত হয়েছেন। এতে কেবল যে পার্টি ও কংগ্রেসের সদস্যেরা সন্তোষলাভ করেছেন এমন নয়, এই নির্বাচনের ফলে দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষও খুশি হয়েছেন। তাঁকে এই যে বিশেষ সম্মানে বিভূষিত করা হল, যতীন্দ্র মোহন কেবল যে এই সম্মানের

যোগ্য এমন নয়—এটি তাঁর প্রাপ্যও বটে। ১৯২১ সনের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাতেই তিনি এমন একটা সময়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস ছেড়ে দেন, যখন প্রভূত ও কঠিন পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে ব্যারিষ্টারি পেশায় তিনি সবেমাত্র নাম করতে শুরু করেছেন। প্রাকটিস ত্যাগ করে দেশের পায়ে তিনি যে আহুতি দান করলেন তাকে সামান্য জ্ঞান করা ঠিক হবেনা। যে দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে জীবিকার্জনে তিনি বিরত ছিলেন, সেই সময়টা তাঁর, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের কতরকম ক্লেশ ও কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে এবং কেমন হাসি মুখে ও প্রসন্ন চিত্তে তাঁরা সে সমস্ত সহ্য করেছেন—তার বিষয়ে কেবল তাঁর অন্তরঙ্গরাই জানেন।

আমরা এই সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি আর কোনো কারণে নয়, আমরা চাই দেশের লোকে জানুক যতীন্দ্র মোহনের মধ্যে সেইসব গুণ ও লক্ষণের সমাবেশ ও সম্যক বিকাশ হয়েছে যার ফলে একজন ব্যক্তি সত্যকার জননেতা হতে পারেন। দশের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের স্বার্থ বলি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। তিনি পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে জানেন, কোনো কিছুতেই ভয় পাননা, সংগঠন ক্ষমতা তাঁর প্রচুর—এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে দেশের মানুষকে তিনি যেমন আপনভাবে চেনেন তেমন খুব কম লোকেই চেনে। আজকের দিনে বাংলায় স্বরাজ্য পার্টি কিংবা কংগ্রেসের নেতৃত্ব করতে পারেন এমন যোগ্য লোক তাঁর মতন আর দ্বিতীয় নেই। তুলনা করে ছোট বড় বিচার করতে যাওয়া সর্ব কালেই অবাঞ্ছিত, আজকের দিনে তো বটেই। আমরা কেবল নিঃসংশয়ে আমাদের একান্ত বিশ্বাসের কথা বলতে পারি, যতীন্দ্র মোহন যে পার্টিকে জয়যুক্ত করবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। যথাসময়ের সুযোগ যখন ঘটে, মানুষকে ঠিক জানা যায়। আমাদের ধারণা সেই রকম সময় সুযোগ এলে প্রমাণ হবে যতীন্দ্র মোহন এ দেশের অবিসম্বাদী নেতা হবার যোগ্য।

আর একটি আসনের জন্য যতীন্দ্র মোহনের নাম এবার প্রস্তাবিত হল—সেটি কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের পদ। আর দুটি স্থান যত সহজে এসেছিল—এটি তত সহজে এলনা। প্রত্যেকটি য়ুরোপীয় পরিচালিত কাগজ এবং দেশী কাগজের মধ্যে 'বেঙ্গলি' যতীন্দ্র মোহনের বিরোধী, এমনকি কংগ্রেস ম্যুনিসিপাল এসোসিয়েশনের কেউ কেউ চাননি যে তিনি দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত হন। এই অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেসের কতিপয় সদস্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শ চান। তিনি তাঁদের বলেন যে ব্যক্তি স্বরাজ্য পার্টি ও প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে কলকাতার মেয়র হবার উপযুক্ত—এবং এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ যদি একজন সুযোগ্য লোকের অধিকারে থাকে তাহলে পার্টির দিক থেকে সমূহ লাভ। অবশেষে ম্যুনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনও সর্বসম্মতক্রমে মেয়র পদের জন্য যতীন্দ্র মোহনকেই নির্বাচন করলেন। তবে 'বেঙ্গলি' কাগজ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যেতে লাগল, যতীন্দ্র মোহনের নাম তারা দিল 'সুদূর চট্টগ্রাম থেকে আগত অনধিকার প্রবেশকারী।' 'ফরওয়ার্ড' কাগজ যতীন্দ্র মোহনের সমর্থনে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপলেন—'পরবর্তী মেয়র'। সেই প্রবন্ধে তাঁরা লিখলেন :

'বেঙ্গলি' ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি পূর্ণ উদ্যমে মেয়র পদে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের নাম তোলার বিপক্ষে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের উষ্মা ও অত্যুক্তি দিন দিন এমন আকাশস্পর্শী হয়ে উঠছে যে 'চাঁদের চরকা-কাটা বুড়িও' হয়তো ভয় পেয়ে ভাবতে লেগেছে যে স্বরাজ্য পার্টির এই 'দামাল ছেলেটা' যদি করপোরেশনেরও নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে পৃথিবী নিশ্চয় রসাতলে যাবে। কিন্তু অসূয়ার বিষে কলম ডুবিয়ে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় তাঁরা যেসব প্রবন্ধাদি লিখে চলেছেন, সেগুলি যে কলকাতা সহরবাসীদের নিতান্ত খণ্ডাংশের বিক্ষোভ ব্যক্ত করছে, সে কথা আজ বহু লোকের কাছে পরিষ্কার। আজ পক্ষকালের উপর হল যতীন্দ্র মোহনের নাম মেয়র পদের জন্য বিবেচনাধীন হয়ে রয়েছে। নিজের মতামত ব্যক্ত

করার প্রথম সুযোগেই গান্ধীজী তাঁরই নাম সমর্থন করেছেন। বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁদের কর্মসমিতিতে গত ৯ই তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে একই ব্যক্তির মধ্যে দেশের নেতৃত্ব সংহত করতে হলে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধানকেই মেয়র পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট পড়েছে ৩১টি এবং বিপক্ষে ৬টি। কোনো গুপ্ত বৈঠকে যে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাও নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রায় অব্যবহিত পরেই তো লোকগোচর করা হয়েছে। তবে কী করে বলা যায় যে সহরের করদাতারা যতীন্দ্র মোহনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন? আমরা যতদূর জানি করদাতাদের অমত প্রকাশের জন্য তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয়েরা এ পর্যন্ত কোনো সভায় মিলিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেননি।…বরঞ্চ আমাদের ধারণা গোষ্ঠিবদ্ধভাবে গরিষ্ঠ সংখ্যক করদাতা যতীন্দ্র মোহনের নির্বাচনই সমর্থন করেন। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব নেই এমন কাউকে মেয়র নির্বাচন করা নিয়ে যে একটি চেষ্টা চলেছে, সেটি যে প্রকারান্তরে বাইরের লোকের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার অছিলামাত্র—করদাতারা এতটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি নিশ্চয়ই রাখেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, অন্যান্য কাজের গুরুদায়িত্ব বহন করার পর, মেয়রের কাজ করার মতো শক্তি কিংবা অবসর কী যতীন্দ্র মোহনের থাকবে? এর জবাবে 'ফরওয়ার্ড' বললেন:

এ প্রশ্নটি বিচারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করলেই তো ভালো হয়—তিনিই ভালো বুঝবেন সময়ে অথবা ক্ষমতায় তিনি কুলিয়ে উঠতে পারবেন কিনা। জনসাধারণ যদি তাঁর প্রতি সুবিচার করতে চান তাহলে তাঁকে সেই সুযোগটুকু দেওয়া উচিত। কলকাতার করদাতারা অতীতের কায়েমী স্বার্থের কবলে ফিরে যেতে ইচ্ছা করেন না। দেশবন্ধুর প্রারব্ধ কাজ সমাধা করতে চান—সেই কথাটুকু ভেবে দেখার সময় এসেছে।

মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে যতীন্দ্র মোহনকে অলডারম্যান্‌রূপে নির্বাচিত

হতে হবে। প্রতিপক্ষ তাঁর এই নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। অলডারম্যান পদের জন্য আরো তিন জনের নাম প্রস্তাবিত হল, কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোটের জোরে ১৯২৫ সনের ১৪ই জুলাই তারিখে যতীন্দ্র মোহন অলডারম্যান নির্বাচিত হলেন।

অতঃপর মেয়র নির্বাচনের পালা—রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দোপাধ্যায় যতীন্দ্র মোহনের নাম প্রস্তাব করলেন, প্রস্তাব সমর্থন করলেন এম.এ. রাজ্জাক। একজন য়ুরোপীয়কে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো হয়। ভোট নিয়ে দেখা গেল যতীন্দ্র মোহনের ভাগে ভোট পড়েছে ৫২ এবং য়ুরোপীয়ের ভাগে মাত্র ১৭টী। ভোটের ফলাফল ঘোষিত হল বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে। য়ুরোপীয় দলের নেতা মিঃ ফেল্‌পস্ যতীন্দ্র মোহনের হাত ধরে মেয়রের আসনে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর ফেল্‌পস্ ও অন্যান্য সকলের অভিনন্দনের উত্তরে নতুন মেয়র বললেন :

> কলকাতা করপোরেশনের অলডারম্যান্ ও কাউন্সিলের মণ্ডলী! আপনাদের প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরলোক গমনের পর তাঁর এই শূন্য আসনে আমায় নির্বাচন করে আমার প্রতি যে বিশেষ সম্মান আপনারা প্রদর্শন করলেন তার জন্য আমি আপনাদের সকলের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। ত্যাগের শক্তিতে দেশবন্ধু ছিলেন অসাধারণ, গভীর ছিল তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর সংগঠন শক্তি ছিল বিরাট, সর্বোপরি তাঁর দেশভক্তির তুলনা হয়না। দেশের কাজে কখনো তাঁর ক্লান্তি ছিলনা—তিনি সত্যই ছিলেন দেশের পরম হিতৈষী একজন বন্ধু। আমি আপনাদের করযোড়ে নিবেদন করছি আপনাদের হৃদয়ের ঔদার্যগুণে আপনারা যেন আমার মহান নেতা দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির তুলনা করে আমায় লজ্জা না দেন।

যতীন্দ্র মোহন বললেন মেয়র নির্বাচন করে তাঁর প্রতি যে সম্মান দেখানো হল সে তাঁর ব্যক্তিগত সম্মান নয়, করপোরেশনে দেশবন্ধু কাউন্সিলরদের সহযোগে যে কাজ করে গেছেন, যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন—এ হল তারই স্বীকৃতি।

তাঁর কর্মসূচীতে দেশবন্ধু কোন্ কোন্ লক্ষ্যসাধনের কথা বলে গেছেন অতঃপর যতীন্দ্র মোহন সেগুলির উল্লেখ করলেন : (১) করপোরেশন এলাকায় বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, (২) দুঃস্থ দরিদ্রদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা, (৩) সস্তায় পরিষ্কার স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য ও দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা, (৪) পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জলের সন্তোষজনক সরবরাহ ব্যবস্থা, (৫) বস্তি ও বহুজন-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা, (৬) গরীবের জন্য আশ্রয়স্থান, (৭) সহরের উপকণ্ঠ অঞ্চলের উন্নতিসাধন, (৮) যানবাহনের সুব্যবস্থা এবং (৯) অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে শাসন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

দেশবন্ধুর নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সময় সাপেক্ষ হলেও এই কার্যসূচী তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রযত্ন করবেন—যতীন্দ্র মোহন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। দেশবন্ধু মেয়র থাকা কালে বেশি কাজ করা সম্ভবপর হয়নি তার কারণ এই যে করপোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসর সুভাষচন্দ্র বসুকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিনা বিচারে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছে। যতীন্দ্র মোহন বললেন :

> কারামুক্ত হয়ে তিনি করপোরেশনে তাঁর স্বস্থানে ফিরে আসুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা হলে আমাদের এই কার্যসূচী রূপায়িত করতে বিলম্ব হবেনা, আমরা তখন দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহে দেশবন্ধুর প্রারব্ধ সুসম্পন্ন করতে পারব।

যতীন্দ্র মোহন অতঃপর বললেন যে একথা সত্য তিনি মূলত রাজনীতির লোক ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জনৈক সদস্য, কিন্তু পার্টির খাতিরে তিনি কখনো করদাতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। সকলকে নিশ্চিতি দিয়ে তিনি বললেন যে করপোরেশনের তাবৎ সমস্যার বিচার তিনি করবেন কলকাতার নাগরিক হিসাবে—রাজনীতিক হিসাবে নয়। সর্বশেষে তিনি বললেন মেয়র হিসাবে তাঁর সাফল্য ও কৃতিত্ব বহুলাংশে নির্ভর করবে কাউন্সিলারদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর।

সে সময় অনেকে মনে করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রভাব বিস্তার করার ফলে যতীন্দ্র মোহনের নির্বাচন সম্ভবপর হয়েছে। গান্ধীজী তাঁর অনুকূলে ছিলেন সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচন ব্যাপারে তাঁর কোনো হাত ছিলনা। ১৯২৫ সনের ১৮ই জুলাই তারিখে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে তাঁর নিম্নোধৃত লেখা থেকে তাঁর মতামত স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় :

মেয়র নির্বাচনে আমি অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছি—এই অনুমানে বাংলার কতিপয় বন্ধু আমার প্রতি বিরক্ত হয়েছেন। সাধারণ শিষ্টতার খাতিরে এ সম্পর্কে আমার কিছু বলা দরকার। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে জাতির অপূরণীয় ক্ষতির কথা ভেবে আমি বাংলার পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, বাসন্তী দেবী ও তাঁর অনাথ সন্তানদের শোকাশ্রু মুছিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা বিধানে চেষ্টিত হয়েছিলাম। সেই সঙ্গেই আমি স্থির করে রেখেছিলাম আমি তাঁদের প্রয়োজনমত সকলের কাছাকাছি থাকব কিন্তু জোর করে কারো উপর কিছু চাপাতে যাবো না। পরলোকগত বন্ধু ও সহকর্মীর স্মৃতির প্রতি এটি ছিল নিতান্তই আমার শ্রদ্ধার কৃত্য-বিশেষ। দেশবন্ধুর নামে নিখিলবঙ্গ স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুখ্যত আমারই দায়িত্ব থাকায় অনিবার্যভাবে বাংলায় আমার বেশ কিছুদিন থাকতে হয়। পরবর্তী ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় আমার থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি তখন ঘুণাক্ষরে ভাবিনি যে দেশবন্ধুর জায়গায় কলকাতার মেয়র নির্বাচনে আমার উপদেশ নির্দেশের প্রয়োজন হতে পারে। সম্ভব হলে এ কাজে হস্তক্ষেপ না করতে হলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈন্যদের অনেক সময় আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ করার স্বাধীনতা থাকে না। নির্বাচনের ব্যাপারে কয়েকজন আগ্রহী ব্যক্তি যখন এ প্রশ্ন আমার কাছে উপস্থিত করলেন, আমার বুদ্ধিবিবেক অনুসারে এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অনুচিত হত। একবার এ আবর্তে প্রবেশ করার পর, যতদিন না কংগ্রেস

ম্যুনিসিপ্যাল এসোশিয়েশন এ সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত না নিলেন, আমার পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভবপর ছিলনা।

মহাত্মা বললেন তিনি এমন উপদেশই দিয়েছিলেন যা না কি দেশের পক্ষে কল্যাণকর এবং যা দেশবন্ধু স্বয়ং খুশি হয়ে মেনে নিতেন। গঠনমূলক কাজ সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য চার বছর আগে, ম্যুনিসিপালিটি ও লোকাল বোর্ডগুলির ক্ষমতা করায়ত্ত করার নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছেন। এতে করে কংগ্রেসের রাজনীতিক আন্দোলনও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা যায়। এতে তো কোনো অন্যায় নেই। লণ্ডনের কাউন্টি কাউন্সিলেও তো নির্বাচন হয় রাজনীতিক মতের ভিত্তিতে। মহাত্মা গান্ধী লিখলেন :

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশবন্ধু কলকাতা করপোরেশনের ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন এবং সেই ক্ষমতা এমন ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যাতে করে কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য পার্টির (বাংলায় উভয় সংস্থা সমার্থক) শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি কি করপোরেশনের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছিলেন ? আমি দৃঢ়ভাবে বলব তিনি তা করেন নি, রাষ্ট্রিক উন্নতির প্রতি তিনি যেমন লক্ষ্য রেখেছিলেন পৌর-সংস্থার উন্নতির প্রতিও তাঁর তেমনি লক্ষ্য ছিল।

ম্যাক্‌সুইনীর সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের তুলনা টেনে তিনি বললেন, কর্ক সহরের মেয়র যখন হলেন, ম্যাক্‌সুইনী ব্যক্তিগত মানমর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র করেননি, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অধিকতর শক্তি সঞ্চার করতে পারবেন—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত যিনি হলেন তাঁকে যে ম্যাক্‌সুইনীর তুলনায় অনেক তীব্র সংকটের মুখোমুখি হতে হবে, এই কথার সূত্রে মহাত্মা বললেন :

ম্যাক্‌সুইনী কেবল তাঁর জীবন বিপন্ন করেছিলেন। দেশবন্ধুর উত্তর সাধককে তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করতে হবে কারণ তাঁর কাজের দ্বারাই তাঁর সুনাম, তাঁর পরিচয়। দেশবন্ধু যে ত্যাগ ও আত্মমর্যাদার আদর্শ

স্থাপন করে গেছেন, তা থেকে তিনি যদি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন, তাহলে চিরতরে তাঁর সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে। অপযশের জীবন অপমৃত্যুর চেয়ে অধম। শরীরের ক্ষয় বরঞ্চ সহ্য করা যায় কিন্তু আত্মসম্মান খুইয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার মতো দুর্গতি অসহনীয়। মেয়র পদে যতীন্দ্র মোহনের দাবির সমর্থনে যে সকল যুক্তি ও বিচার আমার নিজের মনে উদিত হয়েছে সেগুলি আমি আমার কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছি।

কংগ্রেস পার্টি ও কংগ্রেসের ম্যুনিসিপাল পার্টির সদস্যেরা মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য যথাযথ প্রণিধান করেছিলেন। যতীন্দ্র মোহন যে দেশবন্ধুর আদর্শ রূপায়িত করার ক্ষমতা রাখেন, এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সন্দেহমাত্র ছিলনা, সেই জন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন :

পৌর জীবনের আদর্শ আমি ভালোবাসি, পৌর জীবনের বিশেষ তাৎপর্য বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহল। তৎসত্ত্বেও আমি যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব কোনো একজন ব্যক্তির মধ্যে একত্র যুক্ত করার মতো বিপজ্জনক সম্ভাবনা মেনে নেবার পরামর্শ দিয়েছি, তার কারণ এই যে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে গেলে শক্ত হতে হবে, বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।...ভগবান যেন এই বিরাট দায়িত্ব বহন করার মতো জ্ঞান ও শক্তি যতীন্দ্র মোহনকে দেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
কলকাতার মেয়র

যতীন্দ্র মোহন পর পর পাঁচ বার কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর ফলে প্রমাণ হয়েছিল কংগ্রেস ও করপোরেশন যুগপৎ কদম মিলিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, যদি উভয়ের কর্ণধার একই ব্যক্তি হন। দেশবন্ধুর আদর্শের প্রতি সুগভীর আস্থা ও আনুগত্য ছিল মেয়র হিসাবে যতীন্দ্র মোহনের কৃতিত্ব। তাঁর প্রতি প্রীতিবশত দেশের লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'দেশপ্রিয়'। তাঁকে নিয়ে গৌরব করতে গিয়ে লোকে তাঁকে 'বাংলার পুরুষসিংহ' বলেও উল্লেখ করত। বাস্তবপক্ষে তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোমল ও কঠিনের একটি সুচারু সমন্বয় ঘটেছিল। মানুষের প্রতি প্রীতিতে তিনি ছিলেন কোমল আবার সংকল্প সাধনে তিনি ছিলেন অনমনীয়।

পক্ষপাতশূন্য আচরণ, হৃদয়ের ঔদার্য ও অপরিসীম ধৈর্যের গুণে নূতন মেয়র কলকাতার লোকেদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। যখন দ্বিতীয় বার তিনি মেয়র নির্বাচিত হলেন বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরাও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। অমায়িক ব্যক্তিত্বগুণে তিনি য়ুরোপীয় সদস্যদেরও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। করপোরেশনের কাজে রাজনীতির অনুপ্রবেশ তিনি ঘটতে দিতেন না, করদাতাদের নাগরিক সুখ সুবিধা বিধানই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। পর পর পাঁচ বছর মেয়র থাকা কালে যতীন্দ্র মোহন কলকাতা করপোরেশনের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন, ভারতের অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলকাতার স্থান ছিল বেশ উঁচুতে। তাঁর হাতে কলকাতা করপোরেশন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বকৃতি লাভ করেছিল।

যতীন্দ্র মোহন যখন মেয়র হলেন তখন খ্রীষ্টান মিশনের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বাদ দিলে মেয়েদের জন্য ভালো প্রাইমারী স্কুল খুবই কম ছিল। যতীন্দ্র মোহনের আমলে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা

শতকরা পঞ্চাশভাগ বৃদ্ধি পায়। বিনা বেতনে সারা সহরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করার যে স্বপ্ন দেশবন্ধু দেখেছিলেন, দেশপ্রিয় সেটাকে বাস্তবে পরিণত করায় মন দিলেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ ছিল যতীন্দ্র মোহনের স্বভাবগত। এ বিষয়ে করপোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর যোগ্য সহযোগী। করপোরেশনের কর্মী নিয়োগ নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

> নূতন ব্যবস্থায় করপোরেশনকে যুগধর্ম মেনে চলতে হয়েছিল। চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবার জো ছিলনা। জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের দাবী যথোচিত আনুকূল্য সহকারে বিবেচিত হত।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তা নিয়ে প্রচুর নূতন নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে থাকে। আহার্যদ্রব্য যাতে বিশুদ্ধ হয়, স্বাস্থ্যসম্মত হয় ও সুলভ হয় এবং খাঁটি দুধের সরবরাহ যাতে বৃদ্ধি করা যায়—সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছিল। পরিশ্রুত ও অপরিশ্রুত জলের সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে বস্তি-অঞ্চলে স্নানশৌচাদির উন্নততর আয়োজন করা সম্ভবপর হয়েছিল।

যতীন্দ্র মোহন প্রথম যেবার মেয়র হন তখন থেকেই সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও একতা রক্ষার জন্য তাঁর নিরন্তর চেষ্টা ছিল, সেজন্য তিনি একাধিক সুনির্দিষ্ট উপায়ও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হবার পর বড়বাজার অঞ্চলে বেশ উগ্রধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হয়। মুসলমানের মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের বাদ্যভাণ্ডসহকারে ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করা নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষির সূত্রপাত। একটুও ইতস্তত না করে যতীন্দ্র মোহন অকুতোভয়ে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। বড়বাজারের পরিস্থিতি ছিল বিপজ্জনক, কিছুদিন আগেই অনুরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে কানপুরে গণেশ শংকর বিদ্যার্থী প্রাণ

হারিয়েছেন। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যতীন্দ্র মোহন মহল্লায় মহল্লায় হিন্দু-মুসলমানদের শান্তি বাহিনী গঠন করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, কিরণ শংকর রায়, সাতকড়িপতি রায় এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়। দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এঁরাও দেশপ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় করপোরেশনের কাজে নানারকম বিঘ্ন ঘটেছিল, ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনা জমে উঠেছিল পর্বতপ্রমাণ। এই সব স্তূপাকার আবর্জনা অপসারণ করবে কে—কেমন করে করবে? যতীন্দ্র মোহন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করলেন এক আশ্চর্য উপায়ে—মহল্লায় মহল্লায় তরুণ বয়স্ক সকল ব্যক্তি ও সমাজহিতৈষী সজ্জনদের কাছে তিনি সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন যেন তাঁরা এগিয়ে এসে নিজেদের চেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান করেন। তাঁরা সত্যই সদলবলে এগিয়ে এসে আবর্জনা পরিষ্করণে লেগে গেলেন। তাঁদের এই জনসেবা ও সমাজ সেবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে যতীন্দ্র মোহন বিশেষ অভিভূত হয়ে বলেছিলেন:

> করপোরেশনের ১ ও ২নং মহল্লার বিভিন্ন স্থানে দলে দলে উৎসাহী যুবক ও সমাজহিতৈষী সজ্জনেরা এগিয়ে এসেছেন, করপোরেশন কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সাফাইয়ের কাজ করেছেন—এজন্য আমি ও আমার করপোরেশনের সদস্যবৃন্দ এঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তাঁরা নিজেদের হাতে ঝাড়ু দিয়েছেন, নর্দমা সাফ করেছেন এবং স্তূপাকার আবর্জনা অপসারণে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁদের এই মহামূল্য সহযোগিতা না পেলে এত অল্প সময়ের মধ্যে করপোরেশনের পক্ষে একাজ সমাধা করা অসম্ভব হত।

দাঙ্গা শেষ হল বটে, কিন্তু বাংলাদেশের গায়ে সেই যে ক্ষতচিহ্নের দাগ রেখে গেল তা সহজে মিলিয়ে গেল না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পূর্বেকার সম্প্রীতি

ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যেতে লাগল। বিধানসভায় নির্বাচনের সময় যখন এল, দেখা গেল মুসলমানদের অনেকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেরাই ভোটযুদ্ধে জোট বাঁধলেন। সরকার ঠিক এই রকমই চেয়েছিলেন প্রথম থেকে, তাঁরা ভেবেছিলেন ভারতের মতো বিরাট দেশ শাসন করতে যদি হয় তাহলে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্য ভাঙতে হবে ; পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উস্কানি দিয়েই তো মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও এতদিন দোর্দন্ত প্রতাপে তাঁরা রাজত্ব করে এসেছেন। কংগ্রেস দলে যারা রয়ে গেল, মুসলমান হলেও তাদের বলা হল হিন্দু। ১৯২৫ সনের ডিসেম্বরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে কানপুরে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনেই বাংলাদেশে দেশবন্ধু-প্রবর্তিত হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এখন দাঙ্গার ফলে দেশবন্ধুর বাংলাদেশেই সে চুক্তি নাকচ হয়ে গেল। করপোরেশনের পনেরো জন মুসলমান সদস্য পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। মেয়র হিসাবে যতীন্দ্র মোহন তা গ্রহণ করতে রাজি হননি, তিনি জানতেন গ্রহণ করা হলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। তাঁর এই তথাকথিত মুসলমান-তোষণে গোঁড়া হিন্দুর দল ক্ষেপে গিয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হননি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্রমাগত প্রয়াসের ফলে পনেরো জনের মধ্যে বারো জন মুসলমান সদস্য তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন ও করপোরেশনের সদস্য থেকে যান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণনগর ও প্রদেশ কংগ্রেসে ভাঙন

১৯২৬ সনের ২২শে মে তারিখে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে কৃষ্ণনগরে। সভারম্ভের পূর্বেই সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মুদ্রিত সভাপতির অভিভাষণ ডেলিগেটদের হাতে হাতে বিলি করা হয়। অভিভাষণের মুখ্য বক্তব্য ছিল এই যে, যেহেতু কংগ্রেস মূলতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের অহিংস সংগ্রামীদের প্রতিষ্ঠান, সেজন্য যাঁরা অহিংসানীতিতে আস্থালেশহীন এবং সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী তাঁদের উচিত কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করা। তাঁর এই মন্তব্যে ডেলিগেটদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়—শাসমলকে বলা হয় তিনি যেন এই বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। তিনি বললেন এটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এবং সভাপতিরূপে এই মত প্রকাশের অধিকার তাঁর অতি অবশ্যই আছে। ডেলিগেটদের কেউ কেউ যদি এই মতামতের বিরোধিতা করতে চান—সে তারা নিশ্চয়ই করতে পারেন, অন্যথায় ভোট গ্রহণ করাও চলতে পারে। বিপ্লবী-ভাবাপন্ন ডেলিগেটরা এ প্রস্তাব মেনে নিলেন না উল্টো শাসালেন সভাপতি যদি তাঁর অভিভাষণে আপত্তিকর কথাগুলি তুলে না দেন তাহলে তাঁরা সভা পণ্ড করবেন। যতীন্দ্র মোহন আপোষ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করলেন। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট সরোজিনী নাইডুও উপস্থিত ছিলেন—তিনিও চেষ্টা করলেন যাতে সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে। শেষ পর্যন্ত শাসমল বিপ্লবীদের বিষয়ে মন্তব্যটুকু তাঁর ভাষণ থেকে তুলে নিতে স্বীকৃত হলেন। ভাষণ দিতে যখন উঠলেন সভাস্থ সকলকে জানিয়ে দিলেন মুদ্রিত বক্তৃতার একটি অংশে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে থাকলেও, অন্যদের তাতে আপত্তি থাকায় বাধ্য হয়ে তাঁকে সে অংশ বাদ দিয়ে বলতে হচ্ছে। এই কথা বলতেই সভায় তুমুল হট্টগোল, শাসমলকে বলা হল ক্ষমা চাইতে। তিনি তখন বললেন সভাপতি হিসাবে তাঁর প্রতি কিছু সদস্যের অনাস্থা থাকায় তিনি

সে পদে ইস্তফা দিলেন। এই বলে সভাপতির আসন ছেড়ে তিনি সদস্যদের সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন। যতীন্দ্র মোহন সভাপতিকে অনুরোধ করলেন যেন তাঁর অভিভাষণ তিনি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন, কোনো অংশে যদি কোনো সদস্যের আপত্তিকর কিছু থাকে তাঁরা তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। সদস্যেরা আবার হৈ চৈ করে যতীন্দ্র মোহনকে বসে পড়তে বাধ্য করলেন। তখন সরোজিনী নাইডু উঠে দাঁড়ালেন সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য, তিনি বললেন :

> আমি বাংলার মেয়ে। বাঙালা হিসাবে আমি যা বলব সে আপনাদের শুনতেই হবে। যেসব অংশ নিয়ে আমাদের অনেকে আপত্তি তুলেছেন, শাসমল সে অংশগুলি তাঁর ভাষণ থেকে তুলে দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে এ হল এক ধরনের দুঃখ প্রকাশ। যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, স্বাধীনতার যাঁরা পূজারী—মনে বচনে যাঁরা স্বাধীন হতে চান, তাঁদের উচিত নিজের মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে অন্যকে না বঞ্চিত করা। স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে গণতন্ত্র বিরোধী আচরণ কিংবা হৃদয়হীন অসৌজন্যকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। এখন আপনারা বলুন আপনাদের হয়ে কি আমি সভাপতিকে পুনরায় তাঁর আসন গ্রহণের জন্য ও সভার কাজ চালানর জন্য অনুরোধ করতে পারি ?

অতঃপর তিনি নিজে গিয়ে শাসমলকে বলায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন, তাঁর অভিভাষণও পাঠ করলেন। সবাই ভাবল সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে গেল।

কিন্তু পরের দিনই উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রস্তাব আনলেন সভাপতির অভিভাষণের কতিপয় অংশ সদস্যদের মতে আপত্তিকর বলা হোক। যতীন্দ্র মোহন সংশোধিত প্রস্তাবে বললেন বরং বলা হোক অভিভাষণের কতিপয় অংশের সঙ্গে সদস্যরা সভাপতির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। সংশোধিত প্রস্তাব

গৃহীত হলে পর শাসমল সভাস্থল ত্যাগ করেন। এই অদ্ভূত পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন বসল। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষীয়ের প্রতিবন্ধ সৃষ্টির ফলে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগেই সভার কাজ মুলতুবী রাখা হয়। বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের একটি সভায় শাসমলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে শ্রী চৌধুরীকে সভাপতি নির্বাচন করেন এবং ১৯২৫ সনের হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট নাকচ করার প্রস্তাব নেন।

কৃষ্ণনগরের ম্যুনিসিপ্যালিটি স্থির করেন সরোজিনী নাইডু ও যতীন্দ্র মোহনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধিত করা হবে সহরের পক্ষ থেকে। সরোজিনী নাইডু সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়ে মানপত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু যতীন্দ্র মোহন বলেন যেহেতু কলকাতার মেয়র হিসাবে তিনি কৃষ্ণনগরে আসেননি, তাঁর পক্ষে মানপত্র গ্রহণ করা অনুচিত হবে, তাছাড়া তাঁর মতে ঠিক সেই সময়ে সহরের প্রধান অতিথিরূপে গণ্য করার মতো একজনই লোক ছিলেন তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র নাথ শাসমল।

কৃষ্ণনগরের এইসব ঘটনার কিছুকাল পরে ১৯২৬ সনের ১৩ই জুন তারিখে যতীন্দ্র মোহন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। ইতিপূর্বে একটি পত্রযোগে কমিটিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৫ সনে সম্পাদিত হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বজায় রাখা উচিত এবং কমিটি তা নাকচ করে দিতে পারেন না। কমিটির কোনো কোনো সদস্য এই চুক্তি ভেঙে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই বিশেষ অধিবেশনে শ্রী চৌধুরীকে সভাপতি করে কৃষ্ণনগরে যে অধিবেশন হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এই বিশেষ অধিবেশন যতীন্দ্র মোহনের রাজনীতিক জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। সদস্যেরা ছিলেন তিন দলে বিভক্ত—যতীন্দ্র মোহনের পক্ষে ছিল একটি দল, আর একটি দল ছিল তাঁর বিপক্ষে। ললিত মোহন দাসের নেতৃত্বে যে তৃতীয় দলটি গড়ে উঠেছিল তারা না ছিল এ পক্ষে না ও পক্ষে—নিজেদের মতে তারা ছিল নিরপেক্ষ।

সকলের মনেই চাপা উত্তেজনা। কিরণ শংকর রায় প্রস্তাব করলেন যেহেতু শ্রী চৌধুরী ডেলিগেট হয়ে কৃষ্ণনগরে যাননি, সভাপতি হয়ে সভা পরিচালনা করায় তাঁর কোনো এক্তিয়ার ছিলনা। অতএব সে সভার কার্যবিবরণী গ্রহণীয় হতে পারেনা। প্রস্তাব গৃহীত হল। স্থির হল হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট বহাল থাকবে। অপর একটি প্রস্তাবের জোরে স্থির হয় যে প্রদেশ কংগ্রেসের তদানীন্তন কর্মসমিতি বাতিল করে দেওয়া হবে এবং যতীন্দ্র মোহনের উপর ভার দেওয়া হবে নূতন সমিতি গঠন করবার। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা জানানোর উদ্দেশ্যে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শরৎ চন্দ্র বসু সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যান। তৎসত্ত্বেও নূতন কর্মসমিতি গঠিত হল—স্থির হল জিলা কংগ্রেস কমিটি থেকে ৩০ জন সদস্য নেওয়া হবে এবং বাকি ৩০ জনকে নির্বাচন করে নেবেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট।

এই বিশেষ অধিবেশনের বিবরণ দিয়ে 'ফরওয়ার্ড' কাগজের সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী 'Contraband Carriers' অর্থাৎ 'চোরাইচালানকারী' নাম দিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করে ছাপতে দেন। শোনা যায় রাত এগারোটার সময় শরৎ চন্দ্র বসুর আদেশক্রমে এই প্রবন্ধ ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরের দিন কাগজের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ সম্পাদক পদ থেকে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীকে বরখাস্ত করেন কারণ তিনি যতীন্দ্র মোহনের পক্ষপাতী বলে একটা রটনা হয়। 'ফরওয়ার্ডের' সম্পাদকীয় নীতিতে রাতারাতি অদলবদল হয়ে গেল। কিছুদিন পরে চক্রবর্তীর সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'বসুমতী' কাগজের ইংরেজী সংস্করণে। এই ভাঙনের ফলে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসমিতি থেকে যে পাঁচজন সদস্য পদত্যাগ করলেন তাঁরা হলেন তুলসী চরণ গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, নলিনী রঞ্জন সরকার, শরৎ চন্দ্র বসু ও সুরেশ চন্দ্র দাস। বাংলার 'বিগ্ ফাইব' বলে পরে যাঁরা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন সেই পাঁচজন প্রথম শ্রেণীর নেতা—ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, তুলসী চরণ গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, নলিনী রঞ্জন সরকার ও শরৎ চন্দ্র বসু—প্রকাশ্য ঘোষণাযোগে

যতীন্দ্র মোহনের নীতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যতীন্দ্র মোহনও তাঁদের অভিযোগ খণ্ডন করে প্রত্যুত্তর দিলেন। দুই দলের মধ্যে ফাটলটা ক্রমেই বিস্তৃততর হতে লাগল। অথচ দুটি বিবৃতি পাশাপাশি পড়ে দেখলে দেখা যায় নীতি বা আদর্শের দিক থেকে দুই দলে সত্যকার কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু একবার যখন ভাঙন ধরে তখন পরস্পরের খুঁত ধরতে বেগ পেতে হয়না—অনেক মনগড়া ত্রুটি চোখে পড়তে থাকে। বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে এই ভেদবুদ্ধির ফলে সেই যে ফাটল ধরা শুরু হল, অনেক জোড়াতাড়া লাগিয়েও তার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করা গেলনা। ভেদাভেদ ও আপোষ মীমাংসা নৈমিত্তিক হয়ে দেশের লোকের মনে প্রচুর বিভ্রান্তির সূচনা হল।

কৃষ্ণনগর কন্‌ফারেন্স বিষয়ে বলতে গিয়ে ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়া বলেছিলেন বাংলায় বিরুদ্ধবাদের সূত্রপাত হয় কৃষ্ণনগর থেকেই। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রতিপক্ষকে প্রশমিত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ভূমিকম্পের গুর গুর ধ্বনির আর বিরাম হয়নি। সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ

> বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল চন্দ্র চন্দ্রের মতো ব্যক্তি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিসম্বাদ বেধেছিল মূলতঃ হিন্দু-মুসলিম প্যাক্‌টকে কেন্দ্র করে। সেনগুপ্তের তিন দফা দাবী ছিল ঃ (১) প্যাক্‌ট নাকচ করা চলবেনা, (২) কৃষ্ণনগর অধিবেশন বাতিল করে দিতে হবে, এবং (৩) সরকারের অধীনে পদাধিকারী হওয়া চলবে না। দুই দলের মধ্যে এই নিয়ে পার্থক্য বেড়েই চলল। বিপক্ষ দল অভিযোগ করল সেনগুপ্ত তাঁর খেয়ালখুশিমাফিক চলেন, পল্লী সংগঠনে তাঁর স্পৃহা নেই এবং সে কাজের জন্য সংগৃহীত তহবিলের খরচ খরচা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, যাঁরা তাঁকে উচ্চাসনে বসিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তিনি কোনো সম্বন্ধ রাখেন না এবং কংগ্রেসের কর্মসমিতিতে ৩০ জন নির্বাচিত সদস্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সমসংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করার অধিকার নিজের হাতে তুলে

নিয়েছেন। কর্মসমিতির নির্বাচিত সদস্যেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্মল চন্দ্র চন্দ্র ও শরৎ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।*

এই দলগত দলাদলি চলেছিল যতীন্দ্র মোহনের জীবনের শেষ অবধি এবং এর ফলে তাঁর শেষ জীবনের হ্রস্ব কয়েকটি বছর দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল। নানা বিপদের মুখোমুখি তাঁকে লড়তে হয়েছে, কিন্তু একথা নিশ্চিত বলা যায় যে কখনো তিনি বিবেকবুদ্ধিকে নিছক সুবিধার কাছে বিক্রয় করেননি, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আপোষ করতে চাননি। বাইবেল-বর্ণিত সেই সোজা ও সংকীর্ণ পথে তিনি তাঁর জীবন চালনা করেছেন—যদিচ অনেক সময় তাঁকে একা একা পথ চলতে হয়েছে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের তরী যখন বন্দরে গিয়ে তার নোঙর ফেলেছে, লোকের আর বুঝতে বাকী থাকেনি যে সততায় ও দেশভক্তিতে তাঁর তুলনীয় লোক দুর্লভ।

* ডক্টর পটভি সীতারামাইয়া :History of the Indian National Congress পৃঃ ২

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
কাউন্সিল নির্বাচন ও পুনরায় মেয়র

১৯২৬ সনের শরৎকালে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন শুরু হল। কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যতীন্দ্র মোহনকে ভ্রমণ করতে হল। খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তাঁর সময় কাটছে। বাংলার অক্লান্ত কর্মী নেতার কাছ থেকে বিহারের রাজেন্দ্র প্রসাদ বাণী চেয়ে পাঠালেন, মাদ্রাজে প্রকাশম্ ও অপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চাইলেন তিনি এসে যেন তাঁদের নির্বাচন অভিযান জোরদার করে তোলেন, 'হিন্দু' কাগজে তাঁর স্বাক্ষরিত নির্বাচনী ইস্তাহার বেরোতে লাগল। তাঁর নিজের বাংলাদেশে একতাশক্তি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও যতীন্দ্র মোহন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন।

নির্বাচনী অভিযান চলতে থাকা কালে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের আচরণ নিয়ে তাঁকে কঠোর সমালোচনা করতে হল। ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বেঙ্গল য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বাংলার গভর্ণর লর্ড লীটন ও ভারতের ভাইসরয় লর্ড আর্উইন। এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ল্যাং ফোর্ড জেমস্ তাঁর বক্তৃতায় একটা আভাষ দিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা কিংবা তাদের কাজে সহযোগিতা করা থেকে য়ুরোপীয়েরা দূরে দূরে থাকলেই সম্প্রদায়ের মঙ্গল। এসোসিয়েটেড প্রেস্ প্রতিনিধির কাছে যতীন্দ্র মোহন একটি বিবৃতিযোগে বললেন :

ভারতীয়েরা য়ুরোপীয়দের য়ুরোপীয় হিসাবেই দেখে। তাঁদের মধ্যে কে সরকারী কর্মচারী কে নয়—এনিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়না। আমার মতে য়ুরোপীয়দের মধ্যে হেরফের করতে না যাওয়াই ভালো—যাদের এইরকম স্বার্থ তারা একই গোষ্ঠীর লোক। এই তো কিছু দিন আগে লর্ড লীটন বিশেষ করে বললেন ভারতবাসী ও ইংরেজদের মধ্যে পরস্পরে বিশ্বাস যত বৃদ্ধি পায় ততই

ভালো। কিন্তু মহামান্য বাংলার গভর্ণর বাহাদুর এবং স্বয়ং ভারতের ভাইসরয়ের উপাস্থিতিতে য়ূরোপীয় এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেদিন একটি সোজা 'না' বলে লর্ড লীটনের প্রস্তাব ধূলিসাৎ করে দিলেন। অথচ সম্মানিত অতিথি দু'জনের কেউই সে কথার প্রতিবাদ করলেন না। এসব দেখে শুনে একটি কথাই মনে হয় 'পরস্পরে বিশ্বাস' 'সহযোগিতা'—এ সমস্তই কথার কথা—ব্যর্থ পরিহাস।

ল্যাংফোর্ড জেমস্ যদি য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট না হতেন, তাহলে তাঁর বক্তৃতা নিয়ে মাথা না ঘামালেও ক্ষতি হতনা। কিন্তু কংগ্রেসের জনৈক নেতা এবং কলকাতার মেয়র হয়ে যতীন্দ্র মোহন কি ছেড়ে কথা কইতে পারেন ? কলকাতায় বসবাসকারী য়ুরোপীয় নাগরিকদের এই ধরনের যদি মনোবৃত্তি হয়, তাহলে ভারতীয় নাগরিকেরাই বা তাদের ছেড়ে কথা কইবে কেন। যতীন্দ্র মোহনের সে জন্য মনে হল য়ুরোপীয়দের সাবধান করে দেওয়া দরকার। তাই তিনি এই বিবৃতিতেই বললেন :

> কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাশীল, কংগ্রেসের সদস্যেরা পণ করেছেন যে ভারতের স্বরাজ লাভের সংগ্রাম হবে অহিংস সংগ্রাম। জনগণকে শান্ত সংহত রাখায় কংগ্রেসের প্রচেষ্টা মিষ্টার ল্যাংফোর্ড জেমসের মতো কোনো কোনো ভদ্রলোক ব্যর্থ করে দিতে পারেন—একথা ভাবতেও আমি বেদনা অনুভব করি।

লোকে বলাবলি করত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের তলায় তলায় একটা রেষারেষী ছিল। লোকে একখানা বলতে গিয়ে পাঁচখানা বলে ফেলে— এই জনরব হয়তো তারই প্রমাণ, কারণ তাঁদের দুজনের মধ্যে সত্যকার প্রীতি ছিল। যতীন্দ্র মোহন প্রথম যেবার কারারুদ্ধ হন, সুভাষ ও তিনি একই সঙ্গে আলিপুর জেলে ছিলেন। তখন ওয়র্ডরদের সঙ্গে কী একটা গোলযোগে দুজনেই আহত হন। সুভাষের আঘাত কিঞ্চিৎ গুরুতর হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন সুভাষকে নিয়ে যতীন্দ্র মোহনের সে কী দুর্ভাবনা। তাঁর এই

বয়োকনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গীটীর জন্য তাঁর মনে সর্বদাই একটা স্নেহমিশ্রিত উদ্বেগ ছিল আবার শ্রদ্ধাও ছিল। তিনি বলতেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মনান্তর কিংবা মতান্তর হলে তিনি আলাপে আলোচনায় তা মিটিয়ে নেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। দুঃখের কথা এই যে বাইরের দুষ্ট প্রভাব তাঁদের দুজনের মধ্যে ভেদাভেদের একটা বাধা রচনা করেছিল। অথচ সে অন্তরালের কোনো প্রয়োজন ছিলনা। সুভাষ তখন জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যতীন্দ্র মোহন একটি বক্তৃতায় বললেন :

আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠানের চীফ একজিকিউটিব অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুর বর্তমান শারীরিক অবস্থায়, কলকাতা নাগরিকদের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সকলের মনে সর্বাগ্রে একটি অনুভূতি জাগছে—সে অনুভূতি দুশ্চিন্তার উদ্বেগ। তাঁর অসুস্থতা বিষয়ে শেষ খবর আমরা যা পেয়েছি, তাতে এ উদ্বেগ কেবল করপোরেশনের কাউন্সিলর ও অফিসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হয়না। এই মুহূর্তে এখানে বসে আমরা যে উদ্বেগ অনুভব করছি, খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্বেগ দেশের সর্বত্র, প্রতিটি বাঙালী হৃদয়ে অনুভূত হতে থাকবে। ঘুষঘুষে জ্বর, রাতে সারা শরীরে ঘাম, মেরুদণ্ডে বেদনা—এগুলি কোনো উপেক্ষণীয় ব্যাধির লক্ষণ নয়। এসব উপসর্গ যদি দেখা দিয়ে থাকে তাহলে কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে যে সুদূর মান্দালয় জেলের নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে সুভাষচন্দ্রের দেহ তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আজ আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এসে উপস্থিত, এই বিশেষ মুহূর্তে দুঃখে উদ্বেগে আমরা এমন গভীর ভাবে অভিভূত যে এ সময় আমরা কোনো বিবাদ বিতর্কের প্রসঙ্গ তুলতে চাই না। সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড কী কী কারণে ন্যায়বিচার-সংগত হয়নি, সে প্রসঙ্গ আমি এখন তুলব না। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে একটি যে অতি অবশ্য ও অপরিহার্য কর্তব্য রয়েছে তা হল অগৌণে তাঁর কারা মুক্তির জন্য চেষ্টিত হওয়া।

মহামান্য ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সাম্প্রতিক ঘোষণা থেকে জানা যায় যে সরকারের শাসনকার্য অব্যাহত রাখার জন্য ভারত সাম্রাজ্যের এমন সব অতিরিক্ত ক্ষমতা দরকার যার বলে তাঁরা দেশের তরুণদের ও জনসেবকদের বিনা বিচারে লোকচক্ষুর অগোচরে সরিয়ে দিতে পারেন। শাসক শক্তিকে আমি বিনীত ভাবে বলতে চাই এরকম যুক্তির অবতারণা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুভাষচন্দ্র বসু রোগাক্রান্ত। তাঁর দেহের ওজন হ্রাস পেয়েছে ভয়াবহ পরিমাণে। শরীরের দিক থেকে তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য হবে। প্রত্যহ তাঁর জ্বর হচ্ছে, সারা শরীরে তাঁর ব্যথাবেদনা, রাত্রে তাঁর ঘাম হয়, ওজন যে হারে তাঁর কমছে তাতে আতঙ্ক হয়। তৎসত্ত্বেও কি বলা হবে যে আজকের এই দিনে তাঁকে মুক্তি দিলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাত্মক কাজে লিপ্ত হবেন? মাত্র সেদিন লর্ড আরউইন এ দেশের লোকদের উপদেশ দিলেন হিন্দু ঐতিহ্যের রাজভক্তিতে লেগে থাকতে হবে। যে বিষ্ণু বিশ্বকে রক্ষা করেন ও পালন করেন, হিন্দুরা সত্যই মনে করে রাজা সেই বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ। মহামান্য ভাইসরয় নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তাঁর এই উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের কোনো ঈর্ষাঅসূয়া নেই। কিন্তু গত সোমবার লেজিসলেটিভ এসেম্বলিকে উদ্দেশ করে তিনি যখন এই দুর্ভাগ্য দেশের জনগণকে রাজার সঙ্গে প্রজার চিরন্তন স্বভাব-বৈরিতার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন কি সেই উত্তরাধিকারের কথা তিনি স্বয়ং বিস্মৃত হয়েছিলেন?

এই পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর কাছে যে সনির্বন্ধ অনুরোধ পত্র যাচ্ছে লর্ড আরউইন তথা তাঁর তাবৎ দেশবাসী একবার গভীর ভাবে বিচার করে দেখুন। ভারতে ও ভারতের বাইরে যে বিরাট মনুষ্য সমাজ রয়েছে তাঁদের সবাইকেও আমি ভালো করে ভেবে দেখতে বলি রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের অজুহাতে রাজশক্তি যদি নিজেকে বিষ্ণুর মতো রক্ষক পালকের অবতাররূপে

জ্ঞান করেন, তবে কি তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক অকর্মণ্য ও রোগাক্রান্ত এক ব্যক্তির প্রাণসংশয় ঘটাতে চাইবেন ? আমরা বলি, 'সুভাষচন্দ্র বসুকে এতদ্দণ্ডে মুক্তি দেওয়া হোক।'

আজ আমি মানব সমাজের দ্বারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আজ আমার দেশবাসীদের এমন ক্ষমতা নেই যে তাঁরা বলপ্রয়োগে রাজশক্তির উপর চাপ দেয় কিংবা মিষ্টকথায় তাঁদের ভুলায়। রাজশক্তির অপ্রতিহত অপরিমিত ক্ষমতা তবু তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন ক্ষণিকের জন্য তাঁদের অন্তরস্থিত বিবেকের ক্ষীণ স্বরটুকু অবধান করেন—'সুভাষচন্দ্র বসুকে কারামুক্ত করো।' সমস্ত দেশের নির্বাক বেদনা ওই একটি কথাকে কেন্দ্র করে স্পন্দিত হচ্ছে—'মুক্ত করো তাঁকে।' যে শক্তি রাজশক্তিকে তথা ব্যক্তিবিশেষকে চালনা করে, তারও ওই একই অনুজ্ঞা—'তাঁকে মুক্তি দাও, সুভাষচন্দ্র বসুকে মুক্তি দাও।'

যতীন্দ্র মোহনের মৃত্যুর বহুকাল পরে ১৯৩৮ সনে, সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল নেলী সেনগুপ্তর বাড়িতে একটি চায়ের আসরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ, সৌহার্দপূর্ণ অমায়িক আলাপ ও আচরণ—তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আমার মনে যে চমক লাগিয়েছিল, সে আমি আজো ভুলিনি। সেই একবারই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ—আর দেখা হয়নি। কিন্তু সেই প্রথম ও শেষ দেখার রেশ এখনো আমার মনে রয়ে গেছে।

১৯২৭ অব্দের এপ্রিল মাসে মেয়র পদের জন্য তৃতীয় বার যতীন্দ্র মোহনের নাম প্রস্তাবিত হয়। ৪৫ বনাম ৩৯ ভোটে তিনি নির্বাচনদ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছিলেন বলে প্রচুর উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং প্রতিপক্ষ পুনরায় ভোট গণনার জন্য দাবী করেন। দ্বিতীয় গণনায় দেখা গেল যতীন্দ্র ভোট পেয়েছেন ৪৬টি, প্রথম দানে স্বয়ং চেয়ারম্যান্ ভোট দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। যতীন্দ্র মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন্দ্র নাথ বসু সর্বাগ্রে নবনির্বাচিত মেয়রকে সংবর্ধিত করলেন।

মেয়রের ভাষণে যতীন্দ্র মোহন পৌর প্রধানের কৃত্যকরণীয় বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন :

আমাদের বন্ধুবর রায়বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সামনে একটি বিতর্কের বিষয় উপস্থাপিত করেছেন। আমাকে ও আপনাদের সবাইকে তিনি তাঁর একটি বক্তব্যের যৌক্তিকতা ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে বলেছেন। তিনি বলেন করপোরেশনের নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের এই সংস্থা করপোরেশনের বেতনভোগী কর্মীদের কাজে যেন হস্তক্ষেপ না করেন। এজন্য যদি প্রয়োজন হয় বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে আমরা অনুরোধ করি যেন তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নূতন কোনো আইন পাশ করে অথবা পুরাতন আইন সংশোধিত করে। বারম্বার বলা হয়েছে যে মেয়রের কাজ হওয়া উচিত হাউস অব কমন্সের স্পীকার অথবা লেজিসলেটিভের প্রেসিডেণ্টের মতো। কিন্তু মেয়রের কাজ তো কেবল স্পীকার অথবা প্রেসিডেণ্টের মতো নয়, কেবল বিতর্কের ব্যাপারে তিনি রায় দেবেন অথবা রুলিং দেবেন অতিরিক্ত কিছু করবেন না—এমনও তো নয়। মেয়রকে আরো অনেক কিছু করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে মেয়র করপোরেশনের ছোট বড় অনেক কাজেরই কার্যপদ্ধতির সূত্রপাত করে থাকেন। তাছাড়া করপোরেশনের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন বলে এই প্রতিনিধি-সংস্থা ও করপোরেশনের কর্মীমণ্ডলীর মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব মুখ্যত মেয়রের, কারণ কর্মীরা তো করপোরেশনের আদেশ নির্দেশ পালন করার জন্যই নিযুক্ত।···কলকাতা করপোরেশন সংক্রান্ত আইন যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা ধরেই নিয়েছেন কর্মীরা করপোরেশনের প্রতি অনুগত হয়ে তাঁদের কর্তব্য করবেন। কর্মীরা যদি আনুগত্যে দৃঢ় থাকেন, কর্তব্যে যদি তাঁদের নিষ্ঠা থাকে, তাহলে তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপের কোনো প্রসঙ্গই উঠতে পারেনা। হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তখনই হবে যখন আনুগত্যে শৈথিল্য আসে, কর্তব্যে নিষ্ঠা থাকেনা।

দেশবন্ধুর পরলোকগমনের দু'বছর পরে যেখানে তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয় সেইখানে একটি স্মৃতিসৌধ রচনার উদ্‌যোগ হয়। প্রথমে বাংলার প্রদেশ

কংগ্রেস এ কাজের ভার নিয়েছিলেন, পরে সর্বদলীয় স্মৃতিরক্ষণ সমিতির হাতে এই দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাঁদের অনুরোধক্রমে যতীন্দ্র মোহন স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সে সময় স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল তা ক্রমেই স্তিমিত হতে থাকে। ভিত্তিস্থাপনের সাত বছর পরে স্মৃতিমন্দিরের নির্মাণকার্য সমাধা হয়। তখন যতীন্দ্র মোহনও পরলোকে।

সে সময় বাংলাদেশে নারীহরণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায় ও তার ফলে মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। হিন্দু সমাজ পতিতাকে স্থান দেয়না। লুণ্ঠিত কিংবা ধর্ষিত হয়েছে এমন মেয়ে কোনো প্রকারে পালিয়ে আসতে পারলে অথবা উদ্ধারপ্রাপ্ত হলেও সমাজ তাদের একঘরে করে রাখত। তারফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই এইসব মেয়েদের গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করতে হত। এই পাপ সমাজ দেহে দুষ্টক্ষতের মতো বৃদ্ধি পেতে থাকায়, লর্ড লীটন এই সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনসমাজ তাঁর কথায় যথোচিত মনোযোগ দেয়নি বলে, ১৯২৬ সনে লীটন যতীন্দ্র মোহনকে অনুরোধ করেন যেন এবিষয়ে তিনি কিছু করেন। সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্র মোহন নাবালিকা নারীদের ত্রাণের জন্য মেয়র হিসাবে একটি তহবিল খোলেন। সেই সংবাদে লীটন তাঁকে লেখেন :

> কালবিলম্ব না করে আপনি যে আমার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন এবং দুর্দশাগ্রস্ত নাবালিকা মেয়েদের ত্রাণকার্যের জন্য তহবিল খুলেছেন—এজন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয় এই তহবিলে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে হলে খবরের কাগজে দাতার নাম ও দানের অঙ্ক প্রতিদিন বিজ্ঞাপিত হওয়া দরকার।
>
> তহবিলের টাকা সম্পূর্ণ উঠলে পর, আমার মনে হয় সে টাকা ভিজিলেন্স এসোসিয়েশনের হাতে সমর্পণ করা সমীচীন হবে। এই এসোসিয়েশন পূর্ব থেকেই এই মহা পাপের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রচুর সাহস ও শক্তির সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন।
>
> পুনরায় আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

হাইকোর্টের জজ মিঃ গ্রীভস্ অপহৃতা নারীদের জন্য একটি নারীরক্ষাসদন প্রতিষ্ঠা করেন। জনৈক জমিদার তাঁর একটি বাগানবাড়ি ও তৎসহ কিছু টাকা মেয়র তহবিলে দান করায়, আরো অনেকগুলি সদন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ সনের ১১ই জুলাই তারিখে কলকাতা টাউন হলের এক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য যতীন্দ্র মোহন বাংলার নবনিযুক্ত লাটসাহেব স্যার ষ্টানলি জ্যাকসনের নাম প্রস্তাব করে বলেন :

আজ যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের অনেকে এবং আমার বন্ধুবর্গের মধ্যেও কেউ কেউ আশ্চর্য হবেন যে মহামান্য লাটসাহেবকে স্বাগত জানিয়ে আজকের সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করছি। যে উদ্দেশ্যে এই সভা আহূত হয়েছে তা এমনই যে জাতিবর্ণধর্ম-সম্প্রদায় এমনকি রাজনীতিক মতামত নির্বিশেষে, সকলেই এই উদ্দেশ্য সাধনে উদ্‌যোগী হবেন বলে আমার বিশ্বাস। পতিতাবৃত্তির হীন ও জঘন্য জীবনের কলঙ্ক ও লাঞ্ছনা থেকে নাবালিকা মেয়েদের রক্ষা ও উদ্ধারকল্পে একটি তহবিল গড়ে তোলার জন্য এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। নানা বিতর্ক ও ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়েছে আমাদের কংগ্রেস পার্টির প্রতি লর্ড লীটনের বড় একটা সদ্ভাব ছিলনা, কিন্তু যখন তিনি নারীরক্ষার মহৎ কাজে নিজের থেকেই এগিয়ে এলেন আমি বিনা দ্বিধায় কালবিলম্ব না করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি। নির্যাতিত নারীর সমস্যা কেবল যে কলকাতার পক্ষে লজ্জাকর এমন নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে—এমন কি সারা পৃথিবীর পক্ষেও গ্লানিকর। যে সকল দুর্বৃত্ত সমাজের এই ক্ষতিসাধন করছে তাদের দমন করতে, ও তাদের হাত থেকে অসহায় নাবালিকাদের উদ্ধার করে সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কাজে, স্যর ষ্টানলি আমাদের সহায় হোন, আমাদের পথ দেখান—এই আশায় সভাপতিরূপে আমি তাঁর নাম প্রস্তাব করি।

কলকাতার শেরিফ যতীন্দ্র মোহনের এই প্রস্তাব সমর্থন করায় স্যর স্টানলি জ্যাকসন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যতীন্দ্র মোহনের বক্তৃতার জবাব দিতে গিয়ে গভর্ণর বললেন যে উদ্দেশ্যে সভা আহূত হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনে সকলেই একমত। কলকাতায় এই পাপ বিরাট আকার ধারণ করেছে ; অগণিত অসহায় বালিকা গণিকা বৃত্তির শৃঙ্খলে আজ বন্দী। কলকাতার এই কলঙ্ক মোচনের সংগ্রাম সহজ সংগ্রাম নয়। পুলিস যদিইবা এদের উদ্ধার করে, সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এদের বিস্তর বাধা। তাদের এই পুনর্বাসনের কাজে বহু লোককে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কলকাতায় এই শ্রেণীর মেয়েদের জন্য মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, পিতৃহীন মাতৃহীন শিশুদের জন্য একটিই অনাথাশ্রম রয়েছে। এইরকম আশ্রমের সংখ্যা যাতে বহুগুণিত হয় সেজন্য প্রচুর অর্থের দরকার। এই নিয়ে লর্ড লীটন আবেদন করেও আশানুরূপ সাড়া পাননি, তাই তাঁর মনে গভীর বেদনা ছিল। অতঃপর ভারত ছেড়ে চলে যাবার ঠিক প্রাক্কালে তিনি মেয়রের কাছে এই সমস্যার কথা উত্থাপন করেন। তহবিল বিষয়ে পূর্ব ইতিহাস অবতারণার পর স্যর স্টানলি যতীন্দ্র মোহনকে উদ্দেশ করে বলেন :

> সেই সময় মিষ্টার মেয়র, আপনি সঙ্গে সঙ্গে লর্ড লীটনের ডাকে সাড়া দিলেন, এবং তহবিল গঠনের জন্য আবেদন প্রচার করলেন। আজ যে আপনি অনুগ্রহ করে টাউন হলের এই সভায় এসেছেন, এ থেকে আমার আশা হয় আপনার পদমর্যাদা ও ব্যক্তিগত খ্যাতিপ্রতিপত্তি যদি তহবিল গঠনের অনুকূলে নিয়োজিত হয়, তাহলে অর্থসাহায্যের জন্য আমাদের আবেদন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। ··· সমবেত সবাইকে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তহবিলে যে টাকা উঠবে তার যথোচিত সদ্ব্যয় হবে এবং আমাদের পরিকল্পিত সদনগুলির নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত হবে সকল দিক দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে।

অতঃপর নারীরক্ষা সদন ও অনাথ আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যতীন্দ্র মোহন, নিবেদন করলেন সকলে যেন মুক্তহস্তে এই তহবিলে অর্থসাহায্য করেন ও এই পুণ্যকর্মে সকলের সোৎসাহ সহযোগিতা উদ্দীপ্ত করেন। বক্তৃতার শেষ অংশে গবর্ণরের উদ্দেশে তিনি বলেন যে

যারা নারীত্বকে কলঙ্কিত করার জন্য এই জঘন্য পাপকর্মে লিপ্ত আছে তাদের যেন কখনো রেহাই দেওয়া না হয়; নির্মমভাবে তাদের দণ্ডবিধান করতে হবে। রাজনীতিক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে সরকার গুরু দণ্ডের বিধান করেন, কিন্তু যেসব দুর্বৃত্ত নিষ্পাপ নাবালিকা মেয়েদের হরণ করে তাদের সর্বনাশ করে, তারা লঘু দণ্ড ভোগ করে পার পেয়ে যায়। এইসব সমাজের শত্রুকে হাটেবাজারে টেনে এনে সকল লোকের সামনে বেঁধে মার দিতে হয় চাবুক দিয়ে। যতীন্দ্র মোহন বললেন তাঁর যদি সেই ক্ষমতা থাকত তাহলে এইভাবে দণ্ডদান করে এমন জঘন্য পাপের প্রতিবিধান করতেন।

তাঁর সর্বশেষ বক্তব্যে স্যর স্টানলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন যে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মহৎ কাজে তাঁর সরকার যেমন এগিয়ে আসবেন তেমনি অপরাধের প্রতিবিধানেও যথোচিত যত্নবান হবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানী

"কিছু কিছু উদ্দেশ্য আমাদের সাধিত হয়েছে, কিছুটা কাজ আমরা করতে পেরেছি, কোনো কোনো কাজ করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, ব্যাহত হয়েছি। আমাদের সমস্ত সফলতা বা বিফলতার মধ্যে আমরা যেন মঙ্গলকেই দেখি। যেসব সংগ্রাম আমরা করেছি সে সব সংগ্রামের জয় পরাজয়, ক্লান্তি ও হতাশা, যেন আমাদের সাহসের শক্তি বৃদ্ধি করে, আমাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে ও স্বাধীনতার পথে আমাদের অগ্রসর করে দেয়। যার হৃদয়ে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা অনির্বাণ শিখার মতো জাজ্বল্যমান, পর্বতপ্রমাণ বাধা গলিয়ে সে পথ কেটে নিতে পারে। আমাদের যাত্রাপথের শেষ লক্ষ্য হল এই পৃথিবীর বুকে সেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে প্রেম আছে, শান্তি আছে আর আছে পরম কল্যাণ। অবিশ্রান্ত চোখের জলের পালা তখন ফুরোবে, সকল লোকের মুখে উজ্জ্বল হাসি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে। যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দিত হবে নূতন শক্তির প্রবাহে। সেই শুভদিন কেবল স্বপ্ন নয়, প্রাচ্য দিগন্তে স্বাধীনতা সূর্যের অরুণ দীপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠেছে—সে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

(১৯২৮ সনে বসিরহাটে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসে প্রদত্ত দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের ভাষণের অংশবিশেষ)

প্রথম পরিচ্ছেদ
স্বাধীনতা আন্দোলন

১৯২৬ সন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলার কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে একটা স্পর্ধার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলার আন্দোলনের তখন অবিসম্বাদী ও অপ্রতিহত নেতা ছিলেন যতীন্দ্র মোহন। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতার করপোরেশন রাজবন্দীদের প্রশ্ন আলোচনার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। বিনা অভিযোগে বিনা বিচারে কলকাতার কতিপয় নাগরিককে ১৮১৮ সনের তিন নং রেগুলেসন ও ১৯২৪ সনের বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেফতার করে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবন্দী করে রাখা হয়েছে—সরকারের এই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য মিঃ এম. এ. রাজ্জাক একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। আলোচনা শুরু হলে পর যতীন্দ্র মোহন বলেন ৩নং রেগুলেসন অনুসারে যাঁদের গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, তাঁদের বেলা সরকার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখেননি, অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে কেবল পুলিসের বিবৃতির বলে কারাদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন পৃথিবীর যে কোন সভ্য সমাজে বিনা অভিযোগে বিনা বিচারে কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা গর্হিত বলে বিবেচিত হবে।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে স্বরাজ্য পার্টির হাতে বার বার পরাজিত হয়েও, বিশেষ ক্ষমতার বলে সরকার কীভাবে দ্বৈত-শাসন পদ্ধতি আপন স্বার্থে অকেজো করে দিচ্ছিলেন—এনিয়ে তখন দেশময় প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

১৯২৬ সনে যখন কাউন্সিল নির্বাচনের প্রসঙ্গ তোলা হয়, সরকার গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান নেতাকে তাঁদের অনুকুলে টেনে নেন, কিছু হিন্দু নেতাও সরকার পক্ষে দল ভারি করেন। কাউন্সিলের একটি অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে যতীন্দ্র মোহন বলেছিলেন :

তিন বছর আগে দ্বৈত-শাসনের অসারতার বিষয় উপলব্ধি করে আমরা

দ্বৈত-শাসন পদ্ধতিকে কবরস্থ করেছিলাম। সরকার চাইছেন তাকে পুনর্জীবিত করতে। সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমরা যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছি তাতে আমাদের জয় হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। ফলাফল যাই হোক না কেন, এই কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং এই কাউন্সিলের বাইরে দেশের যে জনসাধারণ আছেন তাঁদের সবাইকে, নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সরকার দু-চার জন মন্ত্রী হয়তো নিয়োগ করতে পারেন, কিন্তু সরকার যেন মনে রাখেন আমাদের মহান নেতা দেশবন্ধুর উদ্‌যোগে স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে যে প্রতিরোধ ও সংগঠন ক্ষমতা গড়ে উঠেছে তাকে তাঁরা মেরে ফেলতে পারবেন না। দ্বৈত-শাসনের একটা কাঠামো সরকার খাড়া করে তুলতে পারেন, কিন্তু মোটা বেতনে দু-চারজন মন্ত্রী নিযুক্ত করলেও সেই ফাঁপা কাঠামোতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। মাননীয় প্রেসিডেণ্টকে আমি আমাদের এই প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্যটুকু বলতে চাই। ১৯২১ সালে কংগ্রেস স্পষ্টই বলে যে বর্তমান শাসনপদ্ধতি আসলে অন্তঃসারশূন্য এবং এই পদ্ধতির বলে যেসব মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন তাঁরা হবেন সরকারের হাতে খেলার পুতুল মাত্র। সে সময় কংগ্রেস ছিল কাউন্সিলের বাইরে। কাউন্সিলের ভিতরে থেকে আমাদের যেসব স্বদেশবাসী বর্তমান শাসনপদ্ধতির প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশত স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি সাধনের তৎপর হয়েছিলেন, কাউন্সিলের বাইরে থেকে আমরা তাঁদের বাধা দিতে চেয়েছিলাম। সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন দেশবন্ধু আমাদের জনগণের হৃদয়ে যে প্রতিরোধ ও সংগঠন শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছেন, তাকে ধ্বংস করতে। আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য আর কিছু নয় কাউন্সিলের মধ্যকার এই বিরুদ্ধ শক্তিকে ধ্বংস করা ও আমাদের সংগঠিত প্রতিরোধকে জাগিয়ে রাখা—কারণ আমরা জানি এই সংঘশক্তিকে কেবল আমলাতন্ত্রীরা নয়, কেবল বাংলা সরকার বা ভারত সরকার নয়, ইংরেজদের সরকারও একে সমীহ করে চলেন।

দু'বছর কোনো মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়নি অর্থাৎ সে দু বছর সরকার দ্বৈত-শাসন একপ্রকার স্থগিত রাখলেন। তাঁরা বুঝলেন স্বরাজ্য পার্টি যতদিন শক্তিশালী থাকবে ততদিন মন্ত্রিত্বে কোনো স্থায়িত্ব থাকবেনা। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত স্বরাজ্য পার্টির হাতে সরকারকে নাজেহাল হতে হয়েছিল, কোনো প্রকারে মুখরক্ষা করতে হয়েছিল স্বরাজিষ্টদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু ১৯২৬ সনের নভেম্বর মাসে, কাউন্সিল নির্বাচনের তৃতীয় বছরে স্পষ্টই দেখা গেল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ক্রমেই তীব্র হতে আরম্ভ করেছে। সরকার সেই সুযোগে মন্ত্রীত্ব গঠন করে দ্বৈত-শাসন চালু করতে চাইলেন—এই সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কাউন্সিলে যতীন্দ্র মোহন যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তারই একটা অংশ উপরে উধৃত হয়েছে। য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মিঃ ট্রাভার্স তাঁর বক্তৃতায় বাংলার বিপ্লবীদের খুনে ডাকাত বলে অভিহিত করলেন। অতঃপর সরকার মন্ত্রীদের নাম ও তাঁদের জন্য নির্ধারিত বেতন বিষয়ে প্রস্তাব তুললেন এবং ভোটাধিক্যে সে প্রস্তাব গৃহীতও হল। কিন্তু মন্ত্রিসভা বেশিদিন টিকল না। ১৯২৭ সনে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কে বিরুদ্ধভাব ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে, দু-চার জন মুসলিম সদস্য স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিলেন। ফলে মন্ত্রিসভা ভাঙা খুব বেশি কঠিন হয়নি। আবার নূতন করে মন্ত্রিসভা গঠিত হল কিন্তু কায়েম হলনা। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারীতে যতীন্দ্র মোহন তাঁর পার্টিকে এমন শক্তিশালী করে গড়ে তুললেন যে মন্ত্রিসভার প্রস্তাব কাউন্সিল নাকচ করে দিতে লাগল, দ্বৈত-শাসন পদ্ধতি আবার পড়ল সমূহ সংকটে।

সরকার তখন এক নূতন বুদ্ধি বের করলেন—তিনজন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন স্থির করলেন। ইতিপূর্বে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু সদস্য ছিলেন, এবার স্থির করলেন তিন জনের মধ্যে দু'জন থাকবেন মুসলমান ও একজন মাত্র হিন্দু, তাহলে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে মুসলমান সদস্যেরা সর্বদাই জিতে যাবেন। কৌশলটা খেটে গেল। যতীন্দ্র মোহন লড়বার আর সময় পেলেন না

কারণ তার পূর্বেই কংগ্রেস নির্দেশ দিলেন স্বরাজ্য পার্টির সদস্যেরা যেন নিজ নিজ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন—দ্বৈতশাসন পদ্ধতি চালু থাকা কালে কংগ্রেস কাউন্সিল নির্বাচনে আর দাঁড়াবেন না।

১৯২৭ সনের নভেম্বরে সাইমন কমিশন নিযুক্ত করা হল, কিন্তু মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কারের নমুনা দেখার পর কংগ্রেস কমিশনকে মেনে নিতে পারলেন না। স্থির হয় কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কট করবেন। ভারতের কোনো অঞ্চলে কমিশন কংগ্রেস থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য পায়নি। কমিশনের সব সদস্য ছিলেন শাদা আদমি—ভারতীয় একজনও ছিলেন না। নরমপন্থী চরমপন্থী হিন্দু মুসলমান অর্থাৎ ভারতীয় নির্বিশেষে সকলে একযোগে আপত্তি তুললেন যে কমিশনে একটিও ভারতীয় সদস্য না থাকা ঘোরতর অন্যায়। হরতাল পালিত হল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। বিলাতের মন্ত্রিসভা অথবা ব্রিটিশ সরকার ভাবতেও পারেননি কমিশন নিয়োগ নিয়ে এতটা আপত্তি হতে পারে। তাঁদের আশা ছিল নরমপন্থীরা অন্তত এ ব্যাপারে খুশি হবেন, কিন্তু যে মডরেটরা ধৈর্য ধরে প্রভুশক্তির প্রতি একান্ত বিশ্বাসে তাঁদের সকল কথা অবিরোধে মেনে নিত, এবার তাঁরাও যেন বেঁকে বসল। চরমপন্থী নরমপন্থীতে কোনো আর তফাত থাকল না।

১৯২৮ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে বসিরহাটে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কনফারেন্সে যতীন্দ্র মোহন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

রাজনীতির দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমন আমি মনে করিনা। দাঙ্গা এখন অতীতের ঘটনা—স্মৃতিমাত্রেপর্যবসিত। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশের জাতীয় সংকটে দাঙ্গার ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে সরকার এখন আপন সুবিধা করে নিচ্ছেন। মনে রাখতে হবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ একদিন এদেশে প্রবেশ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত এ দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। এই সাম্প্রদায়িক

বিরোধের সুযোগ নিয়ে আবার তারা আমাদের মুক্তি আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরেছে। সেই অসদুদ্দেশ্যে প্ররোচিত হয়েই তারা যথা সময়ের অনেক আগেই কমিশন নিযুক্ত করে ভারতে পাঠিয়েছে। ভারত তো এ কমিশন চায়নি। ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি কমিশনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কেন ? যাতে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সুযোগ নিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আপস মীমাংসার মিথ্যা অজুহাতে, কমিশন আমাদের পায়ের শিকল আরো শক্ত করে পরাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই কমিশনের আগমন। কিন্তু ভারত এবার ওদের চালাকিটা ধরে ফেলেছে। সেই জন্যই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রব উঠেছে : সাইমন ফিরে যাও, কমিশন ফিরে যাও। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস, খিলাফত কনফারেন্স, লিবারেল ফেডারেশন এবং অন্য সকল সংস্থা আজ একযোগে কমিশনকে বয়কট করবেন বলে স্থির করলেন।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ঠিকই করেছি। আমার ও আমার জননী জন্মভূমির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে কেন আমরা অন্তরাল সৃষ্টি করতে দেব ? আমরা স্বায়ত্ব-শাসনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছি কিনা, সেটা বিচার করবে তৃতীয় ব্যক্তি ? এই নির্লজ্জদাম্ভিকতা অসহ্য। আমাদের যোগ্যতার সাক্ষ্যপ্রমাণ যদি প্রয়োজন হয় তবে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ মজুত আছে মুডিম্যান্ কমিটির কাছে। না, তাঁরা তা করতে রাজি নন। আমরাও এই গায়েপড়া লাঞ্ছনা মেনে নিতে রাজি নই—অপমানকে প্রতিরোধ করব অপমান দিয়ে।

ভাই ও ভগ্নীগণ, আমাদের জন্মগত অধিকার নিয়ে আর আমরা ছিনিমিনি খেলতে দেবনা। এই ধৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করি। রাজনীতিক দলেরা বয়কটের জন্য যে ডাক দিয়েছেন, সারা দেশ জুড়ে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হোক। সকল লোককে ডেকে ডেকে বলতে হবে কমিশনের কাজে সহযোগিতা করলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি, কমিশনের কাজ সম্পূর্ণ বয়কট করতে পারলে দেশের সমূহ লাভ।

স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে আজ যদি কেউ কমিশনের কাজে সহযোগিতা করেন,

তাঁরা ভবিষ্যদ্বংশীয়েদের স্বার্থে কুঠারঘাত করবেন। আজকের সাময়িক সুবিধা ভবিষ্যতের দুরপনেয় অভিশাপরূপে দেখা দেবে। আমার মুসলমান ভাইদের আমি বিশেষ করে এই দিকে দৃষ্টি দিতে বলি। দেশের এই সংকট সময়ে তাঁরা যদি নিজের নিজের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ছোটখাটো সুখ সুবিধার লোভে দেশের বৃহত্তর ও সর্বজনীন স্বার্থকে বিসর্জন দেন, তার জের লাগবে সমগ্র দেশের গায়ে এবং সে দেশ কেবল হিন্দুর নয় কেবল মুসলমানের নয়—সকলের। সেই সমূহ সর্বনাশ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করতে হবে। কমিশন কী চাইছেন সেকথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের মুখ দিয়ে কমিশন এই কথাই বলিয়ে নিতে চাইছেন যে স্বায়ত্বশাসনের পথে আমরা কখন কীভাবে পদক্ষেপ করব—সেকথা বিচারের ভার আমরা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে—কারণ পার্লামেন্টই তো আমাদের হর্তাকর্তাবিধাতা, আমাদের দেশের কল্যাণ ও প্রগতি তো তাঁদের দায়িত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল !

এই আত্মসংহারক শর্ত আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনা। আমাদের দাবী এই যে সকল প্রশ্ন বিবেচনার জন্য কমিশন নিযুক্ত না করে একটি রাউণ্ড টেবিল বৈঠক আহূত হোক। ১৯২১ সনে অথবা ১৯২৪ সনে যদি এই বৈঠক ডাকা সম্ভবপর মনে হয়ে থাকে, তবে এই বছরেই বা সম্ভবপর হবেনা কেন। কমিশনের কিছু দেবার নেই সুতরাং কমিশনের কাছ থেকে আমাদের কিছু নেবারও নেই।

কমিশনের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

১৯২২ সনে স্যর জন্ সাইমন্ স্বয়ং বলেছিলেন যে আয়ারলণ্ডের সাংবিধানিক আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছিল আয়ারলণ্ডের আইরিশরা। সেই খসড়া অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পার্লামেণ্টে। সেই স্যার জন্ ভারতে এসে ভোল পাল্টে নূতন সুরে গাইতে লেগেছেন। ভারতে পা দেবার পর তিনি আর উদারপন্থী থাকতে পারছেন না কারণ ভারতে

আয়ারলণ্ডের মতো সর্বসম্মত দাবি নেই, কলিন্সের মত সশস্ত্র সংগ্রামী দুর্ধর্ষ নেতাও নেই। কিন্তু ভারত আয়লণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই সমীচীন মনে করে। আমাদের সংবিধান আমরা নিজেরাই রচনা করব, দাবী করব সেই সংবিধান মতেই ভারতের শাসনকার্য চালাতে হবে। যদি সে দাবী অমান্য করা হয় এবং তার ফলস্বরূপ আয়ারলণ্ডে যেমনটা হতে পারে আশঙ্কা করা গিয়েছিল, এদেশে সেরকমটা হয়, তাহলে তার জন্য কেউ যেন আমাদের দায়ী না করেন। সাইমন কমিশন এসেছিলেন, দেশময় সফর করে ঘুরেছেন, সাজানো বানানো সংবর্ধনা ও ভোজসভায় আপ্যায়িত সংবর্ধিত হয়ে তাঁরা ফিরেও গেছেন নিজেদের দেশে।

কমিশন দ্বিতীয়বার যখন ভারতে আসে, যদি দু'জন ভারতীয়ও কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হতেন, তাহলে সারা দেশ একযোগে কমিশনের বিরুদ্ধতা হয়তো করতনা, বয়কটও করতনা। তখন ভারতের অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করা হলেও, মাসের পর মাস ধরে স্যর জন্ সারা দেশ ঘুরে সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কমিশন এদেশে এসে যতটুকু যা কাজ করলেন, সে কাজ সদস্যেরা বিলাতে বাড়ি বসেও করতে পারতেন, তাঁদের কষ্ট করে ভারতে আসতে হতনা। সাক্ষ্য তাঁরা শুনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতের আপন কথাটুকু তাঁদের কানে প্রবেশ করেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
জনপ্রিয় মেয়র

১৯২৭ সনের শেষ দিকে সুভাষ বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেছেন। মেয়র নির্বাচনের সময় আসন্ন হলে পর বহু লোক আগ্রহ প্রকাশ করল তাঁকে যেন মেয়ররূপেও নির্বাচন করা হয়। যতীন্দ্র মোহন সকেলের সঙ্গে একমত হয়ে উঠে পড়ে লাগলেন সুভাষের নির্বাচন সফল করে তুলতে। করপোরেশনের অকংগ্রেসী সদস্যেরা বিজয় কুমার বসুকে খাড়া করলেন তাঁদের দলের প্রার্থীরূপে। তখন একা কংগ্রেস পার্টির এমন ভোটের জোর ছিলনা, যাতে করে তাদের প্রার্থী অনায়াসে নির্বাচিত হবেন বলে নিশ্চয় করে বলা যেত। নির্বাচনী সভা বসবার ঠিক আগে দু'জন কাউন্সিলর, ফেলপ্‌স ও চারু চন্দ্র বিশ্বাস যতীন্দ্র মোহনের কাছে চিরকূট পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন শেষ মুহূর্তে তিনি যেন মেয়র পদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান। যতীন্দ্র মোহন তাঁদের অনুরোধে কান না দিয়ে সুভাষের নামই প্রস্তাব করলেন। দুঃখের কথা অল্প কয়েকটি ভোটের ব্যবধানে সুভাষ বিজয় কুমার বসুর কাছে হেরে যান—ফলে করপোরেশন কংগ্রেসের হাতের বাইরে চলে যায়। মেয়র থাকাকালে বিজয়কুমার বসু কিন্তু যতীন্দ্র মোহনের কংগ্রেসী ধারাটুকু বজায় রেখেছিলেন।

পরের বছর (১৯২৯) মেয়র পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস স্থির করলেন করপোরেশনে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতেই হবে। করপোরেশনের মুসলমান সদস্যেরা যতীন্দ্র মোহনকে দাঁড়াতে বললেন, কংগ্রেসও তাঁকেই প্রার্থীরূপে নির্বাচন করলেন। প্রার্থী মনোনয়ন সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। মেয়র পদের জন্য তিনি যখন প্রস্তাব আহ্বান করলেন, সুভাষ প্রস্তাব করলেন যতীন্দ্র মোহনের নাম, সমর্থন করলেন একজন মুসলমান কাউন্সিলর। দ্বিতীয় কোনো নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় সর্বসম্মতভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যতীন্দ্র মোহনই নির্বাচিত হলেন। মেয়রের আসনে বসবার

জন্য তাঁকে যখন সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হল, বাইরের অপেক্ষমান জনতা বিপুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল, শরৎ চন্দ্র বসু তাঁকে মাল্যভূষিত করলেন, চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। সমবেত সকলের আন্তরিক সংবর্ধনায় অভিভূত হয়ে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

আপনাদের সংবর্ধনায় আমি অভিভূত। আপনারা আমার বিষয়ে যেসব কথা বলেছেন তা আমার অন্তর স্পর্শ করেছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ররূপে আমার এই নির্বাচন থেকে ছুটি বিষয় আমার নিকট-স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : প্রথমত, আমার উপর আপনারা আস্থা রাখেন এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের লোকান্তরিত নেতা, এই পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের সামনে যে কর্মসূচী রেখে গেছেন সেই কর্মসূচীতেও আপনাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

দেশবন্ধুর কর্মসূচী ও তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্য ও পদ্ধতি আমরা এখনো অনুসরণ করে চলেছি। এই পৌর প্রতিষ্ঠান জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিকের। য়ুরোপীয়েরা আমাদের শাসকশ্রেণীভুক্ত হলেও নাগরিক হিসাবে তাঁদের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষভাব নেই। তাই আমি নিঃসংকোচে দেশবন্ধুর কর্মসূচী রূপায়নের জন্য আপনাদের প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী সহায়তা ভিক্ষা করি। জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা, নিরন্নকে অন্ন দান করা ও রোগগ্রস্তদের নিরাময় করা···যে কোনো সহরের পক্ষে এইরকম কর্মসূচীর রূপায়ণ শ্লাঘার বিষয়। তবে একটি কথা আপনাদের মনে রাখতে বাল, যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় দেশ আমার কাছে অনেক বড়, আবার তার চেয়ে বহুগুণে বড় আমাদের নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের নামে, দেশের নামে, দেশবন্ধুর নামে এই বিরাট সহরের প্রত্যেকটি নাগরিককে সেবা করা আমরা ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি।

পরের বছর, ১৯৩০ সনের ২৯শে এপ্রিল তারিখে যতীন্দ্র মোহন পুনরায় পঞ্চমবারের মত মেয়র নির্বাচিত হন—যদিচ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার

জন্য তিনি তখন কারাগারে। মেয়র হিসাবে যতীন্দ্র মোহন বহু লোকের শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। ভারতের সর্ববৃহৎ সহরে পাঁচ পাঁচবার মেয়র নির্বাচিত হওয়া তো সহজ কথা ছিলনা। পরবর্তী জীবনে ব্রহ্মদেশের আদালতে যতীন্দ্র মোহনের যে বিচার হয়, সেই এজলাসের হাকিম মরিস কলিস্ তাঁর একটি বইয়ে যতীন্দ্র মোহন সম্পর্কে লিখেছেন :

> এ বিচার যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করবে এ বিষয়ে প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহমাত্র ছিলনা। এক প্রদেশের সরকার অপর এক প্রদেশের প্রখ্যাত একজন নেতাকে আপন এলাকার মধ্যে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার করার ঘটনা—অভূতপূর্ব ঘটনা—বাংলাদেশে উত্তেজনা প্রবল হতে বাধ্য কারণ তখনকার দিনে ভারতের মধ্যে নামজাদা লোক যাঁরা ছিলেন, সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম, প্রথম পাঁচজনের মধ্যে তাঁর নাম করতে হত। কেমব্রিজে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, ব্যারিষ্টার হিসাবে কলকাতায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আগমন, বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর তিনি তখন বাংলার অবিসম্বাদী নেতা। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে নাম দিয়েছে 'বাংলার সিংহ' বলে। তাঁর স্ত্রী হলেন একজন ইংরেজ মহিলা।

কেবল বাংলায় তিনি যে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এমন নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তাঁর অনুগামী ভক্তের সংখ্যা বাংলার তুলনায় কিছু কম ছিলনা। কানপুরে যেবার কংগ্রেস অধিবেশন হয়, সেখানকার ম্যুনিসিপালিটি প্রকাশ্য জনসভায় তাঁকে সংবর্ধিত করেছিল। মাদ্রাজ প্রদেশ কংগ্রেসে তিনি যখন সভাপতিত্ব করতে যান, মাদ্রাজের পৌরসভাও তাঁকে অনুরূপ সম্মান জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু দেশের অন্য অন্য অঞ্চলে কাজের তাগিদ ছিল বলে তিনি তাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। সোভিয়েট গণতন্ত্রের দশম বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য রাশিয়া থেকে তাঁর যে আমন্ত্রণ এসেছিল, সে আমন্ত্রণও রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। জাতীয় ক্ষেত্রে যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও

তেমনি তাঁর সুনাম সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় বাংলায় তাঁর কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকায় এবং স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতির ফলে বাইরের দিকে তিনি ততটা নজর দিতে পারেননি, তাঁর রাজনীতিক কাজের পরিধি এক প্রকার বাধ্য হয়েই তাঁকে বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কংগ্রেসের আহ্বান

সাইমন কমিশনকে কীভাবে বয়কট করা হয় ইতিপূর্বে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। ডক্টর এম. এ. আনসারীর সভাপতিত্বে অখিল ভারত কংগ্রেসের যে অধিবেশন মাদ্রাজে হয় সেখানেই স্থির হয় কমিশনকে আমল দেওয়া হবেনা। এই অধিবেশনের অপর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে মাদ্রাজেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব এনেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সর্বসম্মতভাবে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছিল, যতীন্দ্র মোহন ছিলেন এ আলোচনার পুরোধা।

প্রথম সফরের পর সাইমন কমিশন বিলাত ফিরে যাবার পর, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশের একতাশক্তিকে সংহত করার জন্য বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। সেই বছরেই কমিশনের দ্বিতীয় বার সফরে আসবার কথা। নেতারা কমিশন বয়কট করার কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হতে চাইলেন যেন বয়কটের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বাধে। কংগ্রেস দেশকে ডাক দিয়েছিলেন যেন নির্বাচনমণ্ডলী এক ও অবিভক্ত রাখা হয়। যতীন্দ্র মোহন এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দাবী তাঁরাই করবেন যাঁরা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দাস, যাঁরা সমগ্র দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি উদাসীন। তিনি আরো বললেন মোটামুটিভাবে বলা যায় যে হিন্দুরা কখনো পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দাবী করেনি। কিছু কিছু মুসলমান যদি সেরকম দাবী করে থাকে তবে তা নিতান্তই ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। সাম্প্রদায়িক কিংবা রাজনীতিক উস্কানি যদি না থাকত, গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান যদি স্বতোপ্রণোদিত হয়ে চলবার সুযোগ পেত, তাহলে তারাও নিশ্চয় এক ও অবিভক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর সপক্ষে মত দিত।

মাদ্রাজ অধিবেশনে তাঁর এই বক্তৃতার শেষে যতীন্দ্র মোহন বলেছিলেন :

> নির্বাচকমণ্ডলী যদি এক ও অবিভক্ত রাখা যায় তাহলে কালে লোকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আর ভোট দেবেনা, ভোট দেবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেইসব প্রতিনিধিস্থানীয় প্রার্থীদের যাঁরা প্রজাসাধারণের মঙ্গলসাধনে সর্বদা তৎপর।

তাঁর সমগ্র রাজনীতিক জীবন যদি অনুধাবন করে দেখা যায় স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব সংস্থাপনে যতীন্দ্র মোহন সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন।

১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে বসিরহাটে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন তার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাংলায় তখন অনেকটা হ্রাস পাবার মুখে। কিছুদিন পরেই অবশ্য বিরোধী দল আবার একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সমস্ত ভেদবিভেদ ঘোচাতে তো তিনি চাইতেনই, থাকতেও চাইতেন ভেদবিভেদের ঊর্ধে, কিন্তু যতীন্দ্র মোহনের এমনই দুরদৃষ্ট যে কেউ কেউ কখনো কখনো তাঁকেই দায়ী করতেন ভেদবিভেদের জন্য। তিনি কিন্তু এইসব মিথ্যাচারীদের কপটতা মার্জনা করেই চলতেন, তাদের ভালো করতে পারলে কখনো মন্দ করতেন না। তাঁর অন্তরে এমন একটা সহজ ঔদার্য ছিল যে অপরের প্রতি হিংসাদ্বেষ করা কিংবা কারো অমঙ্গল চিন্তা করা তাঁর স্বভাবেই ছিলনা। বসিরহাটে তাঁর সভাপতির ভাষণ নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল—স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের ভাব আছে তার একটি খোলাখুলি হিসাবনিকাশ তুলে ধরে তিনি বললেন যদিচ ভারতের বিরাট ও বিচিত্র সমস্যা,—আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের ভাব যদি থাকে সকল সমস্যারই নিরসন করা যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র বসুর উল্লেখ করে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

> সুভাষচন্দ্র আমাদের হৃদয়াসনে ফিরে এসেছেন—তাঁকে আমরা স্বাগত করি। বাংলার এই মহান সন্তান আবার বাংলায় ফিরে এসেছেন—এজন্য আমাদের

আশা ও উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার আমাদের মহা-অভিযানে আমরা জয়ী হব—এ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসননীতি ও পদ্ধতি, গোলটেবিল বৈঠকের আবশ্যকতা, হিন্দু-মুসলমানের একতা, সাইমন কমিশন, ভারতের সংবিধান, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, বয়কট ও ছাত্র আন্দোলন—এইসব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যতীন্দ্র মোহন তাঁর সভাপতির অভিভাষণে। সর্বশেষে ভারতের নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল সন্তানকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন সারা বিশ্বে শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিরত কাজ করতে।

পরের বছর (১৯২৮) বাংলায় অখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হবার কথা। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে এই অধিবেশনে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু পূর্ণস্বরাজের দাবীর প্রশ্নে পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন মডারেট-ভাবাপন্ন তাই তিনি সভাপতির পদ গ্রহণে ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন ১৯২৮ সনের ২৭শে জুলাই তারিখে যতীন্দ্র মোহন পণ্ডিত মতিলালকে নিম্নলিখিত মর্মে চিঠি লিখলেন : *

> গতকাল মহাত্মাজীর প্রেরিত তারবার্তা থেকে জানলাম যে আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণে আপনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ সংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত বোধ করছি। কালবিলম্ব না করে এ বিষয়ে আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সর্বসম্মত তারবার্তায় মহাত্মাজীর কাছে জবাব পাঠিয়ে আমরা বলেছি, তিনি যেন আপনার বর্তমান অনিচ্ছা পরিহারের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।
>
> অনিচ্ছা প্রকাশের দিন আর নেই, আর আমাদের ইতস্তত করলে চলবেনা। আপনাকে আসতেই হবে। দেশ বিদেশে বর্তমানে যে রাজনীতিক সংকট চলেছে, সেই সংকটে নেতৃত্ব করার জন্য আপনাকে না পেলে আমাদের চলবে না। গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রদেশ কংগ্রেস আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁরাও

* A Bunch of Old Letters, Asia Publishing House, p, 59

আপনাকেই চান। চার পাঁচ জায়গা থেকে কেবলমাত্র একটি নাম পাঠানো হয়েছে—সে নাম আপনার। মনোনয়নের জন্য একাধিক নাম দেবার ব্যবস্থা থাকলেও তাঁরা একটি নাম দিতেই মনস্থ করেছেন। বাংলা তো আপনার বিষয়ে সর্বসম্মত—আপনাকে না পেলে আমাদের চলবে না। পুত্রের নামও প্রস্তাবিত হয়ে থাকলে পিতা হয়ে আপনার কেমন লাগে আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারি। প্রস্তাব যাঁরা করেছেন, আমাদের মতে'ই তাঁরাও আপনার পুত্রতুল্য। সুতরাং আমরা যদি নাছোড়বান্দা হই আপনি নিশ্চয় আমাদের মার্জনা করবেন। আপনার অনিচ্ছার যতই কারণ থাক, আপনি যেন কিছুতেই আমাদের হতাশ না করেন—আপনার কাছে এই আমাদের অনুরোধ। এর চাইতে বেশি বলতে যাওয়া বাহুল্য হবে।

আজ মহাত্মাজীকে আমি যে দীর্ঘ পত্র লিখেছি তার একটি কপি এই সঙ্গে পাঠাই। পত্রোত্তরে জানাবেন যে সব ঠিক আছে।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র বসুও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে অনুরূপ মর্মে পত্র দেন, এবং তার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত বাংলার নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণে সম্মত হন।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। বাংলায় কংগ্রেস পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই অধিবেশন পরিচালনার বিবিধ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে বহন করেন। সাংগঠনিক কাজে যদি পরস্পর সমঝোতা থাকে এবং সকলে যদি একযোগে কাজ করেন, তাহলে কেমন সুশৃঙ্খলায় সমস্ত ব্যবস্থা করা যায়—কলকাতার এই অধিবেশন ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অধিবেশনের মুখোমুখি পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হয়। সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে একটি শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করতে গিয়ে তিনি গুরুতরভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন, তারই ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই শোকাবহ ঘটনার ফলে কলকাতার অনেকে বলেছিলেন কলকাতার অধিবেশন যেন নিরাড়ম্বর হয়। মতিলালও যতীন্দ্র মোহনকে

অনুরোধ করেছিলেন জাঁকজমক যেন পরিহার করা হয়। যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে জবাব পাঠিয়েছিলেন যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে তাঁর মর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে—তার বেশি কিছু করা হবেনা। সংগঠনের দিক থেকে কলকাতার এই অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এর অন্যতম আকর্ষণ হয়েছিল বিরাট একটি স্বদেশী শিল্পমেলা ও প্রদর্শনী। আলোচনার দিক থেকে মুখ্য ছিল ১৯২৭ সনে কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে জওহরলালের বার্ষিক প্রতিবেদন, এবং মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা উত্থাপিত ও যতীন্দ্র মোহনের দ্বারা সমর্থিত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্-সংক্রান্ত প্রস্তাব।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের দিক থেকে কলকাতার অধিবেশন বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে কার ণ আন্দোলনের এক বিক্ষুব্ধ পর্যায়ে এই অধিবেশন হয়েছিল।

নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মতিলাল নেহরুকে নিয়ে যতীন্দ্র মোহন ষোলোটি শাদা ঘোড়ার গাড়ি চেপে রাজকীয় সমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে হাওড়া ষ্টেশন থেকে এলেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে যতীন্দ্র মোহন স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বরের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণের আট বছর পরে পুনরায় কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসছে। কিন্তু কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন ইতিপূর্বে অনেক হয়ে গেছে—বর্তমান অধিবেশন হল নবম অধিবেশন। সমবেত সদস্যদের স্বাগত করে তিনি বললেন ১৯২৬ সনের পর থেকে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং বর্তমানে ভারতের গরিষ্ঠসংখ্যক জনগণের আশা ও আকাঙ্খার প্রতীকরূপে কংগ্রেস সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পূর্ববর্তী বৎসরের নানা ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সেতু স্বরূপ যিনি ছিলেন, দেশভক্ত সেই হেকিম আজমল খাঁ গত বৎসর দেহরক্ষা করেছেন।

আমাদের সহযোগী সহকর্মীদের আরো অনেকে আর ইহজগতে নেই। বর্তমান অধিবেশন যখন প্রস্তুতির মুখে—মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের সর্বজনমান্য নেতা লালা লাজপত রায়কে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁর সারা জীবনের উদ্যম উৎসর্গ করে গেছেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা, প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হল শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর পুলিসের নিষ্ঠুর আক্রমণ। বিধাতার বিধান সব সময় আমাদের বোধগম্য হয়না, তবে আমার মনে হয় আমাদের নেতার প্রতি এই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বিধাতা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, পরাধীন জাতির দুর্দশার অন্ত নেই। এই নিতান্ত নিরুপায় অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে, সর্বপ্রযত্নে এমন উদ্যমে মিলিত হতে হবে যার ফলে বিদেশী সরকার ও তার দালালেরা আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের আর কখনো যেন প্রহার লাঞ্ছনা না করতে পারে, এবং বিনাবিচারে কারাদণ্ড কিংবা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা না করতে পারে। মনে রাখতে হবে বিধির বিধান আজ আমাদের এই শিক্ষাই দিতে চাইছে।

দেশ ও জাতির মান সম্মান সুরক্ষিত রাখার একমাত্র উপায় হল কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি আমাদের সমবেত উদ্যম চালনা করা। সেই একটি বিশেষ স্থির লক্ষ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে গত বছরে কংগ্রেসের কার্যকলাপ বিষয়ে জওহরলাল নেহরুর পর্যালোচনা—যা বর্তমান অধিবেশনে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। জওহরলালের এই রিপোর্ট নিছক ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ লাভের ভিক্ষাপাত্র নয়, এ হল পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্যত হাতিয়ার। এই উদ্দেশ্য সাধনে দেশের তাবৎ রাজনীতিক দল একতাবদ্ধ হতে পারে। দেশের খসড়া সংবিধানের কার্যকারিতা বিচার করার প্রকৃষ্ট উপায় হল গরিষ্ঠ সংখ্যক দেশের লোকের সমর্থন। সেদিক থেকে বিচার করে দেখলে স্পষ্ট প্রমাণ হবে নেহরু রিপোর্টে যে সংবিধান প্রস্তাবিত হয়েছে, তার তুলনীয় অন্য কোনো প্রস্তাব

এ পর্যন্ত দেশের সামনে রাখা হয়নি। এ রিপোর্ট প্রসন্ন মনে সর্বসম্মত ভাবে আপনারা গ্রহণ করুন, এই অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

ভাইসরয় ও স্যর স্টান্‌লি জ্যাকসন্ উভয়েই সে সময় বলেছিলেন ভারত যদি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তবেই ভারতকে ইনামস্বরূপ ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্ দেওয়া যেতে পারে। বৃটেনের প্রতিশ্রুত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

> বন্ধুগণ, ইংলণ্ডের কথায় ও কাজে যদি সংগতি থাকত, ভারতের সহযোগিতার বিনিময়ে ইংলণ্ড সত্যই যদি পুরস্কার দিতে আগ্রহী হত, তাহলে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ আমরা অনেক আগেই অর্জন করতাম। আস্তে ধীরে ধাপে ধাপে এই পুরস্কার দেবার কোনো অর্থই হতে পারে না। সহযোগিতা দেওয়া নিয়ে আমরা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি। সত্য কথা বলতে কি ভারত যে পরিমাণ সহযোগিতা দিয়েছে ব্রিটেনকে—তার অধিক সহযোগিতার দাবি কেউ করতে পারে না।

এক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি আমরা একযোগে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হই, তাহলে সমগ্র জাতি হিসাবে স্বরাজ সাধনায় আমাদের প্রথম পদক্ষেপ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত শক্তি সংহত করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো। আমাদের জাতির জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভারতের মহামানবেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মহা-আন্দোলন করে ব্যর্থকাম হয়েছেন। অথচ তুরস্কে, পারস্যে, চীনে তো আন্দোলন সফল হয়েছে। আমাদের এই শোচনায় ব্যর্থতার কারণ যে কী তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আত্মানুসন্ধান করতে হবে ; পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব সত্ত্বেও অসহযোগ আন্দোলন কেন ব্যর্থ হল, কেনই বা তাঁকে বানপ্রস্থে যেতে হল তাঁর সবরমতী আশ্রমে ; অরবিন্দ কেন লোকালয় ছেড়ে নির্জনবাস করছেন, কেন ভগ্নহৃদয়ে দেশবন্ধুকে প্রাণ ত্যাগ করতে হল। অথচ আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি তুরস্কের কামাল পাশা,

পারস্যের রেজাখাঁ এবং চীনের চিয়াংকাই-শেক আজ পৃথিবীর তাবৎ স্বাধীন দেশের আসরে সগৌরবে সমাসীন। কেন এমন হয় সেই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা কোথায় খুঁজে দেখতে হবে ও সেইসব ত্রুটি বিচ্যুতি মোচন করতে হবে। অতীত গৌরবের প্রতি অন্ধ ভক্তি, সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ, জাতিভেদ, পর্দাপ্রথা, অল্প বয়সে বিবাহ ও বহুবিবাহ—প্রভৃতি নানা বিষাক্ত বিস্ফোটকে আমাদের সমাজদেহ জর্জরিত। এইসব ব্যাধি থেকে দেশকে সত্বর মুক্ত করতে হবে।

স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

স্ত্রী জাতিকে স্বাধীনতা দিতে হবে। দেশের অর্ধাঙ্গ যদি আমাদের অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে অবশ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার দুর্বহ ভার বহন করতে হবে দেশের অপরার্ধকে। দেশের অর্ধাংশকে যদি পর্দার অন্তরালে অবরুদ্ধ রাখা হয়, বীভৎস দেশাচারের নামে অপরিণতবয়স্কদের উপর যদি সন্তান প্রজনন ও সন্তান ধারণের দায়িত্ব চাপানো হয়, দেশের প্রাণশক্তিকে এভাবে যদি আমরা ক্ষয় করতে থাকি, তাহলে জাতি-হিসাবে আমরা কি এক প্রকার হারাকিরি করিনা ? আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যে হাজারো দেয়াল তুলে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত থাকি, সেসব ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হবে। জাতিভেদ তুলে দিতে হবে। দেশের বর্তমান অর্থব্যবস্থায় চতুবর্ণ ও জাতিভেদের স্থান কোথায় ? অতীতে যেসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সবের সৃষ্টি আজকের দিনে সেসব অনুপস্থিত। পেশা ও জীবিকা নির্ভর যে জাতিভেদ—সে তো আজকের দিনে অচল। মানুষে মানুষে এই যে বৈষম্য এর দ্বারা কোনো প্রয়োজন সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, এর ফলে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ও বিসম্বাদ বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত জাতিকে দুর্বল করে, বিবাহ সম্বন্ধের পরিধি সঙ্কুচিত করে এবং স্ববর্ণ বিবাহের সর্বনাশের পথে সমাজকে চালনা করে।

সর্বশেষে প্রশ্ন করতে চাই যে সমাজে বহুবিবাহ প্রশ্রয় পায়, সে সমাজ কি

কখনো উন্নতিলাভ করতে পারে? ইন্দ্রিয়বারতা যে জাতিকে গ্রাস করে, আত্ম-সংযম যেখানে দুর্বল, সেই সব অধঃপতিত ভোগীদের দেশে কি কখনো স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা জন্মাতে পারে ত্যাগস্বীকার যাদের বর্ম ?

উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্য করে যতীন্দ্র মোহন আরো বললেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের সূচনা দেখা গিয়েছিল, সনাতনী রক্ষনশীলতার চাপে পড়ে বর্তমানে তা একপ্রকার অদৃশ্য, রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারকেরা যে প্রগতির ঢেউ এনেছিলেন কুসংস্কারের মরুবালুকায় তা একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জাতির ত্রুটি বিচ্যুতির কথার উপর জোর দিয়ে বলার উপযুক্ত সময় হয়ত এটা নয়, কিন্তু খোলাখুলিভাবে আত্মসমীক্ষণ সকল সময়েই বাঞ্ছনীয়। নিজেদের মধ্যে নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনা করলে ইংরেজদের সঙ্গে দরকষাকষি করায় আমাদের বেগ পেতে হবে—এরকম ভাবা যে অযৌক্তিক হবে এই কথা বলে যতীন্দ্র মোহন তাঁর বক্তৃতায় বললেন ঃ

> কেউ কেউ বলেন আমাদের দুর্বলতা কি ও কোথায় সে যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তাহলে আমাদের বিচারকদের চোখে ভারতের মামলাও দাঁড়াতে পারবেনা। তাই তাঁরা বলেন আমাদের সমাজ দেহের ক্ষতগুলি আমরা শাদা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে যদি ঢেকে রাখি, তাহলে তড়িঘড়ি আমরা স্বরাজের টিকিট পেয়ে যাব। ব্রিটিশ জাতির ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে আমার মনে অন্তত সেরকম কোনো ভ্রান্তিবিলাস নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মুক্তি নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের উদ্যমের উপর, সুতরাং শাদামাটা সত্য কথাটুকু বলতে আমার মনে কোনো দ্বিধাও নেই। যতীন্দ্র মোহন তাঁর বক্তৃতার শেষে বললেন :

> স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত সন্তানকে আহ্বান করি আজ যেন তাঁরা দলে দলে আমাদের জাতীয় পতাকার তলায় সমবেত হোন। সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নামে তাঁরা যেন শঙ্কিত না হন, শাসকের রক্তচক্ষু ও অত্যাচার সত্ত্বেও অবিচল শক্তিতে তাঁরা যেন এগিয়ে চলেন সেই শেষ লক্ষ্যের সন্ধানে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
একতার অভাব

যতীন্দ্র মোহন ১৯২৮ সনে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যে একতাশক্তি গড়ে তোলার জন্য দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর নিজের বাংলা দেশেই সেই ঐক্য ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। পট্টভি সীতারামাইয়া বাংলার পরিস্থিতি* বিষয়ে লিখেছিলেন :

> বাংলার নেতাদের মধ্যে মতভেদ ও মনান্তর থাকায় নির্বাচন ও ভোটাভুটির ব্যাপারে ঝগড়াঝাঁটির অন্ত ছিলনা। লাহোরে সপ্তাহব্যাপী কংগ্রেস অধিবেশনের সময় এ নিয়ে সুভাষবাবু ও মতিলালজীর মধ্যে দস্তুরমত কথা কাটাকাটি হয়েছিল। প্রদেশের নেতৃত্ব নিয়ে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বসুর খুবই রেষারেষি ছিল। কাউন্সিলে কংগ্রেসীদের প্রবেশ নিয়ে দু'জনের মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করে।

কলকাতা কংগ্রেসের ঠিক পরেই যা নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি, তাহল অধিবেশনের দরুণ খরচপত্রের হিসাব এবং বিশেষ করে প্রদর্শনীর আয় ব্যয় নিয়ে। এক সময় 'ফরওয়ার্ড' কাগজ ছিল যতীন্দ্র মোহনের সপক্ষে। এখন ফরওয়ার্ডের ওয়ারিশ 'লিবার্টি' কাগজ নিয়মিত তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। তখন এমন কোনো সংবাদপত্র ছিলনা যা নাকি যতীন্দ্র মোহনের সহায়তা ও সমর্থনে এগিয়ে আসে। এই অবস্থায় ১৯২৯ সনের ডিসেম্বরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণেন্দ্র মোহনের পরিচালনায় যতীন্দ্র মোহন 'এডভান্স' কাগজ বের করতে শুরু করেন। অতঃপর 'লিবার্টি' ও 'এডভান্স'—দুই কাগজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে পর দেখা গেল মতান্তর মনান্তরের অনেক কারণ জমা ছিল।

১৯২৯ সনে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস অনন্ত সিংহ প্রমুখ কতিপয় যুবককে (এঁদের অনেকেই পরের বছর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে জড়িত হন) তাঁদের

* History of the Congress p. 360

কমিটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে নেন। তরুণেরা দেশসেবার জন্য তাঁদের আকুল আগ্রহের কথা বললেন, প্রবীণেরা তাঁদের কথা নিঃসংশয়ে মেনে নিলেন। তখন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি যতীন্দ্র মোহন। প্রবীনতম সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মহিমচন্দ্র দাস ও ত্রিপুরা চৌধুরী। কমিটির তরুণ সদস্যেরা প্রস্তাব করলেন চট্টগ্রাম কংগ্রেসের জেলা কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করার জন্য সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করা হোক। মহিমচন্দ্র ও ত্রিপুরা চৌধুরীকে যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান খাড়া করে সুভাষচন্দ্রের নামে যথাযথ আমন্ত্রণ গেল। অথচ চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট যতীন্দ্র মোহনকে (তিনি তখন কলকাতায়) এ বিষয়ে পরামর্শ করা দূরের কথা, তাঁকে জানানো পর্যন্ত হলনা। অন্যসূত্রে যখন খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছল তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি তাঁকে না জানিয়ে সুভাষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জানালে তো তিনি নিশ্চয়ই এ প্রস্তাব সমর্থন করতেন। জেলা কংগ্রেসের আচরণে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ ও বিব্রত বোধ করলেন। কিছুদিন পর অন্য কাজে যখন তিনি চট্টগ্রাম গেলেন জেলা কংগ্রেসের কোনো কোনো সদস্যও এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মহিমচন্দ্র ও ত্রিপুরা চৌধুরী নিজেদের সাফাই দিতে গিয়ে বললেন যে কংগ্রেসে নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করতে হলে তরুণ বয়স্কদের জেলা কংগ্রেসের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা উচিত—এই বিবেচনায় তাঁরা এ কাজ করেছেন। যতীন্দ্র মোহন তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করা নিয়ে তিনি নিশ্চয় কোনো আপত্তি তুলতেন না ; কিন্তু আমন্ত্রণ করা হয়েছে জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে পাশ কাটিয়ে এবং এতে তাঁকে ছোট করা হয়েছে।

কনফারেন্সের প্রস্তুতি পর্বে চট্টগ্রাম সহরে বেশ হট্টগোল বেধে যায়। কর্মকর্তারা ভাবলেন যদি পর পর তিনটি কনফারেন্সের—জেলা কন্‌ফারেন্স, ইয়ুথ্ কন্‌ফারেন্স ও ষ্টুডেণ্টস্ কন্‌ফারেন্স—আয়োজন করা যায়, তাহলে জলুস হয় দেখবার মতো। যাত্রা মোহন হল-এ জেলা কন্‌ফারেন্স বসল—ঢুকতেই দেখা গেল প্রবেশদ্বারের উপর সংকল্পবচন লেখা হয়েছে 'সবার আগে স্বদেশ।

স্বদেশের উপর কিছু নেই।' মণ্ডপের ভিতরে বেশ খানিকটা দূরে লেখা রয়েছে, 'ন্যায়, সত্য ও ধর্ম'। এসব দেখে কিছু লোক বিরক্ত হলেন, কেউ কেউ আপত্তিও তুললেন। যুবকদের একটি বড় দল দাবী করলেন যে—নীতিবাক্যে সত্যকে দ্বিতীয়স্থান দেওয়া হয়েছে তা তদ্দণ্ডে অপসারিত করা উচিত। কর্ম-কর্তারা সে দাবী স্বীকার না করায় একদল যুবক সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। তার কিছুক্ষণ পরে শ'দুয়েক যুবক প্রবেশ পত্র ছাড়াই মণ্ডপে ঢুকবার জন্য জেদাজেদি করে। ফলে এই দলের সঙ্গে কন্‌ফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবকদের একটা সংঘর্ষ বেধে যায়, ইটপাটকেল লেগে বেশ কয়েকজন জখম হন। শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে হস্তক্ষেপ করায় হট্টগোল থামে।

বিকাল বেলার অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সভাপতি। তখন আবার এক দফা গণ্ডগোল হল। একটা থান ইট এসে পড়ল সভাস্থলের মাঝখানে, কেউ কেউ বললেন ইট ছোঁড়া হয়েছে পাশের বাড়ির ছাদ থেকে—অমনি একদল স্বেচ্ছা-সেবক বাড়ি চড়াও হয়ে বাড়ির মালিককে বেদম প্রহার দিল। গৃহস্থ ভদ্রলোক তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনলেন। পরে তাদের কেউ কেউ শাস্তিও পেয়েছিল।

বাংলায় একতাবোধ ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ এল যতীন দাস যখন লাহোর জেলে মারা গেলেন। যতীন ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির যুক্ত সম্পাদক, লাহোর জেলে বন্দী থাকা কালে রাজবন্দীদের প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনাহারে থাকার পর ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন দাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকারের হৃদয়হীন আচরণে সমগ্র দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে। বীর শহীদরূপে যতীন দাসের স্মৃতির প্রতি সারা দেশের লোক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। হাওড়া ষ্টেশনে যেদিন তাঁর মরদেহ এসে পৌঁছল, সেদিন লোকে লোকারণ্য। বাংলার নেতৃবৃন্দ শবযাত্রার পুরোভাগে হেঁটে চললেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্র মোহন, সুভাষচন্দ্র,

বিধানচন্দ্র রায়, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত,, কিরণ শঙ্কর রায় ও আরো অনেকে।

লক্ষ লক্ষ লোক মরদেহ বহন করে নিয়ে গেল হাওড়া ষ্টেশন থেকে কেওড়াতলার শ্মশানঘাট। যতীন দাসের এই আত্মোৎসর্গের ফলে রাজবন্দীদের অবস্থার কিছু উন্নতি সাধন হয়। এরপর থেকে তাঁদের 'এ', 'বি' ও 'সি' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং দণ্ডাদেশ দেবার সময় বিচারকদের নির্দেশ দিতে হয় কোন রাজবন্দী কোন শ্রেণীতে ভুক্ত হবেন।

এই ঘটনার ফলে বাংলায় প্রতিপক্ষ দলগুলির মধ্যে সাময়িকভাবে রেষারেষি হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯২৯ সনের নভেম্বর মাসে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বাৎসরিক অধিবেশনে বিসম্বাদ আবার প্রকট হয়। সে সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ও কিরণ শঙ্কর ছিলেন সেক্রেটারী। চট্টগ্রামের বিরোধী পক্ষের ইচ্ছা ছিলনা যে চট্টগ্রাম থেকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসাবে যতীন্দ্র মোহন নির্বাচিত হন। তাঁদের বিরুদ্ধতা সত্বেও যতীন্দ্র মোহন ঠিকই নির্বাচিত হলেন, কিন্তু এবার চট্টগ্রামের সাতজন প্রতিনিধি সদস্যের মধ্যে তিনি একাই পুরনো দলের—বাকী ছয়জনই নূতন—বিরুদ্ধ পক্ষের ভোটের জোরে নির্বাচিত।

বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। মাত্র চার ভোটের ব্যবধানে যতীন্দ্র মোহন সুভাষচন্দ্রের কাছে পরাজিত হলেন। সমবেত সদস্যদের একটা অংশ তুমুল আপত্তি তুলে বললেন ভোটগণনা ঠিকমতো হয়নি সুতরাং এই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন আইনসঙ্গত হতে পারে না। তাঁরা দাবী করলেন অখিল ভারত কংগ্রেসের কর্মসমিতিতে যতীন্দ্র মোহনই বাংলার প্রতিনিধিসদস্যরূপে বহাল থাকুন। উত্তেজিতদের শান্ত করতে চাইলেন যতীন্দ্র মোহন কিন্তু তারা চিৎকার করে জিগীর দিতে লাগল। যতীন্দ্র মোহন এবার শক্ত হয়ে বললেন যে পুনরায় নির্বাচন হয় এমন তিনি চাননা এবং ফলাফল যা হয়েছে তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র বিরূপতা নেই। সেদিন এলগিন রোডস্থিত তাঁর বাড়িতে তাঁর সমর্থক দলের লোক ভিড় করে এল,

নিজের বাড়ীতে নিজেই তিনি প্রবেশের পথ পান না। শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধুর জামাতা সুধীর রায় সঙ্কট মোচনের জন্য এগিয়ে এলেন এবং তাঁর অনুরোধক্রমে সুভাষচন্দ্র এসে পড়লেন সেনগুপ্ত বাড়িতে। যতীন্দ্র মোহন তাঁকে স্বাগত করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন—দুজনে আলাপ করলেন ঘণ্টা দুই ধরে। বাইরের জনতার বিক্ষোভ তাতেও থামলনা, শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপীল করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

পরদিন কংগ্রেসের কর্মসমিতির সভা হল এলাহাবাদে। সদস্য হিসাবে যতীন্দ্র মোহন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্র মোহনের সমর্থকদের আপীল নিয়ে বিবেচনা শুরু হবার আগেই, কর্মসমিতি স্থির করেছিলেন বাংলার বিবাদ বিতর্ক সমাধানের জন্য মতিলাল নেহরুকে নিযুক্ত করা হবে। পরে কী সব আপত্তি ওঠায় স্থির হয় এম. এস. আনেকেই এই কাজের ভার দেওয়া হোক।

১৯৩০ সনে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে রিপোর্ট প্রকাশিত হতে বিলম্ব হয়। তিনি ১৯৩১ সনে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯৩২ সনে আন্দোলন এমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে লাগল, যে আনে রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে কিছু করা সম্ভবপর হলনা। বাংলার লোক রিপোর্টের কথা একপ্রকার ভুলেই গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ণ স্বাধীনতা

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয় মাদ্রাজের অধিবেশনে ১৯২৭ সনে—নেহরু রিপোর্টে তার উল্লেখ ছিল। পরের বছর কলকাতা কংগ্রেসে চূড়ান্তভাবে স্থির হয় ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডোমিনিয়ন হয়ে থাকবে না পূর্ণ স্বাধীনতার পথে পদক্ষেপ করবে। ১৯২৯ সনের লাহোর অধিবেশন ঘোষণা করে ভারতের শেষ লক্ষ্য হল পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই লক্ষ্য সাধনে কীভাবে এগোনো যায় লাহোরে সেই বিষয়েই আলোচনা হয়, এবং স্থির হয় অখিল ভারত কংগ্রেসের কর্মসমিতিকে এই ব্যাপারে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে। ঘোষণা করা হল প্রতি বছর ভারতের সর্বত্র ২৬শে জানুয়ারির দিনটি স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করা হবে। এই কর্মসমিতির সদস্য হিসাবে বাংলায় স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যাপারে যতীন্দ্র মোহনেরই উদ্যোক্তা হবার কথা। কিন্তু রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তখন অসুস্থ, ডাক্তার বিধান দিয়েছেন তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। তাঁরা এও বলেছেন যে সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিন তিনি যদি সমুদ্র ভ্রমণ করে আসতে পারেন তাহলে নিরাময় ত্বরান্বিত হতে পারে। স্থির হল তিনি জাহাজে কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে আবার কলকাতায় ফিরবেন, কিন্তু ২৬শে জানুয়ারির আগে তো আর তিনি যাত্রা করতে পারেন না। ডাক্তারদের হুকুম অমান্য করে ২৫শে জানুয়ারি তারিখে তিনি করপোরেশনের সভায় গেলেন—উদ্দেশ্য, পরের দিন যাতে করপোরেশনের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয় তৎসংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা। মেয়রের বেদীতে তাঁকে ধরে ওঠাতে হল, চেয়ারে আসীন হয়েই তিনি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

এই সহরের মেয়ররূপে এই সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে বিশেষ জরুরী। আজকের সভায় আপনাদের কাছে যে প্রস্তাব আসবার কথা,

সেই প্রস্তাব নিয়ে ছ'চার কথা বলার মেয়রেরই অগ্রাধিকার। তবে আমি কেবল আমার অধিকার কায়েম করার জন্য এখানে আসিনি, এসেছি একটি মহা-পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন করতে।

যতীন্দ্র মোহন বলে চললেন :

দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমাদের যে নিজের হাতে ইউনিয়ন জ্যাক্ ওড়াতে হয়—জাতীয় আত্মসম্মানের দিক থেকে এর চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু হতে পারেনা। ইউনিয়ন জ্যাক্ ওড়ানো নিয়ে দেশের সর্বত্র একটা ত্রাস ও উদ্বেগের সঞ্চার দেখা যায়। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা মোটেই অনুকুল নয়। আমি ইংরেজদের প্রতি অশ্রদ্ধাবশত এমন কিছু বলছি, সে যেন কেউ মনে না করেন, ব্রিটিশ পতাকার প্রতিও আমার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভবের বিরোধিতা যদি না করি তাহলে আমায় বলতেই হয় অন্যান্য সকল দেশের অন্যসব পতাকার চেয়ে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ হল আমার আপন দেশের জাতীয় পতাকা।

যতীন্দ্র মোহন আশা প্রকাশ করলেন যে করপোরেশনের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ২৬শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হবে—এই মর্মে যে প্রস্তাব পেশ করা হবে তা যেন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের কথা ছিল এই :

ম্যুনিসিপ্যাল অট্টালিকা ও অন্য নানা প্রতিষ্ঠানে আগামী রবিবার ২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০ সনে, করপোরেশন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন। ভবিষ্যতে উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ দিনে অনুরূপ ব্যবস্থা করা হবে। আগামী কাল পতাকা উত্তোলন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য করপোরেশন চীফ একজিকিউটিব অফিসারকে অনুরোধ করছে।

অসুস্থতা-নিবন্ধন যতীন্দ্র মোহনের বক্তৃতা ও খসড়া প্রস্তাব পাঠ করলেন ডেপুটি মেয়র। প্রস্তাব ভোটে দেবার পর দেখা গেল, সাত জন বাদে আর সকল সদস্যই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনে আর কোনো

বাধা রইল না, পরদিন করপোরেশনের প্রত্যেক অট্টালিকা ও প্রতিষ্ঠানের উপর জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়ল। পুলিস অবশ্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন বে-আইনী ও রাজদ্রোহাত্মক বলে নালিশ করেছিল। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল কুমার সিংহ সে অভিযোগ নাকচ করে দেন।

যতীন্দ্র মোহনকে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন দেশবন্ধু পার্ক-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সাগ্রহে এই কৃত্য সম্পন্ন করেন। সহধর্মিনী নেলী ও বিশ্বস্ত অনুচর ক্ষিতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন দেশবন্ধু পার্ক-এ হাজির হন, সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনিতে তাঁকে সংবর্ধিত করে।

সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামা এই তাঁর প্রথম নয়। বার বার স্পর্ধিত বিরোধে সরকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি যেন বলেছেন সরকারের যদি সে ক্ষমতা থাকে তো তাঁকে শাস্তি দিক। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী যে মূহূর্তে ন্যায়সঙ্গত বলে জেনেছেন তন্মুহূর্তে তাঁর ভয়ডর ঘুচে গেছে, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন। বছর কয়েক আগে সুভাষচন্দ্রকে যখন গ্রেফতার করা হয়, দেশবন্ধু বলেছিলেন :

দেশভক্তি যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি অপরাধী।

দেশপ্রিয়ও তাঁর নেতার এই বাণীটুকু অন্তরের গভীরে গ্রহণ করেছিলেন। দেশভক্তির এই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্য অন্য বীর সেনানীরা।

১৯৩০ সনের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে দেশবন্ধু পার্ক-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অব্যবহিত পরেই যতীন্দ্র মোহন সমুদ্রপথে সিঙ্গাপুর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। মনে মনে আশা করা গিয়েছিল এই পরিবর্তনের ফলে তাঁর মনের শান্তি তিনি অনেকখানি ফিরে পাবেন, রক্তের চাপও অনেকটা হ্রাস পাবে। কিন্তু এ যাত্রায় যতখানি আশা করা গিয়েছিল তেমন কিছু হয়নি।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুরের জাহাজ তিনি ধরলেন ১৯৩০ সনের

১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে। রেঙ্গুনে জাহাজ লাগল ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, সহরের কতিপয় মুখ্য নাগরিক জাহাজে এসে যতীন্দ্র মোহনকে ধরলেন তিনি যেন নেবে যান ও সহরবাসীদের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা দেন। কিন্তু তাঁর তখন অব্যাহত বিশ্রামের দরকার, তাই তিনি বললেন যে সম্ভব হলে ফিরতি পথে একদিনের জন্য নেবে যাবেন। তখন ভারত থেকে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করার কথা চলছে। যদি ব্রহ্মদেশকে পৃথক করা হয় তাহলে যেসব ভারতীয় সে দেশে বসবাস, কাজ কারবার পত্তন করেছে—তাদের তো সমূহ ক্ষতি। এইসব ভারতীয়দের মুখপাত্ররূপে এগিয়ে এসেছিলেন আবদুল বারি চৌধুরী, বেঙ্গল-বর্মা ষ্টীম নেভিগেশ্‌ন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ভারতীয় কোম্পানী দেশ বিভাগের ফলে যেন উঠিয়ে না দিতে হয়, যেন ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, আবদুল বারি চৌধুরী বার বার যতীন্দ্র মোহনকে সেই কথা বললেন।

সেই সময় ভারতে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য ও লবণ আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনরূপে গড়ে তোলার কাজে নিমগ্ন। ভারতের এইসব ঘটনাবলীর ঢেউ এসে লাগছিল ব্রহ্মদেশেও। ব্রহ্মের মানুষ সজাগ হয়ে স্বাধীন ব্রহ্মের জন্য দাবী জানাতে লাগল। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরতি পথে যতীন্দ্র মোহনের জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে লাগল ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেদিন রেঙ্গুন ডক্‌ লোকে লোকারণ্য। স্বাগত জানাবার জন্য যারা এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়—বর্মীরা এসেছিল খুবই কম সংখ্যায়। তৎসত্ত্বেও শোভা-যাত্রার বহর কিছু কম ছিলনা। জাহাজ থেকে নাবিয়ে শোভাযাত্রীরা সস্ত্রীক যতীন্দ্র মোহনকে সোজা নিয়ে গেল জনসভার ময়দানে।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ
ব্রহ্মদেশে বিচার

ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্যুত করার প্রশ্নই ছিল যতীন্দ্র মোহনের রেঙ্গুন বক্তৃতার বিষয়। বর্মীরা কেউ ছিল প্রস্তাবের সপক্ষে, কেউবা বিপক্ষে। ব্রহ্মদেশের গভর্ণর স্যার চার্লস্ ইনেস্ বর্মীদের বলেছিলেন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হতে পারে। সে সময় একটা গুঞ্জন উঠেছিল যে ব্রহ্মদেশে প্রবাসী ভারতীয় অনেকের প্রতি অবিচার অত্যাচার করা হয়, কাউকে কাউকে বর্মা ছেড়ে ভারতে ফিরে যাবার জন্য চাপও দেওয়া হয়। এসব ব্যাপার নিয়ে যখন প্রচণ্ড বিতর্ক চলছে যতীন্দ্র মোহন ঠিক সেই সময়ে রেঙ্গুনে পা দিলেন।

সচরাচর যেমন হয়ে থাকে তেমনি ভাবে স্থানীয় নেতারা নানা বিশেষণে বিভূষিত করে সভাস্থ সকলের কাছে যতীন্দ্র মোহনের পরিচয় দিলেন। বলা হল রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি একজন মহান নেতা, কলকাতার ব্যবহারজীবীদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রগণ্য, মহাত্মা গান্ধীর তিনি দক্ষিণ হস্ত। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন স্বতন্ত্রতাবিরোধী ভারতীয় ও বর্মী। মরিস্ কোলিস্ তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন :*

> এদের সবাই চেয়েছিল সেনগুপ্তের মতো একজন প্রভাবশালী নেতার উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর মুখ দিয়েই বর্মীদের সাবধান করে দেবে যে ভারতের শক্তিশালী নেতাদের আওতা থেকে বেরিয়ে গেলে তাদের মঙ্গল নেই বরঞ্চ তাতে অনেক বিপদ। আর বেরিয়ে পড়তে চাইলেই তো বেরিয়ে যাওয়া যায়না।

যতীন্দ্র মোহনও তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি প্রস্তুত হবার অবকাশ পাননি, কিন্তু কোলিসের কথায় 'তিনি ছিলেন ওস্তাদ বাগ্মী,

* Trials in Burma by Maurice Collis p. 87

সুতরাং অনায়াসে তাঁর মুখে কথা জোগাল।' তিনি বললেন 'স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্তমান অবস্থায় বর্মীরা যদি সরে দাঁড়ায় তাহলে তা নেহাতই পাগলামী হবে।' মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনের মতো অহিংস সংগ্রাম থেকে ব্রহ্মদেশ তাহলে বিচ্যুত হয়ে যাবে। এই সংগ্রামের ফলে যেসব সুবিধাজনক শর্তে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে, পৃথগীকরণের অজুহাত দেখিয়ে ইংরেজ প্রভু ব্রহ্মদেশের জন্য যে সংবিধানের ব্যবস্থা করবেন সে সংবিধানের স্বাধীনতা হবে 'বিড়ম্বিত স্বাধীনতা'।

স্যার চার্লস্ ইনেস্ এক মুখে স্বতন্ত্রতার কথা তুলেছেন অন্য মুখে স্যর জন সাইমনকে জানিয়েছেন যে বর্মীরা পুরোপুরি স্বায়ত্ত শাসনের জন্য এখনো উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি বলে তাদের পক্ষে স্বায়ত্ত শাসন সীমিত হওয়া উচিত। বর্মীরা স্যর চার্লস-এর এই টোপ গেলার মতো এতই যদি নির্বোধ হয় তাহলে তাদের ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা মজুদ হয়ে আছে, তা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবেনা।*

দু'দিন পরে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি বক্তৃতা হল-এ যতীন্দ্র মোহন অন্য ধরনের একটি সমাবেশে 'ভারত-ব্রহ্মদেশ মৈত্রী' বিষয়ে একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বললেন, বর্মীরা যদি স্বায়ত্তশাসনের সংবিধান চায় তাহলে ব্রিটিশ প্রভুদের কথায় যেন বিশ্বাস না করে। মিত্র হিসাবে ভারত ও ব্রহ্মদেশকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আবার সেই স্থূলে প্যাগোডার তলায় ফাইচে স্কোয়ারে যতীন্দ্র মোহন তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতা দেন। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন আবদুল বারি চৌধুরী। আবার বর্মীদের সাবধান করে যতীন্দ্র মোহন বললেন স্বতন্ত্রতার বিরুদ্ধে তারা যেন সংগ্রাম করে।

কাগজে তিনটি বক্তৃতারই সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়, রেঙ্গুনের সি. আই. ডি. প্রত্যেকটি সভায় উপস্থিত থেকে প্রচুর নোট নিয়েছিল। পরে যতীন্দ্র মোহনকে

* Trials in Burma by Maurice Collis p 88

গ্রেফতার করে বিচারার্থ যখন রেঙ্গুনে নিয়ে আসা হয়, রাজদ্রোহ মামলার জজ মরিস কোলিসের হাতে পুরো বক্তৃতার রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। তাঁর 'Trials in Burma' পুস্তকে কোলিস্ এই রিপোর্ট তাঁর কাছে দাখিল করা নিয়ে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯৩০ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে পুলিস কমিশনার মেরিকেন্ কোলিসের সঙ্গে সাক্ষাতক্রমে বলেন :

> সেনগুপ্তকে গ্রেফতার করার জন্য একটি ওয়ারেন্ট এনেছি। স-পরিষদ গভর্ণর বাহাদুর আশা করেন এ ওয়ারেন্ট আপনি সই করবেন। গত মাসে এখানে আসার পর সেনগুপ্ত যেসব বক্তৃতা দিয়েছিল সেকথা আপনার নিশ্চয় মনে আছে ?
>
> জবাবে কোলিস বললেন :
>
> হ্যাঁ, খবর কাগজে দেখেছিলাম বটে তিনি রেঙ্গুনে এসেছিলেন, কিন্তু কোনো বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে আমার তো মনে পড়ছেনা।
>
> একগুচ্ছ কাগজপত্র কোলিসের হাতে দিয়ে কমিশনার বললেন :
>
> কেবল একটা নয়, সেনগুপ্ত তিন তিনটি বক্তৃতা দেয়। এই হল তার হুবহু রিপোর্ট। বক্তৃতাগুলি সবই ছিল রাজদ্রোহমূলক। নীল পেনসিলে আমি যে সব অংশ দেগে দেগে দিয়েছি সেগুলি পড়লে আপনিও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।

একটি বক্তৃতার দাগ দেওয়া অংশগুলি পড়তে গিয়ে কোলিস দেখলেন যতীন্দ্র মোহন স্যর চার্লস ইনেস্ বিষয়ে কয়েকটি কড়া মন্তব্য করেছেন সত্য। তিনি মেরিকেনকে জিজ্ঞাসা করলেন :

> গবর্মেণ্ট এডভোকেটের মতামত নেওয়া হয়েছে কি ?
>
> মেরিকেন্ জবাব দিলেন :

হ্যাঁ। গবর্মেণ্ট এডভোকেটের মত এই যে প্রথম দর্শনেই মনে হয় রাজদ্রোহের মামলা আনা যায়।

কোলিস্ বললেন :

কলকাতার মেয়রকে গ্রেফতার করে রেঙ্গুনে নিয়ে আসাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে মনে হয়। এক নজরে রাজদ্রোহের মতো তেমন কিছু চোখে তো পড়লনা।

মেরিকেন একটু জোর দিয়েই বললেন :

আইন বিভাগের অফিসরদেরও মত যে মামলা আনা যায়।

কোলিস স্বীকার করলেন :

হ্যাঁ। তা মামলা একটা আনা যায় বৈকি। কিন্তু ব্যাপারটা কি তেমনই গুরুতর ?

কমিশনার গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ

সেসব কথা আমরা ভেবে দেখেছি। বললামই তো স-পরিষদ গবর্ণর চান যে মামলা রুজু হয়।

ওয়ারেণ্টে স্বাক্ষর দেওয়া কোলিসের পক্ষে নৈমিত্তিক ব্যাপার। বইয়ে তিনি লিখেছেন আইন কিংবা শাসনের দিক থেকে তাঁর কোনো মতামত চাওয়া হয়নি। তিনি অগত্যা স্বাক্ষর করে দিলেন এবং তাঁর স্বাক্ষরিত ওয়ারেন্ট নিয়ে মেরিকেনও প্রস্থান করলেন। তবে কোলিসের মনে একটা বিষয় খচখচ করতে লাগল—সেটা এই যে গ্রেফতার করে যতীন্দ্র মোহনকে রেঙ্গুনে এনে ফেললে পর মামলাটা তাঁকেই সামাল দিতে হবে কারণ তথাকথিত রাজদ্রোহের অপরাধটা ঘটেছে তাঁরই এলাকায়। বইয়ে লিখেছেন :

এক প্রদেশ সরকারের আওতাভুক্ত জনৈক প্রমুখ ব্যক্তিকে অন্য প্রদেশের সরকার কর্তৃক শেষোক্ত প্রদেশের আওতায় রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা সচরাচর ঘটেনা। সেনগুপ্ত সে সময় সমগ্র ভারতেই পাঁচ জনের একজন—সুতরাং তাঁর গ্রেফতারে বাংলায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেবে নিশ্চয়। প্রদেশের আর পাঁচটা মামলার মতো এ মামলা নয়—এই কথা বলে

কোলিস আরো লিখছেন :

তাঁর গ্রেফতারীর সংবাদ কেবল এদেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশের খবর

কাগজে সঙ্গে সঙ্গে বের হবে! লণ্ডনের কাগজে খবর বেরুতে নিশ্চয় বিলম্ব হবেনা। ভারতের সাংবাদিক মহল বলবে যদি একান্তই প্রমাণের প্রয়োজন থাকে তাহলে এই হল আমলাতন্ত্রী প্রভুদের স্থূল হস্তাবলেপের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।* যতীন্দ্র মোহনকে দণ্ড দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে কিনা, সে বিষয়েও কোলিসের বিবেক তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তাঁর মনে হয়েছিল সরকার তরফের মামলায় তেমন জোর ছিলনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝেছিলেন—"দণ্ড যদি না দেওয়া হয় তাহলে সরকারের সমালোচনায় দেশবিদেশের বহু লোক পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে।"*

* Trials in Burma, p 79

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলকাতায় গ্রেফ্‌তার

১৯৩০ সনের ১১ই মার্চ তারিখে দুজন বর্মী পুলিস অফিসারের হাতে গ্রেফতারী পরওয়ানা দিয়ে কলকাতায় পাঠানো হয়। ১৩ই মার্চ তারিখে কলকাতা পৌঁছেই তাঁরা পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। কলকাতা-দক্ষিণের এসিষ্টেন্ট কমিশনার বর্মী অফিসরদ্বয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান যতীন্দ্র মোহনের এলগিন রোডের বাড়িতে। বর্মী পুলিস অফিসারদের দেখে যতীন্দ্র মোহন তো অবাক— তিনি তো ভাবতেও পারেননি রেঙ্গুনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে আপত্তিকর কিছু থেকে থাকতে পারে। তিনি জানতে চাইলেন বর্মী সরকার কেন তাঁকে গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা পাঠালেন :

আমার সেই রেঙ্গুনের বক্তৃতার জন্য কি ?

ওয়ারেন্ট পড়ে বুঝলেন তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে— রেঙ্গুনের আদালতে শুনানী হবে ১৮ই মার্চ তারিখে।

কলকাতা-দক্ষিণের এসিষ্টেন্ট কমিশনার বললেন :

পাঁচ হাজার টাকা করে দু-দফা জমানত যদি দিতে পারেন, তাহলে আপনাকে জামিনে খালাস দেবার জন্য আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে।

যতীন্দ্র মোহন জবাব দিলেন :

জামিন আমি দিতে চাইনা।

বর্মী অফিসারদের একজন তখন পুলিস কমিশনারকে টেলিফোন করে জানালেন যে বর্মী সরকারের গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানার বলে তাঁরা কলকাতার মেয়রকে গ্রেফ্‌তার করে নিতে এসেছেন। কমিশনার বললেন সে খবর তো তিনি আগেই পেয়েছেন। বর্মী অফিসার জানালেন কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুসারে মেয়রকে নিয়ে যাবার জন্য ষ্টিমারের সেকেণ্ড ক্লাস কেবিন নির্দিষ্ট হয়েছে। কমিশনার দৃঢ়ভাবে বললেন ফার্ষ্ট ক্লাস কেবিনে নিতে হবে। কমিশনার আরো

বললেন, যতীন্দ্র মোহন যদি মুখের কথা দেন পুলিসের হাত এড়িয়ে যাবেননা, তাহলে তাঁকে 'লক-অপ্' এ নিয়ে যাবার দরকার হবেনা। যতীন্দ্র মোহন কোনোরকম কথা দিতে রাজি না হওয়ায়, পুলিস তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে পাহারার ব্যবস্থা করে ক্ষান্ত হন।

পরের দিন ১৪ই মার্চ তারিখে 'এস. এস. সারধানা' নামে মেল্ ষ্টিমার যোগে যতীন্দ্র মোহনকে বর্মী পুলিস রেঙ্গুনের পথে নিয়ে যায়।

তার আগের দিন অনেক ব্যাপার ঘটে যায়। গ্রেফ্তারের খবর রটনা হতে সারা কলকাতা সহর চঞ্চল হয়ে উঠল। হরতাল পালনের জন্য ডাক পড়ল। বর্মী কর্তৃপক্ষ কলকাতায় পুলিস পাঠিয়ে তাঁদের মেয়রকে গ্রেফ্তার করেছে খবর পেয়ে করপোরেশনের সদস্যেরা দলে দলে এলগিন রোডের বাড়িতে এসে উপাস্থত। গৃহবন্দী যতীন্দ্র মোহনকে সবাই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি এমন কি বলেছেন যার জন্য তাঁকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে রেঙ্গুনে। যতীন্দ্র মোহন তাঁদের বললেন, তিনি ঠিক কী বলেছিলেন তাঁর মনে নেই, তবে মোটামুটি ভাবে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধে তিনি নিশ্চয় বলে থাকবেন। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বর্মীদের যে একাহাতে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হতে পারে এবং সে সংগ্রামে তাদের যে হেরে যাবার সম্ভাবনা—এইসব কথাই তিনি বলেছেন। এই খবর পাবার পর করপোরেশনের সমস্ত সভা মুলতবী থাকে, সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেয়রের বাড়ির সামনে কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হতে থাকে। সারা রাত ধরে আত্মীয় বন্ধুদের আনাগোনা হল যতীন্দ্র মোহনকে বিদায় সংবর্ধনা জানাবার জন্য। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস জরুরী সভা তলব করে যতীন্দ্র মোহনকে সংবর্ধিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সারা সহরে সেদিন হরতাল, স্কুল, কলেজ দোকান-পাট যানবাহনের চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ।

পরের দিন ছিল দোল উৎসব। আউট্রাম ঘাটে বিদায় দেবার জন্য বিস্তর লোক সমাগম হল। খবর কাগজগুলি বিশেষ সংখ্যা বের করল। পুলিস

পাহারায় নেলী সেনগুপ্তর সঙ্গে যতীন্দ্র মোহন যখন আউট্রাম ঘাটে এসে পৌঁছুলেন লোকে তাঁদের কপালে আবীর দিল, গলায় মালা পরাল। চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি, মালায় মালায় সারা দেহ যেন ঢেকে গেল, জেগে রইল কেবল লাল আবীর মাখা মুখে বিজয়দর্পের হাসি। নেলীর মনের অবস্থা তখন কীরকম খানিকটা অনুমান করা যায়। জনতা স্বামীর প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করল, সে গৌরবে গরবিনী হয়েও তাঁর মনে গভীর উদ্বেগ। যতীন্দ্র মোহনের শরীর অসুস্থ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর সর্বদা দেখাশোনা সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন। সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পর শরীর স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হলেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। এমন অবস্থায় নেলীর খুবই ইচ্ছা ছিল স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুন যান, কিন্তু পুলিসের অনুমতি পাওয়া গেলনা। জাহাজ ছাড়বার মুখে তিনি স্বামীর কাছে বিদায় নিলেন—সে এক করুণ দৃশ্য। পরিবারের আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এসেছিলেন তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যতীন্দ্র মোহন মুখে মুখে দুটি বার্তা দিয়ে যান। প্রথম বার্তাটি ছিল কলকাতা করপোরেশনের নামে—বার্তায় তিনি বলেছিলেন, রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকবে করপোরেশনে, সদস্যদের প্রতি তাঁর একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শ বাঁচিয়ে রাখেন ও বাস্তবে রূপায়িত করেন। অন্য বার্তাটি ছিল বাংলার উদ্দেশ্যে—এই বার্তায় তিনি বলেছিলেন, আজ বন্দীদশা সত্ত্বেও তাঁর এই কথা ভেবে ভালো লাগছে যে মহাত্মা গান্ধী যখন আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা করেছেন, সেই সময়ে কারাবরণ করে তিনি তাঁর সাধ্যমত দেশের কাজে লেগেছেন। সবাইকে নির্বন্ধ জানালেন যেন সকলে মহাত্মার পতাকার তলায় একত্র হন। আর বললেন, তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে বলে কেউ যেন শান্তিভঙ্গ না করে। জাহাজ নোঙর উঠিয়ে ভেসে চলল, হোলির দিনের কলকাতা সব হট্টগোল ভুলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আউট্রাম ঘাটে। তারপর সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউনিয়ন জ্যাক্ মুর্দাবাদ'।

কোলিস্ প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও এই বিদায় দৃশ্যের একটি অদ্ভুত বাস্তব ছবি দিয়েছেন তাঁর বইয়ে :*

জেটি থেকে চলাচলের তক্তা সরিয়ে দেওয়া হল। জাহাজ ভেসে চলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, জনতা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। তাদের নেতাকে তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে জাহাজ চলে যাচ্ছে। সমস্বরে জনতা চীৎকার করে উঠল—'ইউনিয়ন জ্যাক মুর্দাবাদ!' সেনগুপ্ত তখনো রেলিঙ্গের ধারে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াচ্ছেন। যতক্ষণ না তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন জনতা একটার পর একটা জিগীর তুলে চলল।

রেলিঙ্গের ধারে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন ফুরোতেই তিনি নিজের কেবিনে গিয়ে গাদা গাদা মালা খুলে ফেললেন, মুখের উপর থেকে আবীর ধুয়ে ফেললেন, ধুতি পাঞ্জাবী ছেড়ে তাঁর বড় আরামের বিলিতি স্যুট পরে নিলেন। অতঃপর নেমে গেলেন ডাইনিং সেলুনে এবং ব্রেকফাষ্টের অর্ডার দিলেন। সেনগুপ্তের মধ্যে ভাবাবেগের কোনো বাহুল্য ছিল না। বাস্তব-বুদ্ধিতে তিনি ঠিকই বুঝতেন ব্রিটিশ জাহাজের প্রথম শ্রেণী কেবিনের যাত্রীর পক্ষে বিলিতি পোশাকই প্রশস্ত—যেমন প্রশস্ত নিজের অনুগত বাঙালী জনতার মাঝখানে গলার মালা ও ধুতি চাদর। সকাল বেলার এতরকমের উত্তেজনার পর তাঁর দস্তুরমত ক্ষিদে পেয়েছিল এবং এক প্লেট ডিম ও বেকন্ তিনি খুবই পছন্দ করতেন।

যতীন্দ্র মোহনের নিজস্ব জীবনযাত্রার ব্যাপার নিয়ে ইংরেজ কোলিসের বর্ণিত এই ছবি নিতান্তই তাঁর নিজস্ব। তবে একথা বলতেই হবে মহাত্মা গান্ধীর অন্য অনেক অনুগামীদের মতো যতীন্দ্র মোহনও আপ্ রুচি খানা ও পর রুচি পহেনায় বিশ্বাস করতেন, আহারে বিহারে পোষাকে আশাকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সরোজিনী নাইডুর মতো তিনিও ছিলেন স্বতন্ত্র। মহাত্মার কাছে এঁদের কাউকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়নি। যতীন্দ্র মোহন বিষয়ে প্রায়ই একটা

* Trials in Burma—p. 94

অভিযোগ শোনা যেত—অন্য কংগ্রেস কর্মীরা তৃতীয় শ্রেণীতে রেলভ্রমণ করত তিনি তা করতেন না। যতীন্দ্র মোহন নিজেই এর জবাব দিতে গিয়ে বলতেন, জনতার ভিড় থেকে মুক্তিলাভের তাঁর একমাত্র সুযোগ ছিল যখন তিনি রেলভ্রমণ করতেন প্রথম শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণী পছন্দ করতেন সেই কারণে। জনতা নেতাদের কাছে এমন অনেক কিছু চায় যা না কি আত্মত্যাগেরও বেশী। কিন্তু বিরূপ আলোচনা সত্ত্বেও যতীন্দ্র মোহন তাঁর প্রথম শ্রেণী ছাড়েননি এবং মনে হয় না ছেড়ে তিনি ভালোই করেছিলেন। এমনিতেই রাজনীতিক কাজের প্রবল চাপে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে, তৃতীয় শ্রেণীতে রেলভ্রমণের ধকল যদি তাঁকে সইতে হত, তাহলে আরও আগে হয়তো তাঁকে জীবন বলি দিতে হত।

'এস. এস. সারধানা' সাগর পাড়ি দিতেই কলকাতায় করপোরেশনের একটি বিশেষ বৈঠকে সদস্যেরা মিলিত হলেন—সবাই উপস্থিত হলেন এক কেবল য়ুরোপীয় সদস্যেরা বাদে। সর্বসম্মত ভাবে করপোরেশন নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন :

১। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত কলকাতার মেয়র ও নাগরিক প্রধান, সহরের সকল শ্রেণীর লোকের তিনি শ্রদ্ধাভাজন। এ-হেন ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করায় এই করপোরেশন তাঁদের তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করছে।

২। করপোরেশন মনে করেন ব্রহ্মদেশ সরকারের এই কাজ কেবল অযৌক্তিক এমন নয়, এরমধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর অভিসন্ধি-মূলক হস্তক্ষেপের পরিচয় দেখা যায়। করপোরেশনের আশঙ্কা জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ করে, প্রভুশক্তি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত।

৩। খাঁটি সত্যাগ্রহীর মতো তিনি যে জামিনে খালাস হতে চাননি, এজন্য করপোরেশন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে অভিনন্দিত করছে।

৪। যতীন্দ্র মোহন দেশের তথা করপোরেশনের সেবায় যা করেছেন করপোরেশন মনে করেন সে কাজ বহুমূল্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জজ সাহেবের দোটানা

ইতিমধ্যে বর্মা পুলিসের কাছ থেকে মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথীপত্র মরিস কোলিসের হস্তগত হল। তিনি লক্ষ্য করলেন যে পুলিসের মতে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ তলব করার দরকার নেই—এক বক্তৃতাগুলি যে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে মামুলি সাক্ষ্য ছাড়া। বক্তৃতাগুলি পাঠ করে কোলিসের মনে হল :

> প্রথম দর্শনে সেই যে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, পুনরায় সেই প্রশ্নই জাগল—বক্তৃতাগুলি কি সত্য সত্যই রাজদ্রোহমূলক না নামে মাত্র ? এই প্রশ্নে মনস্থির করতে গিয়ে আমায় হিমসিম খেতে হল। শুনানী হবার আগে অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেট কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা সচরাচর করেন না। কিন্তু এ মামলা তো যেমন তেমন মামলা নয়। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তো পুলিসের দেওয়া নথীপত্রের মধ্যেই নিহিত, ফরিয়াদী পক্ষের মতে অন্য সাক্ষ্য প্রমাণের দরকারই নেই, পুলিস তিনটি বক্তৃতায় যে দুইটির রিপোর্ট দাখিল করেছে তার মধ্যেই রাজদ্রোহের প্রমাণ রয়েছে—এই হল বাদীর বক্তব্য।*

নথীপত্র একাধিকবার পাঠ করে কোলিস ঠিক করলেন পুরো ছবিটা পেতে হলে তাঁকে আরো কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ তলব করতে হবে। ফরিয়াদী পক্ষের পছন্দ অপছন্দে তাঁর কিছু আসে যায়না, তিনি কতিপয় সাক্ষী ডাকবেন। মামলা জোরদার নয় এ তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, কিন্তু লাটসাহেব স্যর চার্লস ইনেস্ যে মামলা তুলে নিতে দেবেন—এমন লক্ষণ দেখা গেলনা। কোলিস লিখেছেন :

> সেনগুপ্তকে গ্রেফ্তার করা হয়েছে। এখন তিনি সমুদ্র পথে। রেঙ্গুন এসে পেঁাছবেন ১৭ই মার্চ তারিখে সকাল সাতটায়। রেঙ্গুনে পা দেবার অব্যবহিত পরে তাঁকে যে কর্তৃপক্ষ বলবেন মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে—এমন অসম্ভব সম্ভাবনার কথা ভেবে কোনো লাভ নেই।*

---

* Trials in Burma—p 95

কারো সঙ্গে যে পরামর্শ করবেন তারও জো নেই। স্থির করলেন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার ফ্রাঙ্ক ফার্ণলি হুইটিংষ্টলকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন কী হেতু গবর্ণর বাহাদুর মামলা রুজু করতে চেয়েছেন। আসল কারণটা কী? ডেপুটি কমিশনার তাঁকে বললেন :

ভারতের বিক্ষোভকারীরা এদেশে এসে নাক গলাবে গবর্ণর বাহাদুর তা বরদাস্ত করবেন না। হঠাৎ এদেশে উড়ে এসে ভারত ব্রহ্ম পৃথগীকরণের সমস্ত প্রস্তাব সেনগুপ্ত ভেস্তে দেবে—এতে তো কোনো মানুষ খেপে যাবার দাখিল হতে বাধ্য। তাছাড়া মহামান্য লাটসাহেবের আদৌ ইচ্ছা নয় ভারতের নানা গণ্ডগোলের সঙ্গে বর্মা জড়িয়ে পড়ে। সি. আই. ডি. বক্তৃতার ব্যাপারটা যখন তাঁর কানে তোলে তিনি ভাবলেন বর্মীদের মাথা বিগড়ে দেওয়া থেকে সেনগুপ্তের মত লোককে নিরুৎসাহ করার এ একটা মোক্ষম সুযোগ।

১৭ই মার্চ তারিখে নৌ-পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ফিপস্ জেটিতে হাজির থাকবার কথা। 'এস. এস. সারধানা' জাহাজ জেটিতে এসে ভিড়লেই ফিপস্ যতীন্দ্র মোহনকে নিয়ে সোজা চলে যাবেন কোলিসের বাড়িতে—সেখানে অপেক্ষা করবেন কোলিস ও পুলিস কমিশনার মেরিকেন। জেটিতে সেদিন বহুলোকের ভিড়—খদ্দরধারী বাঙালী, গৈরিকধারী বৌদ্ধ ফুঙ্গী এবং বিপ্লবী দলের কতিপয় বর্মী স্ত্রীলোক। কোলিস তাঁর বইয়ে লিখেছেন :

ভিড় দেখে ফিপ্‌স এমন ভয় পেলেন যে পুলিস গাড়ির চালককে হুকুম দিলেন যেন সে পাশের একটা গেট দিয়ে হুস করে যতীন্দ্র মোহনকে নিয়ে চলে যায়। ভেবেছিলেন হয়তো এইভাবে জনতাকে ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে পড়া যাবে। সহরের রাস্তায় লোকে শোভাযাত্রা সহকারে যতীন্দ্র মোহনকে নিয়ে যাবে, বর্মী স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করে পুলিসের বাপান্ত করবে—এমনটা তিনি চাননি। কোলিসের বাড়ির সামনে ভিড় জমে এটাও তাঁর ইচ্ছা ছিলনা।

ফিপস্ সেলুনে গিয়ে যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং কালবিলম্ব না করে তাঁকে নিয়ে গেলেন পাশের গেটে অপেক্ষমান পুলিস গাড়ির দিকে। কিন্তু :

দীর্ঘদেহ ভারতীয় নেতাকে উপস্থিত জনতার চিনে নিতে দেরি হলনা। শঙ্খ বেজে উঠল, ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম্, গাড়ির চারিদিকে লোক এল ভিড় করে। গোলাপ ফূলের মালা পরানো হল সেনগুপ্তের গলায়।

রকমসকম দেখে, একটুখানি ফাঁক পেয়েই পুলিস গাড়ি হুস করে কেটে পড়ল ও মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। জনতা সম্ভাব্য নানা জায়গায় খুঁজে হতাশ হল, তারা কেমন করে বুঝবে যতীন্দ্র মোহনকে কোলিসের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কোলিসের বাড়ি যখন পৌঁছলেন যতীন্দ্র মোহনের গলায় তখন গোলাপ ফূলের মালা আর নেই। হল ঘরে কোলিস ও মেরিকেন তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

ছ'ফূটের উপর লম্বা, দোহারা চেহারা, স্বভাব গম্ভীর আচরণ অথচ চোখেমুখে একটা হাসি হাসি ভাব, শালখানা বুকের উপর বেড় দিয়ে কাঁধে ঝুলছে রোমান সেনটরদের 'টোগার' মতো। আমি তাঁকে নিয়ে গিয়ে আমার পড়বার ঘরে বসালাম। তখনো ঠিক রাত হয়নি; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা মতন হবে, বাগানে শেষ সূর্যের আলো তখনো তির্যকভাবে পড়ে আছে।

যতীন্দ্র মোহন বসলেন। কোলিস চায়ের কথা বলায় তিনি বললেন যে জাহাজেই তাঁর চা-পান হয়ে গেছে। মনে হল কোলিসকে তিনি বেশ আগ্রহের সঙ্গে দেখছেন। কোলিস বললেন :

শুনলাম আপনার অসুখ করেছিল এবং এখনো ঠিক সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারেননি ?

যতীন্দ্র মোহন জবাব দিলেন :

হ্যাঁ, আমার রক্তের চাপটা কিছুকাল থেকেই একটু উঁচুর দিকে। কিন্তু

এই দ্বিতীয় দফা সমুদ্র ভ্রমণের পর মনে হচ্ছে ভালোই আছি। এত অল্প দিনের ব্যবধানে আবার সমুদ্র ভ্রমণের খরচা আমার পকেট থেকে কুলোত না।

কোলিস বললেন :

কাল এগারোটার সময় আপনার বিচার শুরু হবে। হাইকোর্ট থেকে আমি অনুমতি চেয়ে আনিয়েছি—যদি চান আপনাকে জামিনে খালাস দেওয়া যেতে পারে। জমানতের অঙ্ক তাঁরা যা স্থির করেছেন, তা নাম মাত্র।

যতীন্দ্র মোহন বললেন :

না, জামিনে খালাস হওয়া আমার চলবেনা। তা যদি করতে হয় তাহলে আপনাদের আদালতের অধিকারও আমায় মেনে নিতে হয়। কথাটা হয়তো রূঢ় শোনাবে কিন্তু সে আমি মেনে নিতে পারিনা।

কোলিস ক্ষুণ্ণ হলেন। বরাবর তিনি শুনে এসেছেন ব্রিটিশ বিচার ন্যায়-সঙ্গত বিচার—সে বিচারে পক্ষপাত নেই। ভারতে তাহলে কি ব্রিটিশ বিচারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে? তাঁর যেন আঁতে ঘা লাগল, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে এ মামলা ফয়সালা হবার আগেই, যতীন্দ্র মোহনকে দিয়ে তিনি স্বীকার করাবেনই যে তাঁর নিজের আদালত সুবিচার করতে জানে। কোলিস তাঁর নিজের কড়া পাহারায় যতীন্দ্র মোহনকে বাড়িতেই রাখবেন বলেছিলেন। যতীন্দ্র মোহন সে প্রস্তাবে রাজি থাকলেও মেরিকেন রাজি হলেন না, ফলে তাঁকে কারাবাসেই যেতে হল। চলে যাবার আগে কোলিস যখন তাঁকে তাঁর সপক্ষে কোনো আইনজ্ঞ নিযুক্ত করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, যতীন্দ্র মোহন বললেন :

এরকম মামলায় আমরা সপক্ষ সমর্থন করিনা।

এই রেঙ্গুন মামলা অন্য সব মামলা থেকে এই কারণে স্বতন্ত্র হয়েছিল যে এখানকার জজ চেয়েছিলেন বিচার হবে ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতশূন্য; এমন বিচার হবেনা যা দেখে লোকে বলতে পারে যে 'সুনীতিপরায়ণ' ইংরেজদের মুখের উপর তুড়ি দেবার অপরাধে 'দুর্নীতিপরায়ণ' কংগ্রেসীকে বেশ কড়কে দিলেন

জজসাহেব। স্যর চার্লস ইনেস ঘুণাক্ষরেও যদি জানতেন কোন ধরনের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা দায়ের হবে, তা হলে তিনি হয়তো ভারতের অন্যতম মহান গরীব মেয়রকে ভারত থেকে রেঙ্গুন এনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইতেন না। পরের ঘটনাবলী অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায় যতদিন গেল যতীন্দ্র মোহন সম্পর্কে মরিস কোলিসের শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছিল। তিনি লিখেছেন :

> আমি তাঁর ব্যাপারে কি করছিলাম তা নিয়ে মানুষ হিসাবে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী না হয়ে পারেননি নিশ্চয়। কিন্তু রাজনীতিক হিসাবে, কিংবা কারাবরণ করে যে কংগ্রেসী দল তাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছে সেই দলের অন্যতম নেতারূপে, তিনি নিশ্চয় আমার অবলম্বিত পন্থা সর্বতোভাবে অনুমোদন করতে পারেননি। তাঁর মতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বিধায়, লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলে তিনি সহজেই শহীদ বলে গণ্য হতে পারবেন। মানুষ হিসাবে কারাবরণে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু রাজনীতিক হিসাবে তিনি ভেবেছিলেন কারাবরণ তাঁর পক্ষে উচিত কর্ম। স্বক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল অটল এবং ব্যক্তিগত আরামের ব্যাঘাত ঘটলেও কর্তব্য পালনে তাঁর দ্বিধাভয় মোটেই ছিলনা। সুতরাং কি হবে কি হবেনা এই নিয়ে তাঁর মনে হতাশা ও উদ্দীপনার টানাপোড়েন চলেছিল। সকল লোকের দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর উপর, আদালত ঘরে জমায়েত হয়েছিল অর্ধেক এশিয়া খণ্ডের সাংবাদিকেরা, রাস্তায় রাস্তায় তাঁর অনুগামীরা জিগীর তুলছিল গলাফাটানো চিৎকারে। কিন্তু তাঁকে শান্ত সমাহিত থাকতে হবে, চাপা উত্তেজনা যেন কোনো প্রকারে বাইরে প্রকাশ না পায়।

কোলিসের এই অনুমান মিথ্যা ছিলনা। কিন্তু 'যতীন্দ্র মোহন একটা কোনো কৌশল করে আমাকে (কোলিসকে) দিয়ে লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিয়ে নেবেন বলে আশা করেছিলেন'—কোলিসের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপ্রসূত। এই ভুলের জন্যই কোলিস অন্যত্র তাঁর বইয়ে লিখেছেন :

গোড়ায় তিনি (যতীন্দ্র মোহন) আশা করেছিলেন এই মামলা থেকে মস্ত ফায়দা ওঠাবেন। সে আশা তার পূরণ হয়নি। বর্মী সরকারের কাণ্ড-কারখানা দেখে তিনি একচোট মজা পেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু বলতে পারবেন না তাঁর প্রতি তাঁরা খুব একটা অন্যায় বিচার করেছেন।

মনে রাখতে হবে যতীন্দ্র মোহন কখনো ঘুণাক্ষরে ভাবেননি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরতি পথে অসুস্থ শরীরে এক প্রকার দোনামনা ভাবে ব্রহ্ম প্রবাসী ভারতীয়দের একান্ত অনুরোধে মুখে মুখে যা তিনি বলেছেন সেই নিতান্তই মৌখিক বক্তৃতাগুলি রাজদ্রোহাত্মক বলে বিবেচিত হতে পারে। বর্মায় বক্তৃতা দেবার অপরাধে কলকাতায় গ্রেফতার হওয়ায় সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি নিজে। বিচার চলা কালে তাঁর আচরণ ছিল যেমনটা ভারতের সত্যাগ্রহী একজন নেতার কাছ থেকে আশা করা যায়। আসামীর কাঠগড়ায় তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল, তা না হলে তাঁর আচরণ দেখে বুঝবার জো ছিলনা কে বাদী কে বিবাদী। সপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করা দূরে থাক, ভাবেভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ বিচারের প্রহসনে তিনি অনিচ্ছুক অভিনেতা, তাঁকে ধরে এনে আসামী সাজানো হয়েছে সুতরাং বিচারের ফলাফলে তিনি নিরাসক্ত, এতে তাঁর কিছু আসে যায় না।

যতীন্দ্র মোহনের নিস্পৃহ গাম্ভীর্য এবং কোলিসের পক্ষপাতশূন্য বিচার— রাজনীতিক মামলার দিক থেকে ব্রহ্মদেশে একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করেছিল। বিচার যখন চলছে কোলিস তাঁর কয়েক জন বন্ধুকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাজদ্রোহ মামলা নিয়ে তখন অতিথিদের মনে প্রবল ঔৎসুক্য। এই ডিনারের কথা বলতে গিয়ে কোলিস লিখেছেন :

তখন সেনগুপ্ত-মামলা নিয়ে সকলে কৌতূহলাক্রান্ত। একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে, নাটকীয় পরিস্থিতিতে দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে। সকলের মনেই ধাঁধাঁর মতো প্রশ্ন জাগছে—আমি কেমন 'রায়' দেব এবং সেনগুপ্তকে যদি আমি ছেড়ে দি তাহলে কি সরকার আমায় ছেড়ে কথা কইবে? সারা সহরে

তখন কানাঘুষোয় ছড়াছড়ি : আমি না কি সেনগুপ্তের সতীর্থ ছিলাম ; ভারত সরকার না কি বর্মা সরকারকে হুকুম দিয়েছিলেন সেনগুপ্তকে গ্রেফ্‌তার করতে ; আমি যদি সেনগুপ্তকে খালাস দিই, তাহলে স্যর চার্লস না কি পদত্যাগ করবেন অন্যথায় আমাকে পদচ্যুত করবেন। অতিথিদের আলাপ আলোচনা শুনে আমার ধারণা হল এই নাটকের কুশীলবদের মধ্যে আমরা যারা ছিলাম—সেনগুপ্ত, স্যর চার্লস ও আমি স্বয়ং, ইগার, মেরিকেন থেকে শুরু করে সার্জেণ্ট রায়ান পর্যন্ত—আমরা সকলে তখন হাজারো দর্শকের চোখের সামনে যেন অ ভনয় করে চলেছি। আজ যিনি নায়কের ভূমিকায় কাল তাঁকে দুর্বৃত্ত বলে বরবাদ করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের বিষয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। এইসব উত্তেজনাময় মুহূর্তে হঠাৎ কখনো মনে হত আমি যেন স্বদেশ থেকে, আমার অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে, নির্বাসনে আছি, স্মৃতিপথে ভেসে যেত এক ঝলক মার্চ মাসের বিলিতি হাওয়া, পলকের মধ্যে যেন দেখতে পেতাম রিজেণ্ট ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে একটার পর একটা লণ্ডনের বাস্ পিকাডেলি সার্কাসের দিকে মোড় নিচ্ছে।

ডিনার শেষ হতে একজন ইংরেজ বন্ধু কোলিসকে বললেন :

আইনটা যদি ঠিক রাখতে পারেন তাহলে কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না।

যতীন্দ্র মোহনের বক্তৃতা কোলিস সবিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। বক্তৃতায় এমন কিছু পাননি যার জন্য তাঁর নামে অভিযোগ আনা চলে। সব চেয়ে আপত্তিকর কথা তিনি যা বলেছিলেন সে হল সরকারকে 'পাপের প্রতিষ্ঠান' বলে বর্ণনা করা। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতায় এছাড়া আর বিশেষ কিছু যে ছিল বলে তাঁর মনে হয়নি, তৃতীয় বক্তৃতায় বরঞ্চ রাজদ্রোহের গন্ধ ছিল একটু বেশী উগ্র কিন্তু এতেও খুঁজে পেতে দুটি উধৃতির বেশি কিন্তু পাওয়া গেলনা যার ভিত্তিতে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা যায়। অভিযোগের উত্তরে যতীন্দ্র মোহন যেহেতু বলবেন না তিনি দোষী কি নির্দোষী—'রায়' দিতে দেরি করলে চলবেনা। কী রায় দেবেন—ছোট অঙ্কের জরিমানা ? সে তো আসামী দেবেন না। সুতরাং

বিনাশ্রমে দশদিনের কারাদণ্ড দেওয়াটাই সব চাইতে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে। এইসব সাত পাঁচ ভেবে কোলিস দশদিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের বিধান দেবেন স্থির করলেন।

মনে মনে নানা পর্যালোচনার পর কোলিস যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, তখন প্রায় রাত দুপুর। সেই চরম মুহূর্তটির কথা লিখতে গিয়ে কোলিস বলেছেন :

মনে গভীর একটা স্বস্তি এল, প্রকাণ্ড বোঝা একটা নেবে গেল যেন। আমি যে আইন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছি—এ নিয়ে আর আমার দ্বিধা সন্দেহ রইলনা। ন্যায়-বিচার নিয়ে এমন মাথা ঘামিয়েছিলাম যে একবার ভেবেও দেখিনি গবর্মেণ্ট ও শাসকগোষ্ঠি আমার এই সিদ্ধান্ত কী চোখে দেখবেন। সে যাই হোক মনে এই স্বস্তির ভাব নিয়ে আমি নথীপত্র সরিয়ে রাখলাম এবং পড়ার ঘরের বাতি নিভিয়ে শুতে গেলাম উপরতলায়।

১৮ মার্চ তারিখে যতীন্দ্র মোহন হুড্‌খোলা মোটরগাড়ি চেপে আদালত এলেন—তাঁর পাশে বসে এলেন ইম্পিরিয়াল পুলিসের হল্। জনতা সমস্বরে চিৎকার করে তাঁকে অভিনন্দন জানাল, তিনিও হাসিমুখে হাত নাড়িয়ে জনতাকে প্রত্যভিবাদন করলেন। চারিদিকে তখন কেবল 'বন্দেমাতরম্' ও 'যতীন্দ্র মোহন কি জয়' ধ্বনি উঠছে। কোলিসের বর্ণনা থেকে মনে হয় জনতায় উপস্থিত ছিল কেবল ভারতীয়েরা, বর্মীরা কেউ ছিলনা। রাস্তার দু'ধারে দলে দলে সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। উপস্থিত জনতার সকলেই ভারতীয় হওয়া সত্বেও বিরাট লোক সমাগম হয়েছিল।

যতীন্দ্র মোহন আদালতে প্রবেশ করে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে খবর কাগজ পড়তে লাগলেন—ভাবখানা এমন যেন তিনি একেবারেই নিস্পৃহ। অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছিল কোলিসের ভাবগতিক তিনি বেশ নিরীক্ষণ করছিলেন। আদালতের হাতের বাইরে জনতার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় তৃতীয় দিন

সৈন্য ডাকতে হয়। বেশকিছু লোক জখম হয়েছিল। এত শত হট্টগোলের মধ্যেও যতীন্দ্র মোহন নির্বিকার বসেছিলেন, বিচারের সময় একটি বারও মুখ খোলেননি। বিচারের শেষ পর্বের কথা কোলিস তাঁর বইয়ের 'সেনগুপ্ত হাসলেন'—শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখতে গিয়ে বলেছেন :

২২ মার্চ তারিখে আবার যখন কোর্ট বসল, দেখা গেল বাইরে জনতার ভিড় বিন্দুমাত্র কমেনি। সশস্ত্র মিলিটারি পুলিস দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য। যতীন্দ্র মোহনকে আনা হল সকাল পৌনে এগারোটায়। আজ জনতা নিস্তব্ধ। এগারোটা বাজতে কোলিস তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মিঃ তৈয়বজী—আগের দিন গণ্ডগোলে মাথায় চোট পেয়েছিলেন বলে আজ তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভারতের কাগজে কাগজে তখন লেখা হচ্ছে যে 'বর্মী পুলিশ নৃশংসভাবে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জনতার উপর হামলা করায় অনেকে আহত হয়ে আদালতের দরজা থেকেই বিতাড়িত হয়েছেন।'

কোলিসের একটি প্রশ্নের সময় অমনোযোগী থাকায় যতীন্দ্র মোহন হঠাৎ একবার 'হ্যাঁ' বলে ফেলেছিলেন। কোলিস বললেন যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হবে, প্রশ্ন করলেন :

আমি কি তাহলে ধরে নেব যে অভিযোগের জবাবে সপক্ষে আপনি কিছু বলতে ইচ্ছুক নন ?

যতীন্দ্র মোহন উত্তরে বললেন :

হ্যাঁ।

তাঁর মনোভাব ও আচরণের পূর্বাপর অনুসারে চুপ করে থাকাই উচিত ছিল। বড় জোর মুখে চোখে একটা ভাব ফুটিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে অত্যাচারী শাসকের বিচার তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু কোলিসের বিচারের নিশ্ছিদ্র ন্যায়পরায়ণতা দেখে এবং স্বভাবতই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন বলে, যতীন্দ্র মোহন সব সময় মুখ গোমরা করে বসে থাকতে পারেননি। কোলিসের

প্রশ্নের জবাব দিয়েই তিনি বিড়বিড় করে বলেছিলেন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। কোলিস দণ্ডাদেশ দিলে পর যতীন্দ্র মোহন হাসলেন। এই হাসির কদর্থ করে লিখেছেন :

> এই হাসিটুকু হেসে তিনি যেন একটা খেই ধরিয়ে দিলেন। জাতীয়তাবাদী সমস্ত কাগজ ব্রিটিশ সরকারের এই বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখে এবার হাসিতে ফেটে পড়বে। এই মামলা থেকে শহীদ হওয়া গেলনা বটে, কিন্তু সরকার পক্ষের শাসকবর্গ যেমন হাস্যকর আচরণ করলেন তা নিয়ে হাসি মশ্‌করা করার বেশ এক একটা মওকা মিলে গেল।

এ ক্ষেত্রেও কোলিস এমনভাবে কথাটা বলেছেন যা থেকে মনে হতে পারে যে যতীন্দ্র মোহন শহীদ হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। এ তাঁর আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। বড় জোর বলা যায় যে জাতীয় কংগ্রেসের রেওয়াজ অনুসারে, সরকারের আত্মম্ভরী ও অযৌক্তিক নীতির পরিচায়ক একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকে তিনি লোকচক্ষুর প্রকট করতে চেয়েছিলেন।

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলে যতীন্দ্র মোহনকে নিয়ে যাবার সময় জনতা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিল। মেরিকেন বললেন দশদিনের কারাদণ্ড বড় যেন লঘুদণ্ড হয়ে গেল, কারণ তাঁর মতে যতীন্দ্র মোহন 'স্পর্ধিত বিপ্লবী' ভিন্ন আর কিছু নন। কোলিস বুঝেছিলেন তিনি যে রায় দিয়েছিলেন তা এক প্রকার শাসকবর্গের গালে চড় মারার মতো হয়েছিল।

পরের দিন সমস্ত কাগজ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। এলাহাবাদের 'লীডার' বলল 'ব্রহ্মদেশ মারাত্মক ভুল করেছে।' কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলল, খুব একটা খারাপ কিছু হতে পারে ভেবে সেনগুপ্ত প্রস্তুত হয়েই রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। এত শস্তায় তাঁকে শহীদ বানানো হবে—এ তিনি ভাবতে পারেননি। নেতৃবৃন্দ বললেন, 'এই প্রচণ্ড পরিহাসের ফলে আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল'। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে গান্ধীজী লিখলেন : 'সরকারের প্রতি বিরূপতা যদি ১২৪ 'ক' ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, তাহলে

আমাকে অভিযুক্ত করে বহু পূর্বেই গুরুদণ্ড দেওয়া উচিত হত, কারণ রাজদ্রোহ তো আমার ধর্মবিশেষ। কিন্তু সারা পৃথিবীর জনমতকে ব্রিটিশ সরকার সমীহ করে চলেন। আমাদের অহিংস বিপ্লবের নীতিতে কোনো খুঁত নেই, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

ভারত বিরোধী সুর গাইল 'ষ্টেটসম্যান', বলল 'লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যতীন্দ্র মোহন নিশ্চয় নিরাশ হয়েছেন। শহীদ হবার একটি প্রচেষ্টা অন্তত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল।'

দিল্লীতে লেজিসলেটিভ এসেম্বলির জনৈক সদস্য গ্রেফতারের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করে দেখবার জন্য দাবি জানালেন। অপর একজন সদস্য বললেন সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে যেভাবে মামলা দায়ের ও বিচার হল তার ফলে ব্রহ্মদেশ তথা ভারতের সরকার সারা পৃথিবীর কাছে নিজেদের উপহাসাস্পদ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি আর কিছু মন্তব্য করার আগে এসেম্বলি প্রেসিডেণ্টকে চিৎকার করতে হয়েছিল, 'অর্ডার, অর্ডার!'

কোলিস বুঝতে পেরেছিলেন আইনের বয়ানটুকু কেবল মানতে গিয়ে হয়তো বৃটেনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু অপরপক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ আইনের ন্যায়পরতা প্রমাণ করে ব্রিটিশ মর্যাদা উন্নীত করেছে! ইংলণ্ডের বহু ইংরেজ এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

যতীন্দ্র মোহনের কারাবাসের চতুর্থ দিনে কোলিস জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। য়ুরোপীয়ান ওঅর্ড-এ তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাঁর কামরার দরজায় পর্দা টাঙাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারাধ্যক্ষ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন :

মিষ্টার সেনগুপ্ত, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন আপনার সাক্ষাতে। যতীন্দ্র মোহন বেরিয়ে এলেন, হাতে তাঁর চার্লস ল্যাম্বের প্রবন্ধ সংগ্রহ। বারান্দায় ডেক চেয়ার পেতে তাঁরা বসলেন, কোথা থেকে একটা পোর্টেবল পাখাও এসে পড়ল। যতীন্দ্র মোহন বললেন তিনি বেশ আরামেই আছেন, কিন্তু তাঁর

কামরার উল্টো দিকে যে য়ুরেশিয়ান ছোকরাটিকে রাখা হয়েছে তাকে দেখে ওঁর খুব মায়া হয়। বেচারা পঞ্চাশ হাজার সিগারেট চুরি করার দায়ে কোলিসের কাছে ন'মাস সশ্রম কারাবাসের সাজা পেয়েছে। তাকে লাগানো হয়েছে খোসা ছাড়াবার কাজে। অনভ্যস্ত হাতে দিনের পর দিন খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তার দুই হাত রক্তাক্ত। কোলিস জেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসায় যতীন্দ্র মোহন মনে মনে স্থির করেছিলেন দেশে ফেরার আগে কোলিসের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন। আটদিন বাদে কারামুক্তির পর রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ শ্রী সেনের ভাই যতীন্দ্র মোহনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। রবিবার ছাড়া পেলেন, সোমবারেই ফাইচে স্কোয়ারের একটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল আগের বক্তৃতারই মতো, তবে এবারকার বক্তৃতায় তেমন যেন জলুস ছিল না। সেই দিনই সন্ধ্যায় কোলিসের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। শালটা খুলে রেখে বৈঠক খানায় যখন প্রবেশ করলেন, বক্তৃতায় গরম গরম কথা বলার তাপটা তখনো ঠিক জুড়োয়নি। এক গেলাস বার্লি জলে গলা ভিজিয়ে তিনি কোলিসকে বুঝিয়ে বললেন কী কারণে ফাইচে স্কোয়ারের বক্তৃতায় সেদিন বিকেলে তিনি কোলিসের বিচারের বিরুদ্ধে বলেছেন। কোলিস তাঁর বইয়ে যতীন্দ্র মোহনের বক্তব্যটুকু এইভাবে তুলে দিয়েছেন :

> বিচারে আপনি যেরকম রায় দিয়েছেন, আমাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। ওইরকম সিদ্ধান্তে আমাদের রাজনীতিক চাল ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব জনতার সামনে প্রতিবাদ আমায় করতেই হল। জানেন নিশ্চয় আর হপ্তাখানেকের মধ্যে গান্ধী তাঁর অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। আমরা সবাই তখন লবণ আইন ভেঙে হাজারে হাজারে কারাবরণ করব। বৃটেনের কাছ থেকে যে সুবিচার পাওয়া যাবেনা—সেকথা প্রমাণ করতে আমরা বদ্ধ পরিকর। সুতরাং এই মুহূর্তে ব্রিটিশ বিচারের গুণ আমি গাই কী করে ?

যতীন্দ্র মোহন কোলিসকে বলেছিলেন যে দেশে ফিরেই তাঁকে কারাবরণ

করতে হবে, সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছিলেন, যদিচ প্রকাশ্যভাবে কোলিসের ন্যায়বিচার বিষয়ে প্রশংসা তিনি করতে পারেননি, কোলিস বিচারের পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে উতরে গেছেন। বিদায় উপহার হিসাবে কোলিস তাঁকে সবুজ পাথরের একটি সিংহ দিয়েছিলেন, সিংহের পুচ্ছটা ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে। যতীন্দ্র মোহন সেটিকে তাঁর বুক-পকেটে রাখলেন, শালখানা তুলে নিলেন, তারপর উঠে পড়লেন গাড়িতে।

কলকাতায় ফেরবার কয়েক সপ্তাহ পরেই মহাত্মা গান্ধীর অন্য পঞ্চাশ হাজার অনুগামীর সঙ্গে আবার তিনি কারাবরণ করলেন। রেঙ্গুণ মামলার ন'মাস পরে ১৯৩১ সনের ১০ নভেম্বর তারিখে কোলিস লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পুনরায় যতীন্দ্র মোহনের সাক্ষাত পান। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তাঁর বইয়ে কোলিস লিখেছেন :

> এরপর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কনফারেন্স* সেরে উনি বোম্বাইয়ের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে গ্রেফতার করা হয়—সরকার তরফ থেকে সেটাই ছিল শেষ কংগ্রেসবিরোধী অভিযান। তখন তিনি পরিশ্রান্ত, তাঁর শরীরস্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়—বোম্বাই ঘটনার অল্প কিছু কালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শোনা যায় বর্মা সরকার কোলিসের হালচাল পছন্দ না করায় তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলেন আবগারী বিভাগে। বিচার বিভাগে কখনো তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়নি। পরের দিকে নেলী সেনগুপ্তর আমন্ত্রণক্রমে তাঁর কলকাতার বাড়িতে এসে ডিনার খেয়েছেন।

পূর্ব কথায় ফিরে যাওয়া যাক। ১৯৩০ সনের ৩০ মার্চ তারিখে রেঙ্গুণ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যতীন্দ্র মোহন কলকাতা পৌঁছলেন ৩ এপ্রিল তারিখে—তার তিনদিন পরে তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডিকুচ-এর শেষ ধাপে মহাত্মা গান্ধী ডাণ্ডি পৌঁছলেন। চারুচন্দ্র বিশ্বাস কলকাতা করপোরেশনে বাংলা সরকারের

* দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেন্স

মনোনীত সদস্য ছিলেন। এমনিতে তো মেয়রের কার্যকলাপ নিয়ে তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন, কিন্তু যতীন্দ্র মোহনের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি ব্যক্তি ও মেয়র হিসাবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ থেকে প্রমাণ হয় বিরুদ্ধ পক্ষের মানী ব্যক্তিরাও তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন। চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাঁর বক্তৃতায় বলেন :

আমি নিশ্চিত বলতে পারি আজকের দিনে আমরা সকলেই মনে মনে মিষ্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের কাছাকাছি আছি। একটি হাস্যকর বিচারের প্রহসনের পর, স্বল্পমেয়াদী কারাদণ্ডের শেষে, তিনি সদ্য মুক্তিলাভ করেছেন। বিচারের ব্যাপারে তিনি যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা সর্বাংশে তাঁর মত ব্যক্তির এবং তিনি যে সকল নীতিতে আস্থাবান সেইসব নীতির, উপযুক্ত। এই দৃঢ়তা ও নীতিনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি করপোরেশনের সকল সদস্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রত্যেকেই তাঁর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছেন। আবার যদি তিনি মেয়রের আসনে ফিরে আসেন তা সকলের পক্ষেই সন্তোষের কারণ হবে। লোকব্যবহারে তাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর বুদ্ধিকৌশল এবং সর্বোপরি মেয়রের পদে তাঁর পক্ষপাতহীনতা বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি একবার বলবার সুযোগ পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি দ্বিধাহীনভাবে সর্বসমক্ষে বলতে পারি যে আসনে সর্বপ্রথম মিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ বসে গেছেন, সেই আসনের মর্যাদা তিনি সর্বাংশে ও সগৌরবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

রেঙ্গুণে নিয়ে যাবার সময় আউট্রাম ঘাটে যত লোকের ভিড় হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বড়ো সমাবেশ দেখা গেল ৩ এপ্রিল তারিখে। বিপুল সংবর্ধনায় সারা কলকাতা যেন তাঁকে স্বাগত করল। হর্ষ ও প্রীতির এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যতীন্দ্র মোহনের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল—এ তো কেবল উচ্ছ্বাস নয় গভীর আবেগের অভিব্যক্তি। খোলা গাড়িতে যতীন্দ্র মোহনকে বসিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হল, পিছনে প্রায় এক মাইল লম্বা সার সার গাড়ি, রাস্তার

দুধারে লোকে লোকারণ্য। কেন্দ্রীয় ম্যুনিসিপাল দফতরের সামনে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল রাজকীয় সম্মানে, কর্মীদের তরফ থেকে স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করলেন চীফ্ এগ্জিকিউটিব অফিসার মিঃ জে. সি. মুখার্জি। যতীন্দ্র মোহন বিশেষ ক্লান্ত থাকায় মিঃ মুখার্জি তাঁর হয়ে কর্মীদের ধন্যবাদ জানালেন, করপোরেশনের বিভিন্ন দফতর ও স্কুলগুলিতে একদিনের বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হল। অতঃপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক-এ বিরাট সংবর্ধনা সভা হল। অন্য নেতাদের বক্তৃতার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের মতো একজন নিঃস্বার্থ নেতা পেয়ে বাংলাদেশ ধন্য, দেশে যদি তাঁর মতো আরো পাঁচজন মানুষ থাকে তাহলে সেদেশ স্বাধীন না হয়ে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ

কারাবাস ও পুনরায় মেয়র

লবণ সত্যাগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল ১২ মার্চ তারিখের ডাণ্ডি মার্চ দিয়ে। যতীন্দ্র মোহন যখন ব্রহ্মদেশে, সেই সময়েই আইন অমান্য আন্দোলনের গতিবেগ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আন্দোলনের অনুষঙ্গরূপে কলকাতার ছাত্রসমাজ স্থির করলেন রাজনীতিক কারণে বে-আইনী বলে ঘোষিত পুস্তকাদি প্রকাশ্যে পাঠ করা হবে। মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা সমুদ্রতীরবর্তী বলে স্থির হল সেখানকার কর্মীরা লবণ সত্যাগ্রহ করবেন। সরকারী শাসকবর্গ এই সমস্ত কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন।

কলকাতায় ফেরবার পর ছাত্রনেতারা তাঁর উপদেশ নির্দেশের জন্য এলে পর, তাঁদের আগ্রহাতিশয় দেখে আইন নিষিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ্যে পাঠ করার প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করেন। ১১ এপ্রিল তারিখে স্থির হয় আগাম বিজ্ঞপ্তিযোগে কার্যসূচীর খবর দিয়ে গোলদিঘি কলেজ স্কোয়ারে নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠের প্রথম অধিবেশন হবে। সভায় বেশ লোক সমাগম হল, লাঠিসোঁটা বন্দুক নিয়ে পুলিসও এসে পড়ল। সভার কাজ শুরু হবামাত্র বে-আইনা পুস্তক প্রচারের অপরাধে পাঠকেরা একে একে গ্রেফতার হলেন। সভাস্থ লোকেরা চঞ্চল হয়ে উঠল, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে গেল, বেশ কিছু লোক আহত হবার ফলে তাদের হাসপাতাল পাঠাতে হল। শেষ পর্যন্ত পুলিসের একটা বড়দল এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এই ঘটনার পর যতীন্দ্র মোহন ছাত্রসমাজকে বুঝিয়ে বললেন আইন অমান্য আন্দোলনের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায়ের উপর। ধৈর্যশীল হয়ে তাঁরা যদি এই উপায় অবলম্বন না করতে পারেন তাহলে ব্যর্থতা অনিবার্য। ছাত্রনেতারা প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁরা কোনো ক্রমেই শান্তি ভঙ্গ করবেন না। স্থির হল কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে হেদুয়ায় তাঁদের পরবর্তী বৈঠক বসবে। যতীন্দ্র মোহনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা বার বার তাঁকে

বললেন বে-আইনী পুস্তক সর্বসমক্ষে পাঠ করার অপরাধে তিনি যেন কারাবরণ করতে না যান। সর্বভারতীয় নেতারূপে বাংলার আইন অমান্য আন্দোলনে তিনিই পুরোধা, এখন যদি অকিঞ্চিৎকর অপরাধে, তিনি স্বয়ং জেলে যান তাহলে বাংলার আন্দোলন অন্য প্রদেশের আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। তাছাড়া, মহাত্মা গান্ধী তো সর্ব ক্ষেত্রে আইন অমান্য করার কথা বলেননি, বলেছেন কেবল লবণ আইন ভাঙতে। হিতাকাঙ্খীরা তাই অনুরোধ করলেন যেন মহাত্মা গান্ধীর অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অন্য ক্ষেত্রে আন্দোলন করতে তিনি না যান। যতীন্দ্র মোহন তাঁদের বক্তব্য বিশেষ মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু ছাত্রসমাজকে তিনি যে আন্দোলন চালাবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তা থেকে নিজে সরে থাকেন কী করে ?

এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে হেদুয়ায় বিরাট সমাবেশ। নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ আরম্ভ হতেই পর পর অনেকে গ্রেফতার হল। যতীন্দ্র মোহনের কাছে খবর পৌঁছল ছাত্রেরা সম্পুর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সভার কাজ পরিচালনা করা সত্বেও, বেশ কয়েকজনকে পুলিস ধরপাকড় করেছে। এই শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, বন্ধুদের নিষেধ সত্বেও তিনি হেদুয়া অভিমুখে রওনা হলেন। সভাস্থলে পেঁাছতেই সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'যতীন্দ্র মোহন কী জয়।' সারা ভারতের অন্যতম প্রথম সারির নেতা, ছাত্রদের কথায় তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন দেখে তাদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হল। কোনো কোনো লোক তাঁর 'হঠকারিতার' বিরূপ সমালোচনা করেছিল। তবে বেশির ভাগ লোকই বলেছিল ছাত্রদের তিনি জবান দিয়েছিলেন বলে কথার নড়চড় করেননি। এথেকে বুঝা যায় যে তিনি মানী লোক হয়েও ছাত্রসমাজের পাশে এসে দাঁড়াতে ইতস্তত করেননি।

যতীন্দ্র মোহন সভাস্থলে আসতেই পুলিস তাঁর আশেপাশে যত সাঙ্গপাঙ্গ ছিল সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল। সভাস্থলের মাঝখানে পোঁতা ছিল পতাকাস্তম্ভ—যতীন্দ্র মোহন এসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। পুলিস তাঁকে তখন কোনো

বাধা দেয়নি। কিন্তু সভার কাজ শুরু হতেই পুলিসের ডেপুটি কমিশনার যতীন্দ্র মোহনের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে আগের দিন যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নামের একটি তালিকা তুলে দিল।

যতীন্দ্র মোহন তো ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না, গ্রেফতারের তালিকা এক নজর দেখে তিনি একখানি নিষিদ্ধ পুস্তক The Call of the Country (স্বদেশের আহ্বান) তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পুলিস তাঁর হাত থেকে বইখানা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে বিফল হল। তখন পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে একটি চেয়ারে বসতে বলে। ততক্ষণে বই ফিরছে ছাত্রনেতাদের ও অন্য নাগরিকদের হাতে হাতে। তাঁরাও পড়তে গিয়ে একে একে গ্রেফতার হলেন। অত:পর যতীন্দ্র মোহন বললেন যে সেদিনকার মতো সভার কাজ শেষ। সভায় হৈ চৈ মারামারি হয়নি, শান্তিপূর্ণভাবে সব কিছু হয়েছে। কিন্তু তাহলে কি হয়, পুলিসের কালো গাড়ি যতীন্দ্র মোহন ও চারজন ছাত্রনেতাকে তুলে নিয়ে সোজা চলল জেলখানার দিকে।

এই জেলে থাকা কালে, ১৯৩০ সনের ২৯ এপ্রিল তারিখে যতীন্দ্র মোহন পঞ্চম বারের জন্য কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। নির্বাচনীসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। যতীন্দ্র মোহনের নাম প্রস্তাব করেন বিধানচন্দ্র রায় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই নির্বাচিত হন।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেয়র হিসাবে যতীন্দ্র মোহন শপথ গ্রহণ করতে পারেননি কারণ তখনো তিনি কারাগারে। সুতরাং মেয়রের আসন আবার শূন্য বলে ঘোষিত হয় এবং নূতন নির্বাচনের তোড়জোড় চলতে থাকে। জেল থেকে যতীন্দ্র মোহন তাঁর স্ত্রীকে লিখে জানান পুনর্বার মেয়র পদের প্রার্থী হতে তিনি চান না। সুভাষ চন্দ্র বসু সেবার মেয়র নির্বাচিত হলেন।

দশম পরিচ্ছেদ
জেলের ভিতরে ও বাইরে

১৯৩০ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্র মোহন কারামুক্ত হলেন। তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে পুরোদমে। কংগ্রেসের বহু সংস্থা সরকার বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছেন। এইসব সংস্থার মধ্যে অখিল ভারত কংগ্রেসের কর্মসমিতির নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই জন্য স্থির হয়েছিল কংগ্রেসের সমস্ত ক্ষমতা কোনো একজন শক্তিশালী নেতার হাতে ন্যস্ত থাকবে। তিনি গ্রেফতার হলেই তাঁর শূন্যস্থান নেবেন অপর কোনো নেতা। জওহরলাল নেহেরুকে গ্রেফতার করার পর প্রশ্ন হয় কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। মতিলাল নেহরু বেছে নিলেন যতীন্দ্র মোহনকে—ফলে তিনি মনোনীত হলেন সাময়িকভাবে কংগ্রেসের সভাপতি রূপে।

কারামুক্তির পর তিনি বিশ্রাম নেবার মতো অবকাশ পাননি, কারণ একপ্রকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভারতের সর্বত্র সফরে বেরিয়ে পড়তে হয়। পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী হয়ে তিনি অমৃতসর পৌঁছলেন ২৫ অক্টোবর তারিখে। সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা—যতীন্দ্র মোহন বক্তৃতা দিতে উঠেছেন এমন সময় পুলিস তাঁর হাতে একটি নোটিস দিতে এল। পুলিসকে তিনি বললেন জনসভার কাছে তাঁর যা বক্তব্য তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নোটিস তিনি গ্রহণ করবেন না। যতীন্দ্র মোহন বক্তৃতা দিতে লাগলেন। পুলিসের অফিসরও সঙ্গে সঙ্গে নোটিস পড়ে গেলেন। নোটিস পড়া শেষ করে অফিসর দিল্লী কর্তৃপক্ষের ওয়ারেন্ট অনুসারে যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেফতার করলেন, তাঁর অপরাধ ১৪৪ ধারা মতে জালিয়ানওয়ালা বাগে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করা বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তিনি তা লঙ্ঘন করেছেন। পুলিস তাঁকে দিল্লী নিয়ে গেল। দিল্লীর বিচারে তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। অতঃপর দিল্লীর কুইন্‌স্ গার্ডেনে নেলী সেনগুপ্ত ও অরুনা আসফ আলি প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দিলেন এবং

রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দেবার অপরাধে গ্রেফতার হলেন। নেলীর সেই প্রথম জেল যাত্রা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর দিল্লীর বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

আজকের এই সভায় যত ছোট ছেলে মেয়ে উপস্থিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে আমি একটি কথা বলতে চাই : এই পতাকাকে তারা যেন নিজেদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করে, যেন কিছুতেই এই পতাকাকে তারা লাঞ্ছিত হতে না দেয়, যখনি হোক যেখানেই হোক এই পতাকার সামনে যদি তারা দাঁড়ায় তাদের মাথা যেন আপনা থেকে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নত হয়। আজ আমি তাদের সকলের সামনে এই জাতীয় পতাকা তুলে ধরছি। পতাকা তুলে ধরতে গিয়ে আমার বুকে যেমন আনন্দের গৌরবের লহর খেলছে, তাদের ছোট ছোট বুকেও নিশ্চয় সেই রকম আনন্দ শিহরণ জেগে উঠছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পতাকার প্রতি আমাদের আনুগত্য যদি গভীর হয়, সদা সর্বদা সর্ব অবস্থায় আমাদের এই ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরে রাখবার জন্য আমরা যদি বদ্ধপরিকর হই—তাহলে ভারতের এই মহাজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী।

পর পর এই তিনটি গ্রেফতারের সংবাদে দেশে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অমৃতসর ম্যুনিসিপালিটি সরকারের কাজের তীব্র নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

যতীন্দ্র মোহনের গ্রেফতার হবার খবর পেয়ে কলকাতা করপোরেশনের ভারতীয় সদস্যেরা স্থির করেন গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ২৯ অক্টোবর তারিখে করপোরেশনের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য তাঁরা প্রস্তাব দেবেন। জনৈক য়ুরোপীয় সদস্যর আপত্তি সত্ত্বেও প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ২৯ অক্টোবরের পুরো দিন করপোরেশন বন্ধ থাকে ও সারা কলকাতা সহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :

যেমনটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। কংগ্রেসের সাময়িক প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে দিল্লীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ড দিয়েছেন। রাজদ্রোহ ছাড়াও তিনি ক্রিমিনাল ল' এমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্টের একটি ধারা ও প্ররোচনা সম্পর্কিত অর্ডিনেন্সের একটি ধারা লঙ্ঘন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় অনুসারে রাজদ্রোহের জন্য এক বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অপর দুই অভিযোগের প্রত্যেকটির জন্য ছয়মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হয়েছে—এই তিনদফা কারাদণ্ড যুগপৎ চালু থাকবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাময়িক প্রেসিডেণ্ট বৎসর কালের জন্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকবেন এবং দীর্ঘ বারো মাসের জন্য তাঁর মতো প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ নির্দেশ থেকে দেশ বঞ্চিত থাকবে। মাত্র সেদিন বাংলা দেশের এই বীর ও আত্মোৎসর্গ-পরায়ণ সন্তান জেল থেকে বেরিয়েছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যে-ধাতু দিয়ে গড়া তাতে তিনি নিশ্চয় পুনরায় কারাবাসে যাবার নিমিত্ত ম্রিয়মাণ হবার পাত্র নন কিন্তু দেশ এই ব্যাপারে দুঃখ বোধ না করে পারেনা—বিশেষত এই কারণে যে কিছুকাল থেকেই তাঁর শরীরস্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না।

যতীন্দ্র মোহন ও নেলীকে দিল্লীর একই জেলে রাখা হয়। সংক্রামক রোগের একটি ওয়র্ড তখন খালি থাকায় তাঁদের দু'জনকে সেইখানেই রাখা হয়। নেলী এই ওয়র্ডকে তাঁর ঘরবাড়ি করে নিয়েছিলেন। বাড়ির লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁদের দেখা সাক্ষাত করতে আসত। তাঁদের একজনের কাছ থেকে নেলী একটি কুকুরের বাচ্চা সংগ্রহ করেছিলেন। বাচ্চা কুকুরের হেফাজতি ও তার খেলাধুলায় জেলজীবনের একঘেয়েমি কিছু পরিমাণে লাঘব হত। নেলী কিছুতেই দমে যাবার পাত্রী ছিলেন না, স্বভাবতই তিনি হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। জেলে থাকতে তিনি ম্যাণ্ডোলিন বাজনা শিখতে শুরু করেন। জেল থেকে বেরুবার পর,

পূর্বপরিচিত একজনের সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার নেলীর সাক্ষাত। ইনি নেলীর জেলে যাবার বিষয়ে কিছু জানতেন না, তাই সচরাচর যেমন হয় তেমনিভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

কতদিন দেখা নেই। কোথায় ছিলেন এত দিন ?

নেলী হেসে জবাব দিয়েছিলেন :

ওহো তাও জানেন না বুঝি ? কিছুদিন জেলে কাটিয়ে এলাম। সেখানেই তো ম্যাণ্ডোলিন বাজানো একটু একটু শিখেছি।

একাদশ পরিচ্ছেদ
গান্ধী আরউইন চুক্তি

অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা যখন কারাগারে, দু'জন মডারেট রাজনীতিক একটা মীমাংসার চেষ্টা করেন—এঁরা হলেন স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও এম. আর. জয়াকর। প্রথমে লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা যার্বাদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। নৈনী জেলে মতিলাল নেহেরু ও জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও এঁরা যোগাযোগ করেন এবং যার্বাদা জেলে তাঁদের স্থানান্তর করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালান। জেলে মতিলাল নেহেরুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে জওহরলাল ও রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিতকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

লর্ড আরউইন কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত হয়ে মহাত্মা গান্ধীকেও জেল থেকে মুক্তি দেন ও দিল্লীতে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। বিশদ আলোচনার ফলে তাঁদের দুজনার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সে বিষয়ে একটি ঘোষণাও প্রকাশ করা হয়। অত:পর অখিল ভারত কংগ্রেস কর্মসমিতির সদস্যদেরও কারামুক্ত করা হয়। দেশে শান্তি ফিরে আসে এবং স্থির হয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে মহাত্মা দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেবেন।

যতীন্দ্র মোহন ও নেলীকেও ছেড়ে দেওয়া হয় ১৯৩১ সনের ২৭ জানুয়ারি তারিখে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে তাঁরা একত্র কলকাতায় ফিরে আসেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে পর তাঁরা বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। তাঁদের গলায় একটার পর একটা মালা পরানো হয় তারপর হাওড়া ষ্টেশন থেকে মোটর ও ঘোড়াগাড়ির বিরাট শোভাযাত্রা কলকাতার দিকে যাত্রা করে। হাজার হাজার লোক পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিবাদন করল, কেউ পরালো চন্দনের তিলক, কেউ ছিটালো গোলাপ জল, কেউবা হাতে তুলে দিল ফুলের তোড়া।

কলকাতা থেকে যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর স্ত্রী সোজা চলে গেলেন চট্টগ্রাম। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছেন, চট্টগ্রামের লোকেরা সবাই শ্রদ্ধায় প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত। স্টেশন থেকে বাড়ি অবধি সমস্ত পথটার দু'ধারে বহু লোকের ভিড়, চলার পথে রচিত হয়েছে পাঁচটি সুদৃশ্য তোরণ।

গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে কেবল কংগ্রেসী বন্দীরাই মুক্তি পেয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবে জড়িত বন্দীরা তখনো কারাগারে। বিপ্লবীরা এই চুক্তি ভালো চোখে দেখেননি এবং চুক্তির ফলে কারামুক্ত কংগ্রেসীদের নিয়ে এত হৈ চৈ আড়ম্বর তাঁদের মনঃপূত ছিলনা। যতীন্দ্র মোহন ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ শিষ্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংসপদ্ধতিতে তিনি ছিলেন গভীরভাবে আস্থাবান। বিপ্লবীদের দেশপ্রেম বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃঢ় ধারণা এই ছিল যে উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক উপায়ে স্বরাজ আসতে পারে না। বাংলার বিপ্লববাদীরা তাই কঠোরভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। কংগ্রেসীরা জেল থেকে ছাড়া পেল বিপ্লবীরা পেল না—এ কারণে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও বিপ্লবীরা বিরূপ ছিল। তাদের অনেকে বলল গান্ধী নিজের দলের লোকদের সুবিধার জন্য চুক্তি করলেন, দেশের জন্য বুকের রক্ত দিতে যারা প্রস্তুত সেইসব দেশভক্তরা অহিংসাপন্থী নয় বলে তিনি তাদের দিকে একবারও তাকালেন না। চট্টগ্রাম ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের ঘাঁটি সুতরাং চট্টগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল প্রবল। এ বিতৃষ্ণা প্রবলতর হতে পারত যদি যতীন্দ্র মোহনের মতো একজন গান্ধীভক্ত বিপ্লবীদের আতিশয্য সাধ্যানুসারে সংযত না করতেন। চট্টগ্রামের উপর যতীন্দ্র মোহনের প্রভাব তো কিছু কম ছিল না। সবাই যখন চট্টগ্রাম ষ্টেশনে যতীন্দ্র মোহনকে স্বাগত করছে, কে যেন তাঁর হাতে একটি কালো পতাকা তুলে দিল। অল্পবয়সী ছেলে, খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে একজন কট্টর বিপ্লববাদী এবং তার নাম মধুসূদন। শান্ত সৌজন্যে মধুসূদনের হাত থেকে যতীন্দ্র মোহন কালো পতাকাটি গ্রহণ করলেন—যেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন ফুলের তোড়া। মধুসূদন তাঁর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে একবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা মনে রাখা দরকার। সশস্ত্র বিপ্লবের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর চট্টগ্রামে যে নির্যাতনের বিভীষিকা চলেছিল, মধুসূদন কিংবা তার আত্মীয়স্বজনেরা হয়ত হয়েছিল সেই প্রচণ্ড প্রতিহিংসার শিকার। আদালতে বিচার তখনো চলেছে, আর আদালতের বাইরে চলেছে নির্বিচার নির্যাতন। যতীন্দ্র মোহন মধুসূদনের সঙ্গে দু'কথা বলতে যাবেন, এমন সময় অনুগামীদের কেউ কেউ কালো পতাকা হাতে দেবার ঘটনা দেখে, মধুসূদনকে টেনে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে গেল, দু'চার ঘা বসিয়ে দিল। যতীন্দ্র মোহন নেমে গিয়ে তাকে রক্ষা না করলে সে হয়তো আরো মার খেত। মধুসূদন গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যেতে যেতে বলে গেল যারা তাকে মারধোর করেছে তাদের সে দেখে নেবে। যতীন্দ্র মোহন খুব ব্যথিত বোধ করলেন, অনুগামীদের বললেন মধূসূদনকে মারধোর করা খুব অন্যায় হয়েছে, তিনি চাননা যে তাঁর অনুগামীরা সন্ত্রাসবাদীদের মতো হিংসার আশ্রয় নেয়। নিজে তো তিনি ছেলেটির উপর রাগ করেননি। ছেলেটিকে কেউ ভুলপথে চালনা করেছে। তা নিয়ে তো খাপ্পা হলে চলবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার আছে অন্যদের মতামতের সঙ্গে নিজেরটা না মিললেও। ছেলেটি তো সাহস করে কালো পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যতীন্দ্র মোহনের মতামত সে মানে না। সম্ভবপর যদি হত, বাধা যদি না আসত তাহলে তিনি তার সঙ্গে দু'কথা আলোচনা করতে পারতেন, তাকে নিজের মতে টানবার চেষ্টা করতে পারতেন। তিনি বারবার বললেন মধুসূদনের সঙ্গে আবার যদি তাঁর দেখা হয় তিনি খুশি হবেন। ইতিমধ্যে বেশ ভিড় জমতে শুরু করেছে বলে শোভাযাত্রা শুরু করে দেওয়া হল। শোভাযাত্রা থামল গিয়ে সিনেমা হল-এ, সেখানেও মস্ত লোকের ভিড়। যতীন্দ্র মোহন বক্তৃতা দিতে গিয়ে হিন্দু সমাজের প্রকৃত গলদ কী ও কোথায় সেই বিষয়ে বললেন, সামাজিক জীবনের দোষ ত্রুটি ও অন্যায় যে নৈতিক এমনকি রাজনৈতিক জীবনকেও দুর্বল ও বিপর্যস্ত করতে পারে তার উদাহরণস্বরূপ বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের সমস্যার কথা বললেন

এবং মহাত্মা গান্ধী কেন যে জাতিভেদ ও স্পার্শদোষের বিষয়ে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেই কথাটাও বিশদ করলেন। এমন সময় বাইরে থেকে একটা হট্টগোলের আওয়াজ এল : মধুসূদন মিথ্যা ভয় দেখায়নি, যে ছেলেটি তাকে ষ্টেশনে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল, দু'চার ঘা চড়-চাপড় লাগিয়েছিল তাকে সে সত্যই দেখে নিয়েছে—লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে মধুসূদন পালিয়েছে। যতীন্দ্র মোহনের কথায় স্বেচ্ছাসেবকেরা আহত ছেলেটিকে মঞ্চে এনে হাজির করল, তার কপাল বয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছে। যতীন্দ্র মোহন দুঃখ করে বললেন যে তাঁর চট্টগ্রামের দেশব্রতীরা আজ দুটো দলে বিভক্ত—অথচ দেশভক্তির গভীরতায় কেউ কারো কম নয়। তফাত এখানে যে একদল মনে করে যে সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আসবে, অন্য দলের ধারণা যে নিরস্ত্র ভারতে সেরকম বিপ্লব সম্ভবপর তো নয়ই বরঞ্চ হিংসাপ্রতিহিংসার পথে যতটুকু লাভ হবে ততটুকুই ক্ষতি। উপরন্তু বললেন আরউইনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের সময় মহাত্মা গান্ধী কেবল যে কংগ্রেসীদের কারামুক্তি চেয়েছিলেন এমন নয়, তিনি সাধারণভাবে সকল রাজনীতিক বন্দীর মুক্তিই দাবী করেছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলবতী হয়নি, সে তাঁর দোষ নয়। আখেরে সকলেই মুক্তি পাবে নিশ্চয়, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামে ইংরেজকে পরাজিত করে দেশ স্বাধীন করা যাবে—এমন আশা সুদূরপরাহত। অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে ইংরেজের শক্তি অনেক বেশি, বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্র বিদ্রোহ যদি লেগেও যায় তা দমন করতে ইংরেজকে বেগ পেতে হবেনা। কিন্তু ইংরেজকে পরাজিত করার একটি অমোঘ অস্ত্র আছে—সে হল অহিংস প্রতিরোধ, এর পাল্টা অস্ত্র ইংরেজের অস্ত্রাগারে নেই।

তাঁর এই বক্তৃতার পর সহরের একাধিক সংস্থা তাঁর সম্মানে অভিভাষণ দেয়। মৌলভী আবদুল খালেক চৌধুরী তাঁর হাতে পাঁচ হাজার টাকার একটি তোড়া তুলে দেন। উত্তরবঙ্গের বন্যার্ত ত্রাণের জন্য যতীন্দ্র মোহন সে টাকা গ্রহণ করেন।

১৯৩১ সনে করাচিতে যে কংগ্রেস অধিবেশন হল সেখানে অনেকে প্রস্তাব

করলেন যতীন্দ্র মোহনকে যেন পরবর্তী অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা হয়, কিন্তু তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অনুকূলে নিজের নাম প্রত্যাহার করায় সর্দারই নির্বাচিত হন। এক দল সদস্য গান্ধী আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মতে চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যা থেকে মনে হতে পারে ভারতের স্বাধীনতা যেন সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের ইচ্ছাধীন। চুক্তির সমর্থনে জওহরলাল নেহরু প্রস্তাব পেশ করলে পর যমুনাদাস মেটা তার বিরোধিতা করলেন। জওহরলালের প্রস্তাবের সমর্থনে যতীন্দ্র মোহন ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা শুনে বহু সদস্য সাধুবাদে মুখর হয়েছিলেন। যতীন্দ্র মোহন বললেন কংগ্রেস সারা দেশের প্রতিনিধি সংস্থা, বিদেশী শাসকের কবল থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্খা দেশময় প্রবল হয়েছে, এই আকাঙ্খার বলে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস পরাধীনতার পাশ মোচন করবে। ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধী পক্ষ সকল সম্পর্ক ছেদন করার যে দাবী করেছিল তার সমালোচনা করে তিনি বললেন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশ আজ এমনি শক্তিমান যে আজ হোক কাল হোক বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ অনিবার্য। কেউ মাথার দিব্য দিয়ে বলতে পারেনা যে কংগ্রেসকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে হবেই, কিন্তু অপর পক্ষে চুক্তির শর্ত অনুসারে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রত্যেক বন্দীকে কর্তৃপক্ষ কারামুক্ত করতে বাধ্য, তা না হলে কথার খেলাপ হবে। যতীন্দ্র মোহন বলে চললেন :

> মনে রাখবেন প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতের ব্রিটিশ সরকার আজ যে ভারতের প্রতিভূ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একাসনে বসে সমানে সমানে বোঝাপড়া করার চেষ্টায় নেবেছেন, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। ক্ষীণদেহ এই দুর্বল মানুষটির পিছনে যে সমস্ত জাতির শক্তি একত্র সংহত হয়ে আছে ইতিপূর্বে বলদর্পী ইংরেজ তো সে কথা স্বীকার করেনি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে সমস্ত জাতির যে শক্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়েই মহাত্মা গান্ধী নেবেছিলেন

ব্রিটিশের সঙ্গে বোঝাপড়ায়। আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা মহান ও সম্মানিত মানুষ যিনি সেই মহাত্মার অনুগামী কংগ্রেস-সেবকরূপে আমাদের কাছে আজ একটি পথই খোলা এবং সে পথ হল এই চুক্তি মেনে নেওয়া এবং এর শর্ত পালন করা। কথা দিয়ে কথা রাখা যেমন ব্যক্তির ধর্ম, তেমনি জাতিরও। সত্য ও ন্যায়ের তৌলদণ্ডের বিচারে আমরা যেন লঘু প্রমাণিত না হই।

যতীন্দ্র মোহনের এই বক্তৃতার পর বিরোধীপক্ষ আর মুখ খুলতে পারেনি।

করাচি কংগ্রেসের কিছুদিন পরেই কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার জন্য ১৯৩১ সনের মে মাসে যতীন্দ্র মোহন সেই দেশে যান। সুদূর দক্ষিণ থেকে এই যে আমন্ত্রণ এল, এ থেকে বুঝতে পারি তখন ভারতের সর্বত্র তিনি জনপ্রিয় ও সুপরিচিত। কেরল-এ উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাবার পর তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

এক মহান দেশভক্ত একবার বলেছিলেন দেশসেবকের পরম পুরস্কার হল দেশের কাজে দেশের লোকের অনুমোদন লাভ ও তাঁদের আস্থা অর্জন।

উপস্থিত সকলকে যতীন্দ্র মোহন মনে করিয়ে দিলেন যে জনগণের আস্থা ও সমর্থন লাভ করেছিলেন বলেই, গত বারো মাস ধরে নানা দুঃখের মধ্যে দিয়ে দেশকে তিনি এক বিরাট সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মহাত্মা গান্ধীর জীবন কথা পড়েছেন। যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তিনি আজ অবিসম্বাদী নেতা, তার ইতিহাসও হয়তো আপনাদের অজানা নেই। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন ডাণ্ডি মার্চের কথা শুনে যাঁর বুকে স্পন্দন জাগেনা? পৃথিবীর দৃষ্টিতে যেভাবে কংগ্রেসের মর্যাদা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন সেকথা চিন্তা করে যাঁর হৃদয় পুলকিত হয়ে ওঠেনা?

তিনি আরো বললেন জনগণের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন বলেই আজ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আলোচনায় বসাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। লর্ড আরউইন স্থির বুঝেছেন অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মতো শক্তি ভারতীয়েরা অর্জন করেছে এবং আইন, অর্ডিন্যান্স ও সরকারী ঘোষণার সাহায্যে ভারতকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দাবিয়ে রাখা আর চলবেনা। বক্তৃতার শেষে যতীন্দ্র মোহন বললেন :

> দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় কিংবা বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে, ভারত তার নিজস্ব অধিকার প্রয়োগ করার মতো রাজনীতিক প্রতিষ্ঠা না পাওয়া পর্যন্ত দেশ সন্তুষ্ট হবেনা, কংগ্রেসও সন্তুষ্ট হবেনা। রাষ্ট্রিক দিক থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত আমরা আপস মীমাংসার কথা চিন্তাও করতে পারিনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
তিন সঙ্কট

১৯৩১ সনের মাঝামাঝি বাংলার গবর্নর যতীন্দ্র মোহনকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। বাংলায় শান্তি শৃঙ্খলা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, যেসব বিপ্লবী দল রাজনীতিক কারণে খুনোখুনিতে লিপ্ত তাদের কীভাবে প্রশমিত করা যায়— গবর্ণর তাঁর সঙ্গে এইসব প্রশ্ন আলোচনা করতে চান। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কীভাবে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় গবর্ণর নাকি তার উপায় সন্ধান করতে চান। যতীন্দ্র মোহন এ কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করতে রাজি হলেন। বক্সার ও হিজলি শিবিরে অন্তরীণ বিপ্লববাদী বন্দীদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করলেন। দার্জিলিং ফিরে এসে গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন এমন সময় খবর এল চাঁদপুরের সন্ত্রাসবাদীরা পুলিস ইন্স্পেকটর তারিনী মুখার্জিকে হত্যা করেছে। গবর্ণর তাঁকে বলে দিলেন এরকম হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। যতীন্দ্র মোহন এই ঘটনার বিষয় কিছুই জানতেন না। গবর্ণরের অনমনীয় মনোভাব দেখে তিনি বুঝতে পারলেন এরকম অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় কোনো ফল হবেনা।

এই সময়ে বাংলায় পর পর তিনটি সঙ্কট দেখা দেয়। এগুলির ফল হয় সুদূর প্রসারী এবং দেশের পক্ষে প্রভূত দুর্দশার কারণ। এই সংকটত্রয়ের প্রথমটি ছিল উত্তরবঙ্গে বিধ্বংসী বন্যা, দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামে হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে পূর্বপরিকল্পিত লুঠতরাজ এবং তৃতীয়টি হিজলি শিবিরে গুলি বর্ষণের ফলে দু'জন রাজবন্দীর মৃত্যু। এই তিনটি ঘটনা যতীন্দ্র মোহনের রাজনীতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত হয়ে যায়।

বন্যা শুরু হয় ১৯৩১ সনের আগষ্ট মাসে, জলপাইগুড়ি, পাবনা, বগুড়া ও রাজসাহী জেলায় প্রচুর বারিবর্ষণের ফলে। এই চারটি জেলা বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতি ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে

সম্পাদক করে একটি সংকটত্রাণ সমিতি গঠন করা হয়। বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস ও রামকৃষ্ণ মিশনও দুর্গতদের সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসেন। চার জেলা থেকেই লোকেরা এসে যতীন্দ্র মোহনকে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল সরেজমিনে দেখে আসার কথা বলতে লাগল। বন্যায় কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে এদের বর্ণনা শুনে যতীন্দ্র মোহন আর স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ক্ষিতীশ গাঙ্গুলীকে নিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে গেলেন জলপথে। যে ষ্টিমারে করে তিনি গেলেন, তার সারেঙ, খালাসী সকলেই চট্টগ্রামের মুসলমান। যতীন্দ্র মোহনের মতো একজন মহানেতা তাদের ষ্টিমারের যাত্রী হয়ে চলেছেন জানতে পেরে এদের আনন্দ ও গর্বের অবধি ছিল না। উত্তরবঙ্গে যেখানেই গেলেন হাজারো লোক জাহাজঘাটে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করত। লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'গান্ধী-মহারাজার বড়লাট'। চারিদিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির এই স্বতঃস্ফূর্ত অজস্রতা দেখে যতীন্দ্র মোহন জেনেছিলেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেশের লোক মাত্রই তাঁকে ভালবাসে। অনেক সময় দূর দূরান্তর অঞ্চল থেকে ছোট ছোট নৌকা করে লোকেরা এসেছে। নৌকাগুলি এমনভাবে ঘিরে দাঁড়াত যে ষ্টিমার অনেক সময় নড়তে চড়তে পারতনা। চারিদিকের দুঃখদুর্দশা দেখে যতীন্দ্র মোহন প্রাণে বড় ব্যথা পেলেন। সামান্য সঙ্গতি নিয়ে কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য জনহিতকর সংস্থা কতটুকুই বা করতে পারেন। সরকারকে বলেও কোনো সুবিধা হলনা, কারণ সরকার আগেভাগে ঘোষণা করে বসে আছেন যে বন্যার ফলে এমন কিছু ক্ষতি হয়নি।

পোরজানা পৌঁছে যতীন্দ্র মোহন কলকাতা থেকে পাঠানো কিছু চিঠি ও তারবার্তা হাতে পেলেন। একটি টেলিগ্রামের খবর ছিল যে আহসানুল্লা নামে একজন মুসলমান পুলিস ইন্সপেকটার খুন হবার ফলে চট্টগ্রামে লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের লোক এই অবস্থা দেখে তাদের নেতাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল তিনি যেন কালবিলম্ব না করে নিজের জেলায় ফিরে আসেন। যতীন্দ্র মোহন দোটানায় পড়লেন—বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ ও

দাঙ্গাবিধ্বস্ত চট্টগ্রাম—এদের কাকে ফেলে কাকে সামলাবেন। এ যেন এক প্রকার উভয় সঙ্কট। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন গোড়ায় চট্টগ্রাম ঘুরে এসে উত্তরবঙ্গে আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু একটানা ঝড়বৃষ্টি চলেছে, উপশমের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা, এই আবহাওয়ায় ষ্টিমার চলাচল অসম্ভব। কাছাকাছি যারা ছিল সকলেই বলল ঝড় থামা অবধি যাত্রা স্থগিত রাখা উচিত, কিন্তু চট্টগ্রামের জন্য তখন তাঁর মন উচাটন তাঁর আর সবুর সইছেনা। অগত্যা তাঁর জন্য একটি মোটর লঞ্চ-এর ব্যবস্থা করা হল। উত্তরবঙ্গে যাবার পথে যেমন ভিড় দেখেছিলেন ফিরতি পথেও তেমনি দর্শনার্থীদের ভিড়—ঘাটে ঘাটে নৌকায় লোক, নদীর দু'ধারেই লোক এসেছে তাঁকে দেখতে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর জয় জয় ধ্বনি উঠছে আর তাঁকে ডেক-এ উঠে হাত জোড় করে প্রত্যভিবাদন করতে হচ্ছে। দুর্বল শরীরে ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন বলে ওঠানামা বন্ধ করে তিনি ডেকের উপর একটি চেয়ারে বসে রইলেন ছাতা মাথায় দিয়ে। হাত নাড়িয়ে ছাতা নাড়িয়ে তাঁর প্রতি-নমস্কার চলতে লাগল। কলকাতায় ফিরে দেখলেন মহিমচন্দ্র দাস সদ্য চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন, চট্টগ্রাম দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিতে।

চট্টগ্রামে দাঙ্গা যখন শুরু হয় ডিভিশনাল কমিশনার নেল্‌সন তখন সহরের বাইরে সফরে গেছেন। ফিরে এসে সহরের ভগ্নদশা দেখে যত না তার দুঃখ হল তার চেয়ে অনেক বেশি হল রাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিস ও গুর্খা পল্টনদের সহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে বললেন। লুঠতরাজ বন্ধ হল কিন্তু হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো চেষ্টা হলনা। স্থানীয় খবর কাগজগুলিকে বলে দেওয়া হল দাঙ্গা বিষয়ে ফলাও খবর যেন না ছাপা হয়, কলকাতায় খবর পাঠানোও বারণ করে দেওয়া হল।

এই অবস্থায় মহিমচন্দ্র দাস কলকাতায় এলেন যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁর সাহায্য চাইতে। সেই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন জনসভা ও খবর কাগজ মারফত কলকাতার লোক জানুক চট্টগ্রামের প্রকৃত অবস্থা কী। উত্তরবঙ্গ

থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের বাড়িতে মহিমচন্দ্র দেখা করলেন ও তাঁকে সব কথা জানালেন। পরদিন এলবার্ট হল্-এ জনসভা ডাকা হল ; যতীন্দ্র মোহনের সভাপতিত্বে মহিমচন্দ্র দাঙ্গাবিধ্বস্ত চট্টগ্রামের একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরলেন ও দাঙ্গাকারীদের হাতে হিন্দুদের অশেষ নিগ্রহের কথা বর্ণনা করলেন। সভায় স্থির হয় চট্টগ্রামের প্রকৃত অবস্থার খোঁজ নেবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন পাঠানো হবে। পাছে সরকার তরফ থেকে কোনো ওজর আপত্তি ওঠে, সেজন্য এক প্রকার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের সদস্যেরা চট্টগ্রাম রওনা হয়ে যান। হিন্দুদের মনে অনেকটা স্বস্তি ও ভরসা ফিরে এল। ডিভিশনাল কমিশনর নেল্‌সন ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কেম্প চট্টগ্রাম পরিস্থিতি আলোচনার জন্য যতীন্দ্র মোহনকে আহ্বান জানালেন। আলোচনাক্রমে স্থির হল হিন্দু বেপারী ও দোকানদারদের বলা হবে দোকান খুলতে। যতীন্দ্র মোহন সরকার পক্ষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন লুঠতরাজ তাঁরা বন্ধ করবেন এবং অপর পক্ষে গুর্খা পল্টন ও পুলিসেরা আর অত্যাচার চালাবেনা। এইসব নিশ্চিতি আদায়ের পর সহর ও সহরতলীতে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। তদন্তের কাজে যতীন্দ্র মোহন যাতে কোন বাধা না পান, তারও ব্যবস্থা হল।

তদন্তের ফলে অনেক অদ্ভুত ঘটনার কথা জানা গেল, সেই সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল লোকচক্ষুতে। গুণ্ডামিতে যারা ভয় পায় গুণ্ডারা তাদেরই বেশি করে ভয় দেখায়। যতীন্দ্র মোহনের মনে ভয় বলে কোনো পদার্থ ছিল না, অত্যাচরিত ও সন্ত্রস্ত লোকেরা তাঁর কাছ থেকে বল পেল, ভরসা পেল। চট্টগ্রাম সহরে যতটা নয়, কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে তার চেয়ে অনেক বেশি নির্যাতন হয়েছিল। যতীন্দ্র মোহন দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এইসব গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন, কোথায় কি আহার জুটবে তা নিয়ে লেশমাত্র চিন্তাও করেননি। যেখানেই গেলেন হাজারো লোক চলল তাঁর পায়ে পায়ে, তিনি সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন মানুষ যদি ভয়ে ভীত না হয় কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবেনা। তদন্তের পর যতীন্দ্র মোহন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে

স্পষ্টত দেখা গেল সাম্প্রদায়িক উস্কানির ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৩১ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখ তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পর দেশময় চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়।

১৯৩১ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে হিজলি বন্দীশিবিরে পুলিসের গুলি বর্ষণ সেই বছরে বাংলার তৃতীয় সঙ্কট। গুলিবর্ষণের ফলে সন্তোষ কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়, আহত হয় দশজন—এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুতর ভাবে। সন্তোষ কুমার ছিলেম সেন্ট্রাল কলকাতা কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা সিটি কংগ্রেস লীগের সম্পাদক। তারকেশ্বর ছিলেন বরিশালের লোক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিচিত কর্মী। খবর পাবার পর দিনই যতীন্দ্র মোহন হিজলিতে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও শিবিরে প্রবেশ করার অনুমতি পেলেন না। তখন তিনি খড়্গপুর হাসপাতালে গিয়ে আহত বন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন ও তাদের মুখ থেকে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারলেন। নিহত দু'জনের মরদেহ ট্রেনযোগে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থাও করলেন। হাওড়ায় বিপুল জনতা বিরাট শবযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। হিজলির এই গুলিবর্ষণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত বোধ করেন, অসুস্থতা সত্ত্বেও ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখেই কলকাতার টাউন হলে তিনি একটি প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বাংলা সরকার বুঝতে পারলেন গুলিবর্ষণের ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন হতে পারে। তাই তাঁরা জাষ্টিস্ এস. সি. মল্লিককে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করলেন এই ঘটনার তদন্ত করে দেখতে। তদন্ত কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেন পাগলা ঘন্টি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অকুস্থলে ছুটে এসে ঠিকই করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের উপর গুলি ছোঁড়ার বিন্দুমাত্র কারণ ছিলনা।

২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে করপোরেশনের সভায় হিজলি নিয়ে যখন আলোচনা হয় যতীন্দ্র মোহন বলেছিলেন কাজটা কেবল যে 'অযৌক্তিক' হয়েছে এমন নয়, এই গুলিবর্ষণকে আইনের ভাষায় বলা যেতে পারে 'দণ্ডার্হ নরহত্যা'।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত যাত্রা

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে যতীন্দ্র মোহনের স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হতে থাকে, রক্তের চাপ বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পায়। বন্ধুবান্ধব ও ডাক্তারেরা পরামর্শ দেন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে উনি যেন কিছু দিনের জন্য দেশের বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নেন। দেশের সঙ্কটকালে ওঁর নিজের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিলনা দেশের বাইরে যান। কিন্তু স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায় উনি শেষ পর্যন্ত বিলাত যেতে সম্মত হন। তখন ওঁর আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়, রাজনীতিক কাজে অধিক সময় দিতে হত বলে ধারকর্জ করে সংসার চালাতে হত। চট্টগ্রাম ও বরমার প্রজারাও নিয়মিত তাদের দেয় ভাড়া খাজনা প্রভৃতি দিতনা, জানত যে তিনি তাদের বিরুদ্ধে মামলা আনবেন না। কার কাছেই বা হাত পাতবেন, শেষ পর্যন্ত লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি বাঁধা দিয়ে কিছু ধার নিয়ে বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে যতীন্দ্র মোহন ও নেলী বিলাতের জাহাজে পাড়ি দিলেন। সমুদ্র পথের কয়েকটা দিনের বিশ্রামে শরীরে মনে বেশ আরাম পেলেন।

বিলাত পৌঁছে যতীন্দ্র মোহন ও নেলী গেলেন মিসেস্ গ্রে-র সঙ্গে দেখা করতে। সেই বিয়ের পর থেকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। মেয়ে ও জামাইকে পেয়ে বৃদ্ধা খুবই খুশি হলেন। নেলী হপ্তায় হপ্তায় তাঁকে যেসব চিঠি লিখত, তাথেকে যতীন্দ্র মোহনের কার্যকলাপ বিষয়ে তিনি অনেক কথাই জেনেছিলেন। জামাই ভারতের বীর নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছেন, মেয়েও স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহসের সঙ্গে লড়েছেন—এইসব কথা ভেবে তিনি গৌরব অনুভব করতেন। নেলীর পক্ষে এই প্রত্যাবর্তন হয়েছিল খুবই আনন্দের, মাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন বলে ' মাকে একা ফেলে ভারতে চলে আসার দরুণ প্রায়ই তাঁর প্রাণ কাঁদত।

মহাত্মা গান্ধীও তখন দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য বিলাতে আছেন। যতীন্দ্র মোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে পর হিজলি শিবিরে গুলিবর্ষণের ব্যাপার নিয়ে তিনি যা কিছু করেছেন গান্ধীজী তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

বিলাতে বিশ্রাম করতে এসেও কিছুদিনের মধ্যেই যতীন্দ্র মোহন নানা কাজে জড়িয়ে পড়লেন। বিলাতে দেশের হয়ে কত কিছু করার মত কাজ থাকতে তিনি কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন? বিলাতেও দেশের মতো তাঁর রাজনীতিক কাজ চলতে থাকল। ইণ্ডিয়া লীগ হাউস অব কমন্স-এ একটি সভার আয়োজন করে তাঁকে ডাকল বক্তৃতা দিতে। তিনি উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বললেন ছ'হাজার মাইল দূর থেকে ইণ্ডিয়া হাউস এক কালে যেভাবে ভারত শাসন করত, সেদিন আর নেই। শাসনের নামে এখনো অনেক অনাচার ও অত্যাচার চলছে। ইংলণ্ড নিজেকে গণতন্ত্রবাদী বলে বড়াই করে অথচ ভারতের শাসন চালায় স্বৈরতন্ত্রীর মতো বিশেষ আইন ও অর্ডিনান্সের সাহায্যে। এমনটা আর চলতে দেওয়া ঠিক হয়না—না ব্রিটেনের পক্ষে না ভারতের পক্ষে। এখন সময় এসেছে ভারতের হাতেই ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেবার। ইংরেজ একদিন বাণিজ্যের লোভে ভারতে গিয়েছিল, রাজ্যশাসনের মোহ পরিত্যাগ করে আবার যদি শান্তিতে বাণিজ্য করতে চায় স্বাধীন ভারত নিশ্চয় সে সুবিধা তাদের দেবে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতে ফিরে এসে দেখলেন রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের প্রস্তুতি পর্বে আবহাওয়ায় যে সামান্য উন্নতি দেখা দিয়েছিল, এখন তা সম্পূর্ণত অদৃশ্য। দেশের সকল নেতা, মায় জওহরলালকে পর্যন্ত কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। গান্ধীজী দেখলেন আরউইনের সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন সে চুক্তির আর যেন কোনো মূল্য নেই। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন্‌কে তারবার্তা পাঠিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে চাইলেন। ভাইসরয় সাক্ষাতে স্বীকৃত হলেন না। গান্ধীজী দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানালেন—এবারে জবাব এল, না

সাক্ষাত হবেনা। অতঃপর সরকারের কাজের নিন্দা করে গান্ধীজী বিবৃতি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে তাঁকে যারবাদা জেলে পাঠানো হল। বাংলায় সুভাষ চন্দ্র বসুকেও কারাগারে পাঠানো হল।

দেশে এইসব ঘটনার কথা শুনে যতীন্দ্র মোহন এমনই বিষাদগ্রস্ত হলেন যে বিদেশে আর তাঁর মন টিকলনা। তিনি দেশে ফিরে আসবেন বলে মনস্থ করলেন। ফিরতি পথে তিনি প্যারিস হয়ে এলেন। সেখানকার ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁর সম্মানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল, একটি বড় গোছের সভায় গান্ধী আরউইন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের তখনকার রাজনীতিক পরিস্থিতি বিষয়ে তিনি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। জেনোয়া বন্দর থেকে তিনি ভারতগামী জাহাজ ধরেন। জাহাজের কয়েকটা দিন ভারি আনন্দে কাটল। যতীন্দ্র মোহন হয়তো বুঝেছিলেন দেশে যেমন একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তাতে তিনি যে খুব বেশি দিন অবাধ আনন্দে কাটাতে পারবেন তার আশা সুদূর। নেলীর মনে কোনো দুশ্চিন্তা জাগেনি। তখন দেশের প্রথম সারির নেতারা একে একে গ্রেফ্‌তার হচ্ছেন, আইন অমান্য আন্দোলন আবার জোরদার হতে লেগেছে। ১৯৩২ সনের ২০ জানুয়ারি তারিখে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভিড়তেই স্থানীয় পুলিস জাহাজে চড়াও হল। জাহাজ তখনো নোঙর ফেলেনি। পুলিস চাইল সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেফ্‌তার করতে, কিন্তু কাপ্তেন দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে বললেন যে তাঁর জাহাজ ইতালিয়ান জাহাজ, ব্রিটিশ পুলিসের কোনো অধিকার নেই যে তাঁর জাহাজে চড়াও হয়ে কোনো আরোহীকে গ্রেফ্‌তার করে। অগত্যা পুলিসকে সুড় সুড় করে নেমে যেতে হল, ছুটে গিয়ে ইতালিয়ান কনসালের অনুমতি চেয়ে আনতে হল। অতঃপর জাহাজ থেকে নেমে যে-ই যতীন্দ্র মোহন পাটাতনে পা দিয়েছেন, ১৮১৮ সনের তিন নং রেগুলেশন অনুসারে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হল।

যতীন্দ্র মোহনের ছেলে শিশির জাহাজ ঘাটে এসেছিল বাবা মাকে নিতে, সঙ্গে এসেছিল যতীন্দ্র মোহনের দুই বিশ্বস্ত অনুচর—ক্ষিতীশ গাঙ্গুলি ও

দ্বিজেন কুণ্ডু। যতীন্দ্র মোহনের ভাইঝি আইলীন তার জেঠা জেঠিমার সঙ্গে আসছিল বিলাত থেকে। সেই প্রথম তাঁর বাপের দেশে আসা। বোম্বাইতে পা দিতে না দিতেই, বলা নেই কওয়া নেই মেজ জেঠামণিকে পুলিস অকারণ ধরে নিয়ে গেল দেখে মনে খুব আঘাত পেয়েছিল আইলীন। যতীন্দ্র মোহনকে কোথায় কোন জেলে যে পাঠানো হবে পুলিস পরিবারের লোকদের তাও বলতে চাইল না। বোম্বাইয়ের যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যতীন্দ্র মোহনকে পুলিস হাজির করল, বেচারা নেলী সোজা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল স্বামীকে তাঁর কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট মুখ খুললেন না। ওই আদালত ঘরেই স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করা হল। শিশির ও আইলীনকে নিয়ে নেলী কলকাতা চলে গেলেন। দ্বিজেন কুণ্ডু কিন্তু রয়ে গেলেন, চোখ রাখলেন তাঁর অতি শ্রদ্ধেয় নেতাকে পুলিস কোথায় নিয়ে যায়। গোয়েন্দাগিরি করে ইনিই খোঁজ পেয়েছিলেন যতীন্দ্র মোহনকে নিয়ে যাওয়া হবে দার্জিলিং জেলে। রক্তের চাপ যে মানুষের বেশি তাঁকে দার্জিলিং-এর মতো উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়া একপ্রকার মৃত্যুদণ্ড। তাছাড়া পুলিস তাঁকে এমন ঝট্ করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যে তাঁর জন্য কোনো গরম কাপড় পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি এমন হৃদয়হীন আচরণ কেন যে করলেন তা আজকের দিনেও ঠিক বুঝে ওঠা শক্ত। পরিবারের লোক যখন জানল যে যতীন্দ্র মোহনকে দার্জিলিং-এ রাজবন্দী করে রাখা হবে, তাঁরা গরম কাপড়-চোপড় নিয়ে ছুটে গেলেন সেখানে, কারণ জানুয়ারি মাসে দার্জিলিং-এ প্রচণ্ড শীত। ক্ষিতীশ গাঙ্গুলি কাপড়-চোপড় নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন কিন্তু অনুমতি তিনি পেলেন না।

ইতিমধ্যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় যতীন্দ্র মোহন সর্বক্ষণ মাথায় একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন, বুঝতে পারলেন এরকম উঁচু জায়গায় আরো কিছুকাল তাঁকে যদি রেখে দেওয়া হয়, প্রাণসংশয় হতে পারে। স্ত্রীকে তিনি একটি তারবার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। পরের দিনই নেলী রওনা হয়ে চলে

এলেন। স্বামীর অসুস্থ চেহারা দেখে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কাছে—এমনকি বাংলার গভর্ণর বাহাদুরের কাছেও স্বামীর স্বাস্থ্য বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি তারবার্তা পাঠালেন। দু'দিন পরে তিনজন য়ুরোপিয়ান ডাক্তার এসে যতীন্দ্র মোহনকে পরীক্ষা করে দেখলেন। নেলীর তখনকার মনের অবস্থা কেমন ছিল, পরিবারের লোকেরা কত কী ভাবছিল—ডাক্তারেরা সেকথা জেনেশুনেও নেলীর সঙ্গে রোগীর অবস্থা বিষয়ে একটি কথাও বললেন না। হোন্ না তাঁরা সরকারী ডাক্তার, এরকম অবস্থায় সামান্য একটু সহানুভূতিশীল হলে কিছু ক্ষতি ছিল না, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা মুখ খুললেন না। সে যাই হোক অল্প কালের মধ্যেই যতীন্দ্র মোহনকে জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তর করা হল। বিনা বিচারে যতীন্দ্র মোহনকে বন্দী রাখা হয়েছে বলে সরকার তাঁর পরিবারের জন্য হাজার টাকার একটা মাসিক ভাতাও মঞ্জুর করলেন। আসলে তিনি বে-আইনী কিছু করেছেন বলে তো তাঁকে জেলে দেওয়া হয়নি, জেলে দেওয়া হয়েছে যেহেতু আর পাঁচজন নেতাও তখন জেলে। এ যেন অদ্ভুত এক ধরনের ঢালাও শাস্তির ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ি জেলে যতীন্দ্র মোহনকে এক বছরের অধিককাল বিনা বিচারে বন্দী রাখা হয়। এখানেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা গেল না। এ সময় তাঁর অনেক সেবা করেছিল পাগলা বলে তাঁর চাকর। এককালে পাগলা খুনের দায়ে জেল খেটেছে জলপাইগুড়িতেই। জেল কর্তৃপক্ষ পাগলাকেই নিযুক্ত করেছিলেন যতীন্দ্র মোহনের হেফাজতিতে। পাগলা তার প্রভুর কাছ থেকে যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিল তা বহুকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করত। ১৯৩৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যতীন্দ্র মোহনকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে রুগী কয়েদীরূপে ভর্তি করা হয়। এখানে দিনের একটা সময়ে হাঁটাচলা করবার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন, আত্মীয়-স্বজনকেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হত। হাসপাতালের হাজতের মধ্যে এই দীর্ঘদেহ ব্যক্তিটি যখন হাঁটাচলা করতেন, কলেজ স্ট্রীটের দিকে হাসপাতালের যে গেট ছিল সেখানে হাজারো

লোক জমা হত তাঁকে এক পলক দেখবার জন্য। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা ও যত্নের কোনো ত্রুটি ঘটেনি কিন্তু রক্তের চাপ কমবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লোকেরা গোপনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগল তাঁর উপদেশ নির্দেশের আশায়। আবার তাঁর হিতাকাঙ্খীদের কেউ কেউ অনুনয় করে তাঁকে বলল তিনি যেন রাজনীতি পরিহার করে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাহলে বেশ দু'পয়সা উপার্জন হবে, শরীরও সারবে। কিন্তু এইসব সাংসারিকদের কথা তিনি কানেও তোলেননি, নিজের প্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে মুখ বুজে সব কষ্ট সহ্য করেছেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নেলী সেনগুপ্ত

১৯৩৩ সনে যতীন্দ্র মোহন যখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রুগী কয়েদীরূপে রয়েছেন, প্রস্তাব হয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসবে কলকাতাতেই। সরকারের ঘোষণা অনুসারে কংগ্রেস তখন বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তখন নির্বিচারে গ্রেফতার করে কয়েদ করা হত। এইভাবে একের পর এক প্রেসিডেন্টকে কারাবরণ করতে হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিলনা বলে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণে বিপদের ঝুঁকি কিছু কম ছিলনা। নেলীকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার কথা হতে, তিনি স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন নেলী, কংগ্রেসের ইতিহাসে তিনি হলেন তৃতীয় মহিলা প্রেসিডেন্ট, তাঁর আগে আর যে দু'জন নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অ্যানি বেশান্ত (১৯১৭) ও সরোজিনী নাইডু (১৯২৫)। নেলী কোথায় কখন কংগ্রেসের সংকল্প বচন পাঠ করবেন, সে খবর আগাম জানানো হলনা, পাছে পুলিস এসে সভা ভণ্ডুল করে।

নির্দিষ্ট দিনে কংগ্রেসের লোকেরা ছোট ছোট দলে এসপ্লানেড ট্রাম ডিপোর কাছে জমায়েত হতে লাগল। গতিবিধি গোপনেই করতে হল, তা না হলে পুলিস টের পেয়ে যাবে। সহরে যত পার্ক ও খালি জায়গা ছিল পুলিস হয় সেগুলি বন্ধ করে দিল নয় সেখানে ঘাঁটি বসাল। সহরের অন্য কোথাও জায়গা পাওয়া যাবেনা, ভিতরে ভিতরে ঠিক হয় এস্‌প্লানেড ট্রাম ডিপোতেই অধিবেশন হবে। অতর্কিতে বিকাল ঠিক চারটার সময় চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ও ধর্মতলার মোড়ে বিউগল বেজে উঠল। হাজারো কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ছুটে এল ট্রাম ডিপোর গুমটির দিকে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে। নেলী চারটার কিছু আগেই মোটরে চলে এসেছেন দেবর রণেন্দ্র মোহনকে সঙ্গে নিয়ে। বিউগল বাজার সঙ্গে সঙ্গে মোটর থেকে নেমে

তিনি দ্রুতপদে চললেন যেখানে সমস্বরে বন্দেমাতরম ধ্বনি উঠছে। সদস্যেরাও চলে এলেন সভাস্থলে, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টরূপে নেলী সেনগুপ্তর নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হল। কালবিলম্ব না করে নেলী উচ্চকণ্ঠে কংগ্রেসের সংকল্পবচন পড়তে লাগলেন। দু'পাঁচ কথা তিনি পড়েছেন মাত্র, এমন সময় ডাণ্ডা হাতে পুলিস তেড়ে এল। কাছেই কার্জন পার্কের আনাচে কানাচে ডাণ্ডাধারী পুলিস ওঁৎ পেতে বসে ছিল। এবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কংগ্রেসী জনতার উপর, লাঠির ঘায়ে মুহূর্তের মধ্যে ছত্রভঙ্গ করে দিল সভা। ট্রাক বোঝাই পুলিস এসে পড়ল লালবাজার থেকে, সভাস্থল ঘিরে আবার একদফা নৃশংস ডাণ্ডাবাজি চলল। বাছবিচার না করে বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করে তুলে নিল ট্রাকে। রণেন্দ্র মোহন এতক্ষণ তাঁর বৌদির সঙ্গ ছাড়েননি, এবার তিনি বিচ্যুত হয়ে জনতার আবর্তে কুটোর মতো ভেসে চললেন, দূর থেকে অসহায় দৃষ্টিতে দেখলেন বৌদিকে উঠিয়ে নিয়ে পুলিসের কালো গাড়িটা উধাও হয়ে গেল। শান্তিপূর্ণ হলেও পুলিসের হামলা থেকে কংগ্রেসের এই অধিবেশন রেহাই পেলনা। মারধোর রক্তপাত সত্বেও জনতা শান্তি রক্ষা করল, প্রতি-হিংসার কোনো চেষ্টা করলনা, মাথায় চোখেমুখে সপাসপ বেত পড়ছে, বেটনের গুঁতো ও স-বুট পদাঘাত সত্বেও তারা সমস্বরে ধ্বনি দিল বন্দেমাতরম। সে এক অদ্ভুত উদ্দীপনার দৃশ্য! নেলী সেনগুপ্ত যে সাহস দেখালেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি জেনেশুনেই এসেছিলেন যে পুলিস কাউকে ছেড়ে কথা কইবেনা, তৎসত্বেও প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করে তিনি সংকল্প বচন পাঠ করার উদ্‌যোগ করছিলেন অকুতোভয় বীরাঙ্গনার মতো।

রণেন্দ্র মোহন বাড়ি ফিরে যাবার পর পুলিস কমিশনারের একটি টেলিফোন বার্তা পেলেন। তাঁকে বলা হল যথাসময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজিরা দেবার মুচলেকা স্বাক্ষর করে দিলে তাঁর বৌদিদিকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। রণেন্দ্র মোহন চলে গেলেন হাসপাতাল, সেখানে যতীন্দ্র মোহনকে সব কথা বলায় তিনি নির্দেশ দিলেন নেলী কিছুতেই যেন কোনো মুচলেকা না দেন।

ফলে নেলী সেনগুপ্তকে জেলে যেতে হল, সেখানে টিনের ছাউনি দেওয়া একটি ঘরে অন্য সব কংগ্রেসী বন্দীদের মধ্যে তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। রণেন্দ্র মোহন তাঁকে যখন দেখতে গেলেন, টিনের ছাদের গরমে তাঁর দুরবস্থার একশেষ। যে কটা দিন জেলে তাঁকে কাটাতে হল তিনি নরকযন্ত্রণা ভোগ করলেন। নেলী ও অন্যান্য কংগ্রেসীদের বিচার হল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল সুশীল সিংহের এজলাসে। তিনি সবাইকে খালাস করে দিলেন।

এই সময়ে নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ বাঙালী নেতারা যতীন্দ্র মোহনের শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা চিন্তা করে, সরকারের মনোভাব নমনীয় করার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সনের ৫ই জুন তারিখে তাঁকে রাঁচিতে স্থানান্তর করা সাব্যস্ত হয়, স্থির হয় সেইখানে তিনি অন্তরীণ থাকবেন এবং তাঁর স্ত্রী নেলী ও ভাইঝি আইলীনকে তাঁর হেফাজতের জন্য তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হবে। তিনি গৃহবন্দী থাকবেন, কারো সঙ্গে দেখা করতে যেতে তিনি পারবেন না, কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবেনা।

কলকাতা থেকে রাঁচির পথে যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর—ক্ষিতীশ গাঙ্গুলি। পরে এঁর মুখে শোনা গিয়েছিল সে রাতটা যতীন্দ্র মোহন ভালো করে ঘুমুতে পারেননি। গভীর রাত অবধি এক প্রকার আপন মনেই অনুচরের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছিলেন—এমন সব কথা যা নাকি সচরাচর তাঁর মুখে শোনা যেতনা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর আর বেশি দিন নেই, ক্ষিতীশকে বলেছিলেন :

ক্ষিতীশ, আমি এমনভাবে চলে যেতে চাই যেন কেউ জানতেও না পারে। তুমি কাউকে কিছু বোলো না। নিজে কিন্তু তৈরী থেকো।

ছোট একটা ষ্টেশনের ধারে গাড়ি থেমেছে, বাইরে অন্ধকার, অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ ঢাকছে—এই পরিস্থিতিতে যতীন্দ্র মোহনের মুখে এমন কথা শুনে ক্ষিতীশের কেমন যেন ভয় হতে লাগল পাছে মুখের কথা সত্য হয়ে যায়।

কারণ কর্তা তো এভাবে মন খুলে এমন ধরনের কথা এর আগে কখনো বলেননি। চিরকাল ক্ষিতীশ দেখে এসেছেন কর্তা ভয়ডরহীন বীরপুরুষ, ব্যক্তিগত ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করাকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন, আজ তাহলে কেন তিনি বললেন যে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া তিনি দেখতে পেয়েছেন? একটা নামহীন বিষাদে ট্রেনের সেই ছোট কামরাটি থমথম করতে লাগল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
অন্তরীণ ও মৃত্যু

যতীন্দ্র মোহনকে অন্তরীণ করা হল রাঁচির উপকণ্ঠে—নগেন্দ্র লজে। ১৯২১ সনে চট্টগ্রামের সেই রেল ধর্মঘটের পর থেকে যে ক্ষিতীশ গাঙ্গুলি ছায়ার মতো কর্তার আশেপাশে সর্বদা থেকেছেন, পুলিস তাঁর মুখের উপর লজের গেট বন্ধ করে দিল। অপর একজন নিত্য সহচর দ্বিজেন কুণ্ডুকেও বলে দেওয়া হল যে তাঁরা যদি আশা করে থাকেন যে রাঁচিতে বাসা করে কাছাকাছি থাকবেন, কর্তার খোঁজ খবর নেবেন, তাহলে সে আশা দুরাশা। তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবেনা। তিনিও কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না—পুলিসের হুকুম। এই দু'জন নিত্যসঙ্গীকে বিচ্যুত করে কার কি লাভ হয়েছিল জানার উপায় নেই—কিন্তু উভয়পক্ষে এ বিচ্ছেদ মর্মান্তিক হয়েছিল সন্দেহ নেই।

আরো একজন যাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি তিনি হলেন যতীন্দ্র মোহনের সেক্রেটারি সুখেন্দু সেনগুপ্ত। সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ইনি যতীন্দ্র মোহনের কাজে সামিল হয়েছিলেন। সুখেন্দু বাড়ির লোকের মতো ছিলেন, নেলী, শিশির ও বুঢ্‌ঢার মতো তিনিও যতীন্দ্র মোহনকে তার নিতান্ত অন্তরঙ্গ ডাক নাম ধরে ডাকতেন 'মাম্' বলে। এইভাবে বহির্জগতের সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের সকল রকম যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হল।

অন্তরীণ অবস্থায় পুলিস পাহারায় তাঁকে মোটর যোগে কিছুটা রাস্তা ঘুরিয়ে আনা হত। মোটর যখন বেরোত রাস্তার দু'ধারে লোক জমত অনেক কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, তাঁর মুখ থেকে দু'কথা শোনবার জো ছিলনা। একমাত্র নেলী ও আইলীন ছাড়া জগতে আর কারো সঙ্গে কথা বলা তাঁর বারণ। যে লোক চিরকাল কথা কয়ে এসেছেন, দেশের নানা প্রশ্ন নিয়ে মতামত দিয়ে এসেছেন—তাঁর পক্ষে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নৈঃশব্দের বেদনা বড় গভীর বেদনা। এইসব শাসন বারণ ও বাধ্য বাধকতার ফলে মনের উপর

যেমন চাপ পড়তে লাগল রক্তের চাপও তেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল। সবচেয়ে অসহ্য মনে হত যখন পুলিস পাহারায় মোটরে তিনি বোবার মতো বসে থাকতেন, আর রাস্তার দু'ধারে তাঁর মুখের দুটি কথা শোনার জন্য ব্যাকুল জনতা জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত। সভায় সমাবেশে এই জনতার সামনে এতকাল তিনি প্রাণখুলে কথা বলে এসেছেন আজ তাঁর মুখে কথা নেই। এযেন হাওয়া খাওয়াবার অছিলায় তাঁর মন ভেঙ্গে দেবার দৈনন্দিন রুটিন—মুখবুজে মার খাওয়ার মতো অসহ্য যন্ত্রণা। রুগ্ন মানুষকে যতটুকু আরাম দেওয়া নিতান্ত দরকার পুলিস তাকে ততটুকু আরামও দেয়নি। জীবনে কখনো এমন শোচনীয় দুরবস্থায় তাঁকে পড়তে হয়নি। ১৯৩২ সনের জানুয়ারি থেকে তিনি জেলে আছেন—এক নাগাড়ে প্রায় দেড় বছর। রক্তের চাপ নাববার কোনো লক্ষণ নেই দেখে তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। অপরপক্ষে তাঁকে ধরা হয়েছে ১৮১৮ সনের তিন নং রেগুলেশন অনুসারে ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত সন্দেহে। সরকার এই ধারায় যে কোনো লোককে যেমন খুশি দার্ঘ সময়ের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারে। কালে ভদ্রে পরিবারের অন্য লোকেরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেতেন। যেমন যেমন অনুমতি আসত রণেন্দ্র মোহন অথবা শিশির অথবা বুঢ়া রাঁচি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতেন। যতীন্দ্র মোহনের সেই মাথা ধরাটা লেগেই ছিল, উপরন্তু ২৪ জুন থেকে নূতন উপসর্গ দেখা দিল শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির আকারে।

১৯৩৩ সনের ২২ জুলাই। সেদিনও পুলিস পাহারায় যতীন্দ্র মোহনকে মোটরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে আছেন নেলী ও আইলীন। মোটর থেকে নেবে খানিকক্ষণ তিনি গল্‌ফ খেলার মাঠে পায়চারী করলেন, চাঁইবাসা রোডের ধারে একটা মাঠে হকি খেলা একটু দেখলেন। আজ শরীরটা তাঁর ভালো নেই—সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি বোধ করছেন, লজে ফিরে এসে আগেভাগে ডিনার সেরে শুতে চলে গেলেন। শুতে তো গেলেন, কিন্তু ঘুম

আর আসেনা, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। নেলী ও আইলীনও নিজেদের ঘরে শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ রাতের অন্ধকার ভেদ করে উঠল একটা আর্ত চীৎকার—ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নেলী আইলীন ছুটে এসে দেখলেন তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। সিবিল সার্জেন মেজর হোয়াইট্‌কে সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হল। তিনি এসেই রক্তের চাপ হ্রাস করার জন্য একটি ধমনী চিরে দিলেন—রক্ত-মোক্ষণের জন্য। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ধারা বেরুল, ছিটিয়ে পড়ল পাশের দেয়ালে। বাঁ দিকের হাতখানা যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল, ডাক্তার বুঝলেন পক্ষাঘাতের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আরো কয়েকজন ডাক্তার ও নার্স ডেকে আনা হল। চার ঘণ্টা ধরে চলল যমে মানুষে ধ্বস্তাধ্বস্তি—কিন্তু জ্ঞান আর ফিরে এলনা। ১৯৩৩ সনের ২৩ জুলাই তারিখে ভোর পৌণে দুটোর সময় নেলীর কাছ থেকে বিদায় নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, যতীন্দ্র মোহন পৃথিবী থেকেই শেষ বিদায় নিলেন। তাঁর দুই ছেলে ও ছোট ভাই মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যার পাশে ছিলনা। 'বাঙলার সিংহ' শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নগেন্দ্র লজের খাঁচার মধ্যে মারা গেলেন।

কলিকাতায় পরিবারের লোকদের অসুখের বিষয়ে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়েছিল ২২ জুলাই তারিখে রাত দশটায়। ছোট ছেলে বুট্‌টা তখন অসুস্থ ও শয্যাগত। রণেন্দ্র মোহনকে বলা হল সঙ্গে সঙ্গে যেন রাঁচিতে ডাক্তার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। জেঠতুতো দাদা ডঃ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত পরের দিন সকালেই রওনা হবেন বললেন। মিঃ কে. সি. মাহিন্দ্র রণেন্দ্র মোহনের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। গোড়ায় তিনি এরোপ্লেনে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অত রাতে কোনো ব্যবস্থা করা গেলনা। এই সমস্ত তোড়জোড় শেষ হলে পর রাত দুটোর সময় কলকাতায় টেলিফোনে খবর এল যতীন্দ্র মোহন আর ইহজগতে নেই।

শিশির মোটরে রাঁচি চলে গেলেন। রণেন্দ্র মোহন বিধানচন্দ্র রায়, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি নেতাদের খবর দিয়ে মরদেহ হাওড়া ষ্টেশনে গ্রহণের জন্য

ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা সহরে শোকের অন্ধকার নেমে এল।

রাঁচির লোকেদের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। যে মানুষ গতকাল গল্‌ফ খেলার মাঠে পায়চারী করে বেড়িয়েছেন, মোটরে বেড়াবার সময় যাঁকে দেখবার জন্য প্রত্যহ ভিড় জমত—তিনি যে আর নেই এ যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। মাথায় তিনি লম্বা ছিলেন এবং শরীরের গঠন তাঁর শক্ত ছিল বলে, লোকে ভাবত তিনি স্বাস্থ্যবান শক্তিমান পুরুষ। পথে পথে লোকেরা বুক চাপড়ে গলদশ্রুলোচনে বলতে লাগল, 'দেশপ্রিয় গুজর গয়ে', 'দেশপ্রিয় অমর হ্যায়।' রাঁচির য়ুরোপীয় সমাজ করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ বিওন সর্বদা নেলী ও আইলীনের খোঁজখবর নিতেন, এখন তিনিই সব ব্যবস্থা করবার উদ্‌যোগ করলেন। এত চেষ্টা করেও মেজর হোয়াইট্‌ যতীন্দ্র মোহনকে বাঁচাতে পারেননি বলে তাঁরও খুব মন খারাপ। পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান বাহাদুর আহসানও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন—দেশপ্রিয়ের পরিবারবর্গের সঙ্গে এঁরও বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। যে গাড়িতে মরদেহ ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল, ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল সেই গাড়ি। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক শবযাত্রার অনুগামী হল। বিওন ও আহসানের পরিচালনায় এই শোকযাত্রা সুশৃঙ্খলায় এগিয়ে চলল ষ্টেশনের দিকে। একটি বিশেষ কামরা রিজার্ভ করা হয়েছিল, সেই কামরায় মরদেহ রক্ষিত হল। ২৩ জুলাই বিকেলবেলা রাঁচি এক্সপ্রেস রওনা হয়ে গেল কলকাতার পথে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে শোকাকুল জনতা তাদের প্রিয় নেতার শেষ সন্দর্শনে উপস্থিত হল। শিশির কলকাতা থেকে মোটরে আসছিলেন ক্ষিতীশ গাঙ্গুলির সঙ্গে, তাঁরা মুরি জংসনে অপেক্ষা করছিলেন রাঁচি এক্সপ্রেসের জন্য। মৃতদেহ দেখে ক্ষিতীশ মূর্ছা গেলেন। নেলী ও আইলীন মরদেহ আগলে বসে ছিলেন, এবার শিশির তাঁদের সঙ্গে যোগদান করায় আবার যেন সকলের শোকাশ্রু উথলে উঠল। টাটানগরে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন, তিনি সেখানে যা

ঘটেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন :

> ওই তো তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়ে নিশ্চল শুয়ে আছেন, আজ তাঁর কণ্ঠস্বর নীরব, ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে তাঁর শেষ শয্যা। হিমশীতল তাঁর দেহ, জমাট বরফে আচ্ছাদিত তাঁর শবাধার, সেই শৈত্যের স্পর্শ লেগে আমাদের মনও যেন কঠিন হয়েছে। কাতর কণ্ঠে কারা যেন বলে উঠল 'হায় হায়, ওঁকে ওরা মেরে ফেলেছে, কিছুতেই ওঁকে বাঁচতে দিলনা!'

নেলী চুপ করে বসে রইলেন। খড়্গপুরে 'এডভান্স' কাগজের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছিলেন, নেতার মরদেহ সন্দর্শনে। সুপরিচিত মুখ দেখে নেলীর আবেগ আর বাধা মানলনা, গভীর বেদনায় তিনি বলে উঠলেন :

> দেখুন, কী গভীর ঘুম! আর উনি জাগবেন না। যতই আমি ডাকি না কেন আর ওঁর ঘুম ভাঙবেনা!

টাটানগর ও খড়্গপুরে যেরকম ভিড় হয়েছিল সেরকমটা ওই দুই সহরে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। রাঁচি থেকে হাওড়া অবধি সমস্ত অঞ্চলটাই যেন সেদিন বেরিয়ে পড়েছিল শোক যাত্রায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
শেষ যাত্রা

তাঁর জীবৎকালে কলকাতা সহর কতবার যতীন্দ্র মোহনকে শোভাযাত্রা সহকারে অভ্যর্থনা করেছে। যখন কোনো বৃহৎ ব্যাপার ঘটেছে, যখনই তিনি জেলে গেছেন কিংবা জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন, জনতা শোভাযাত্রা করে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছে। এই শেষবার হাওড়া এসে পৌঁছুবেন তিনি, কিন্তু বিনা মাইকে তাঁর সেই যে জলদমন্দ্র স্বর সভার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গমগম করত, সেই কণ্ঠ আজ নীরব। আজ কেবল তাঁর দেহ এসে পৌঁছবে, কিন্তু তাঁর আত্মা যাত্রা করেছে পরলোকে।

সেদিন আকাশের মুখ বিষাদগম্ভীর। হাওড়া থেকে মাইল দুয়েক আগে ট্রেন যখন রামরাজাতলায় থামল, কান্নায় ফেটেপড়া আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল অঝোরে। তেমনি কেঁদে ভাসাল আইলীন তার কাকা রণেন্দ্র মোহনকে দেখে—ছোটকাকা যে মেজজেঠুকে জীবিত দেখতে পেলনা, সেই শোক বালিকার বুকে গভীরভাবে বাজল। বাংলার অনেক নেতা সেদিন রামরাজাতলায় এসেছেন। হাওড়া ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ছোট ষ্টেশন—মুহূর্তে ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে গেল। গভীর প্রীতিতে ও শ্রদ্ধায় রেলকামরা থেকে মরদেহ নাবিয়ে সযত্নে রাখা হল খাটুলির পুষ্প সজ্জায়, তারপর বাহকেরা ও শোকযাত্রীরা রওনা হল হাওড়ার দিকে। স্থির ছিল যে মরদেহ সর্বাগ্রে হাওড়ার টাউন হলে নেওয়া হবে, এবং তারপর অন্যান্য জায়গায়। রামরাজাতলার শবযাত্রীদের সঙ্গে হাওড়ার জনতা এবার মিলল। সকল দোকানপাট সেদিন বন্ধ। হরতালের ডাক দেওয়া হয়নি কিন্তু আপনা থেকে হরতাল প্রতিপালিত হয়েছে সহরে। রাস্তার দু'পাশ থেকে সারা রাস্তা পুষ্প বৃষ্টি, লাজ বৃষ্টি আর ঝারি ভরে ভরে গোলাপ জল ছিটানো। ভরা বর্ষার আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে মুহূর্মুহূ শংখের আর্তনাদে।

একজন বলে উঠলেন :

পরম দেশভক্ত একজনকে দেশ এবার চিরতরে হারাল। আজকের দিনে অনেক মেকি দেশভক্ত দেখা যায়, এরকম খাঁটি একজন মানুষ আর দেখা যাবেনা। জীবনীকার একজন লিখেছেন :

সূর্যোদয় হতেই কলকাতার হাজারো শোকসন্তপ্ত নাগরিক নগ্নপদে হেঁটে চলল হাওড়ার দিকে। পূর্ণপ্রাণের প্রতীক তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আজ জনতার কাছে ফিরে আসছেন, তাঁর সেই প্রাণচাঞ্চল্য আজ স্তব্ধ। সেদিন সমস্ত কলকাতা যেন ভেঙে পড়েছিল হাওড়ায়।

হাওড়ার টাউন হলে শবদেহ নামানো হল। সেখানকার ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান মৃতের উদ্দেশ্যে মাল্য দান করলেন। হাওড়ার জনসাধারণ শেষবারের মতো দেখল তাদের নেতাকে। এবার শবযাত্রীরা কলকাতার পথ ধরে চলতে লাগল। হাওড়া ব্রিজের অপর পারে মাত্র আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লাগল পুরো এক ঘণ্টা। এবার ওপারের জনতার সঙ্গে এপারের জনতা মিলে লোকে লোকারণ্য—লক্ষাধিক লোক শোকযাত্রায় বেরিয়েছে যেমন বেরিয়েছিল আরেক যতীনের মরদেহ নিয়ে। শবাধার বহন করার জন্য এগিয়ে এলেন সন্তোষ 'কুমার বসু, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এবং আরো অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সকলের বাসনা একবার কাঁধ দেবেন, মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখাবার জন্য। এবার শোক মিছিল প্রবেশ করল বড় বাজারে। গুরুদ্বারের কাছে অল্পক্ষণের জন্য থামা হল, শিখ ভক্তেরা কোষমুক্ত তরবারি উত্তোলন করে মৃতের প্রতি সম্মান জানালেন। এখানে পীতাম্বর একজন জাপানী ভিক্ষু শোভাযাত্রার যোগ দিলেন, ডঙ্কা বাজিয়ে ধম্মপদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করে চলতে লাগলেন সবার সঙ্গে। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকও যোগ দিলেন। পুষ্পবৃষ্টি, লাজবৃষ্টি, গোলাপজল ছিটানো সমানে চলতে লাগল। হ্যারিসন রোড-চিৎপুর-বীডন স্ট্রীট-চিত্তরঞ্জন আভিন্যুর রাস্তা ধরে চলেছে

শোভাযাত্রা। রাস্তায় রাস্তায় তোরণ নির্মিত হয়েছে, দেশপ্রিয়ের প্রতিকৃতি টাঙানো হয়েছে, জাতীয় পতাকা অর্ধ-অবনমিত করে টাঙানো হয়েছে ঘরে ঘরে। কলেজ ষ্ট্রীটে একটি কীর্তনের দল যোগ দিল, আর এল হষ্টেল থেকে ছাত্রেরা দলে দলে।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে শবযাত্রা এবার পৌঁছল ধর্মতলা ষ্ট্রীটে 'এডভান্স' কাগজের অফিসের সামনে। রামরাজাতলা ষ্টেশন থেকে বৌদিদি নেলী ও ভাইঝি আইলীনকে নিয়ে রণেন্দ্র মোহন আগেই কলকাতা ফিরে এসেছিলেন। রণেন্দ্র মোহন তখনো কাগজের পরিচালক—সুতরাং তাকেই তো অগ্রণী হয়ে 'এডভান্সের' তরফ থেকে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে। শবযাত্রা যখন এসে পৌঁছল তখন ঠিক দুপুরবেলা, ইতিমধ্যে বৃষ্টি ধরে গিয়ে প্রচণ্ড গরম হয়েছে। ঘর্মাক্ত শবযাত্রীদের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য করপোরেশনের জলের কল থেকে নলের সাহায্যে জল ছিটিয়ে দেওয়া হল, হাতে হাতে বিলি হল তালপাখা। 'এডভান্স' অফিসের মাথায় জাতীয় পতাকা অবনমিত। ধর্মতলা এসপ্লানেড অঞ্চল থেকে অনেক লোক সেখানে জমায়েত। শবযাত্রা ধর্মতলায় মোড় নিতেই ধ্বনি উঠল 'বন্দেমাতরম', 'সেনগুপ্ত কি জয়'! শবযাত্রা থামল 'এড্ভান্স' অফিসের সামনে, কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যোগেশচন্দ্র গুপ্ত একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, রণেন্দ্র মোহন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর পাশে। এবার করপোরেশন ষ্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গী রোড হয়ে শবযাত্রা চলল কলকাতা করপোরেশনের অফিসের দিকে। সেখানে অলডারম্যান ও কাউন্সিলররা সবাই অপেক্ষা করে আছেন ভূতপূর্ব মেয়রের প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অলডারম্যান নেলী সেনগুপ্ত—পরণে তাঁর শাদা খদ্দরের থান। শবাধার করপোরেশনের সভাগৃহে যখন বহন করে নিয়ে আসা হল, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি করে মহিলা সদস্যদের বিশ্রামের

ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেই যে রাঁচি থেকে বেরিয়েছেন, তারপর মুরি টাটানগর-খড়্গপুর-রামরাজাতলা—মরদেহের সঙ্গে এসেছেন, দুটি রাত বিনিদ্র কেটেছে। শরীরের অবসাদ ছাড়া মনের উপরও তো প্রতিক্রিয়া কিছু কম হয়নি। চব্বিশ বছর তিনি ছিলেন সত্যকার সহকর্মিনী, সহধর্মিনী—স্বামীর যশোসৌভাগ্যে যেমন ভাগ নিয়েছেন, তেমনি ভাগ নিয়েছেন দুঃখ দারিদ্র্যের। যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার পর থেকে স্বামীর দেশকে নিজের দেশ করে নিয়েছিলেন, স্বামীর কাজে ভারতীয় আদর্শের সাধ্বী স্ত্রীর মতো নিবেদন করেছিলেন নিজেকে। মেয়র সন্তোষ কুমার বসু শবাধারের উপর শ্বেতপদ্মের একটি স্তবক অর্পণ করে বললেন :

> এই মহানগরীর সকল নাগরিকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আমি আমার পক্ষ থেকে ও করপোরেশনের অন্যান্য সহকর্মীদের পক্ষ থেকে এই পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছি তাঁকে যিনি দীর্ঘ পাঁচ বছর একাদিক্রমে এই পৌরসংস্থার অবিসম্বাদী নেতারূপে মহানগরীর উন্নতিকল্পে আজীবন সেবা করে গেছেন।

এবার শবযাত্রা চৌরঙ্গী হয়ে চলল যতীন্দ্র মোহনের আবাসের দিকে। এতক্ষণে আবার এক পশলা ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে গেল। এলগিন রোডে পৌঁছবার আগে উডবার্ণ কোর্টে সাউথ ক্লাবের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো হল। যতীন্দ্র মোহনের উদ্‌যোগে ও প্রচেষ্টায় কলকাতার এই টেনিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা যা নাকি এখন এসিয়ার প্রমুখ টেনিস ক্লাবরূপে স্বীকৃত। এলগিন রোডের আবাস গৃহের সামনে একবার শবাধারটি রাখা হল—যাতে অসুস্থ ও শয্যাগত বুঢ়্‌ঢা তার বাবাকে শেষ দেখা দেখে নিতে পারে। এলগিন রোডে তখন এত লোকের ভিড় যে বাড়ির লোকেরা নেমে গিয়ে যে দেখবে তার উপায় ছিলনা। বুঢ়্‌ঢার দোতলার শোবার ঘর থেকে বাড়ির মেয়েরা সকলে সজল চোখে শেষ দেখা দেখে নিলেন। এবার আশুতোষ মুখার্জি রোড—রসা রোড-রাসবিহারী এভিন্যু পার হয়ে শবযাত্রা চলল। শিখদের জগৎসুন্দর গুরুদ্বারের কাছে

পৌঁছুতে পাঁচজন শিখ পাঁচটি তরবারি কোষমুক্ত করে তুলে ধরল, বন্দুক থেকে পাঁচবার গুলি দাগা হল, গুরুদ্বারে আত্মার কল্যাণে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হল। অতঃপর দু'হাজার শিখ সামিল হল শবযাত্রায়, বারোজন উন্মুক্ত তরবারি হাতে চলতে লাগল পুরোভাগে। শিখেরা সমস্বরে ধ্বনি দিল 'সৎ শ্রী আকাল' 'সেনগুপ্ত কি ফতে'।

কেওড়াতলা ঘাটে শবযাত্রা পৌঁছল বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে। এখানে হাজারো লোক অপেক্ষা করে ছিল। ঘাটের প্রবেশদ্বারে অনেক লোকের জটলা, সকলেই চায় অন্তত একবার কাঁধ লাগাতে, কিন্তু এতটা রাস্তা যারা কাঁধ দিয়ে এসেছে তারাই বা ছাড়বে কেন? শেষ পর্যন্ত নেতাদের সমবেত চেষ্টায় শবাধার চিতার উপর স্থাপিত হল বেলা সাড়ে পাঁচটায়। সকল রকম প্রস্তুতি শেষ হলে কুমুদিনী বসু ব্রহ্মসংগীত গাইলেন, কীর্তন হল, কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শিশির প্রচলিত প্রথা অনুসারে পিতার মুখাগ্নি করলেন। গঙ্গাজল ছিটিয়ে শিশির যখন চিতাগ্নি নেবালেন তখন রাত সাড়ে ন'টা। বাংলার দেশপ্রিয় ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তানের জীবন প্রদীপ এইভাবে নিবে গেল।

গান্ধীজী নেলীকে তারবার্তা পাঠিয়ে বললেন :

> সেনগুপ্তের আকস্মিক বিয়োগের খবর এইমাত্র পেলাম। আপনার ক্ষতি দেশের ক্ষতি। দেশের অগণিত লোকের মতো আমিও আপনার শোকে সহভাগী বলে জানবেন।

জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে* যতীন্দ্র মোহনের মৃত্যু বিষয়ে লিখেছিলেন :

> ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসের শেষদিকে একটি খবর পেয়ে আমি বিশেষ শোকগ্রস্ত ও বিচলিত হয়েছিলাম—খবরটা ছিল যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুর। কেবল যে আমরা বহু বৎসর কংগ্রেস কর্মসমিতির

* An Autobiography, p. 395

সদস্য ছিলাম এমন নয়—আমার কেম্‌ব্রিজ জীবনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। প্রথম আমাদের দেখা হয় কেম্‌ব্রিজেই—আমি তখন সদ্য ঢুকেছি আর তিনি সদ্য ডিগ্রি নিয়েছেন।

সেনগুপ্ত বন্দী অবস্থাতে মারা যান। ১৯৩২ সনের গোড়ার দিকে বিলাত থেকে দেশে ফেরবার পথে বোম্বাইয়ে জাহাজেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর থেকেই তাঁকে হয় জেলে না হয় অন্তরীণে থাকতে হয়েছে—ফলে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। কলকাতায় তাঁর শেষযাত্রা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—এই উপলক্ষে বাংলার জনগণ কেবল যে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছে এমন নয়, এর ভিতর দিয়ে বাংলার নিরুদ্ধ বেদনা যেন আত্মপ্রকাশের পথ করে নিয়েছে। থাক সে কথা, সেনগুপ্তও তাহলে চলে গেলেন।

অগ্নিসৎকারের পরের দিন ২৫ জুলাই তারিখে কলকাতা ময়দানে একটি মহতী জনসভায় যতীন্দ্র মোহনের মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। দেশপ্রিয় সম্বন্ধে শেষ কথা সম্ভবত তাঁর নিজের ভাষাতেই সবচেয়ে ভালো বলা যায়। তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন দাস যখন লাহোরে মারা যান, দেশপ্রিয় বলেছিলেন :

দেশের সরকার আমাদের শরীরকে যত শক্ত বাঁধনেই বাঁধুন না কেন, আমাদের আত্মাকে বাঁধতে পারেন এমন বন্ধন তাঁদের হাতে নেই।

যতীন্দ্র মোহন সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলা যায়। দেহের মধ্যে তিনি যতদিন ছিলেন সরকার পদে পদে তাঁর স্বাধীনতা খর্ব করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহবিমুক্ত আত্মা বন্ধনহীন। তিনি চলে গেলেন যখন দেশের সর্বত্র তখন তার বাণী রণিত হয়ে উঠল—স্বাধীনতার স্বপ্ন সত্য করে তুলতে হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
মানুষ হিসাবে দেশপ্রিয়

রাজনীতিক ঘটনার স্রোতে বেগ ও আবেগ থাকে, কিন্তু শৃঙ্খলা থাকেনা, পারম্পর্য থাকেনা। যে কটি বছর যতীন্দ্র মোহন রাজনীতিক ক্ষেত্রে সকর্মক ছিলেন তখনকার ঘটনাবলী অনুধাবন করলে দেখা যায় ভারতে এবং বিশেষত বাংলায় এত দ্রুত ঘটনার পটপরিবর্তন হয়ে গেছে যে খেই পাওয়া শক্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিক যতীন্দ্র মোহনের জীবন কথা বলতে গিয়ে আমি হয়তো মানুষ যতীন্দ্র মোহনের ছবিটুকু তুলে ধরতে পারিনি। তিনি সত্যিই মানুষের মতো মানুষ ছিলেন অর্থাৎ মানবসুলভ দোষগুণ তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। জীবন তাঁর কাছে কেবল প্রাণধারণ ছিলনা, ছিল যেন অস্তিত্বের আনন্দ যদিচ সে আনন্দ বেশিদিন তিনি উপভোগ করে যেতে পারেননি। খেলাধূলো অর্থাৎ প্রাণশক্তির পরিচ্ছন্ন প্রকাশ তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। অদৃষ্ট যদি তাঁকে সে সুযোগটুকু দিত তিনি হয়তো ভারতের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন হতে পারতেন। গণতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় ছিল বলে মানুষকে তিনি যেমন ভালবাসতেন তেমনি শ্রদ্ধা করতেন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে।

যতীন্দ্র মোহন মাথায় ছিলেন ছ'ফুট লম্বা, শরীরের ধরন ছিল মজবুত দোহারা গোছের। চলায় বলায় এমন একটা রাজসিক ঐশ্চর্য ছিল যে উনি যে আসনেই বসতেন সে আসন হত যেন সিংহাসন। দুগ্ধফেননিভ খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে যখন ঋজু হয়ে তিনি দাঁড়াতেন, চাদরটা ডানবগলের নিচে দিয়ে চালিয়ে দিতেন বাঁদিকের কাঁধে—তাঁকে দেখতে যেন রোমান সম্রাট। দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারসূত্রে মহাত্মা গান্ধী যে তাঁর মাথায় 'ত্রি-মুকুট' পরিয়ে দিয়েছিলেন, সে সম্মান তিনি অপাত্রে দেননি। তিনি পাসনে চশমা পরতেন বলে তাঁর চোখে যে করুণা মাখা থাকত, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চিনতে জানতে যে আগ্রহ থাকত—তা সব সময় নজরে পড়তনা।

নিজের পেশা থেকে কিংবা দেশের কাজ থেকে দু'চার ঘণ্টা ছুটি যখন পেতেন, অনেক সময় বাড়িতে বসেই সে ছুটি কাটাতে ভালোবাসতেন। পতি, পিতা, ভ্রাতা বা বন্ধুরূপে তিনি যাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সহজ মধুর। পারিবারিক মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যে কোনো খুঁত ছিলনা। পরিবার জীবনের ছোটখাটো হাসিখেলায় অনেক সময় তিনি বাইরের জগতের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি সন্ধান করে নিতেন। রবিবারের সকালটা বাড়ীর লোক কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে হাসিখেলায় কাটাতে খুবই ভালোবাসতেন, কখনো বা বেড়াতে যেতেন আউট্রাম ঘাট কিংবা ইডেন গার্ডেনে, কোনো কোনো দিন পালা কীর্তনের দল ডাকিয়ে আসর জমাতেন। তাঁর মধ্যে কোনো নীচতা বা ক্ষুদ্রতা ছিলনা। আজো লোকে তাঁর ঔদার্য ও মহানুভবতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি ছিলেন অদ্ভুত বিবেকবান মানুষ, বিবেকে যা বেধেছে তেমন কিছুর সঙ্গে কখনো আপস করে চলেননি, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। আত্মপ্রতারণা তাঁর স্বভাবে ছিলনা—যেমন ছিলনা বিদ্বেষভাব।

তাঁর অসামান্য বাগ্মিতার ফলে ব্যবহারজীবীরূপে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য ব্যারিষ্টর ভারতেও ছিল মুষ্টিমেয়। নিম্ন আদালতের অনেক সিদ্ধান্ত তাঁর প্রখর যুক্তিতে খান খান হয়েছে হাইকোর্টে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত এবং নিম্ন আদালতে দণ্ডাদিষ্ট কোনো একজন জমিদারের ছেলে আপীল রুজু করে যতীন্দ্র মোহনের শরণ নেয়। প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টর আধঘণ্টার একটা যুক্তিপূর্ণ বিতর্কে নিম্ন আদালতের বিচারে কী খুঁত আছে খুঁটিয়ে দেখালেন। খুনের আসামী আপীলে খালাস পেয়ে গেল।

ব্যারিষ্টর হিসাবে যতীন্দ্র মোহনের শক্তিমত্তার অপর একটি দৃষ্টান্ত হল বোম্বাইয়ের বাওয়ালা খুনের মামলা। সে সময়কার সবচেয়ে বড় খুনের মামলায় তিনি মুখ্য আসামী শফী আহ্‌মেদের পক্ষে নেবেছিলেন। ভারতের সবচেয়ে নামজাদা ব্যারিষ্টররা এই কুরুক্ষেত্ররণে যোগ দিয়েছিলেন—কেউ বাদীপক্ষের কেউবা

বিবাদীপক্ষের হয়ে। বোম্বাই বার-এর নেতৃস্থানীয় মিঃ জিন্না ও মিঃ বলিংকরও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বিবাদীর পক্ষ সমর্থনে যতীন্দ্র মোহন যুক্তিতর্কের যে চমক লাগিয়েছিলেন তার ফলে আইন জগতে তাঁর সুনাম ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়।

খুবই আশ্চর্যের কথা বলতে হবে যে কলকাতা বার-এর একজন প্রখ্যাত সদস্য ও বিশিষ্ট আইনবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও যতীন্দ্র মোহনের মৃত্যুর পর কলকাতা হাইকোর্ট এ বিষয়ে কোনো শোকসূচক উল্লেখ করেননি। সম্ভবত রাজবন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হওয়াতে হাইকোর্টকে এই কৃত্য থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু হাইকোর্টের অন্যতম জজ জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র দেশপ্রিয় বিষয়ে সপ্রশংস উল্লেখ করে বলেছিলেন :

> মিঃ সেনগুপ্তের মৃত্যুতে কলকাতা বার্ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হল। হাইকোর্টের বিচার বিভাগের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনবিদ্ এবং ফৌজদারী মামলায় অসাধারণ ছিল তাঁর নৈপুণ্য। আমার মনে আছে ১৯২৯ সনে আমি যখন হাইকোর্টে ন্যায়াধীশ আমার এজলাসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন খুনের মামলায় বিবাদীপক্ষে মামলা চালনায়। তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্যে আমি বিস্মিত বোধ করেছিলাম। অপূর্ব বাগ্মিতার জোরে জুরিদের তিনি এমনভাবে প্ররোচিত করলেন যে ন'জনের মধ্যে চারজন মিঃ সেনগুপ্তের মক্কেলের সপক্ষে 'রায়' দিলেন। ফলে জুরিদের মতামত খারিজ করে আমায় নূতন করে মামলা দায়ের করার জন্য নির্দেশ দিতে হয়। কিন্তু অন্য জজের এজলাসে বিচারের পর খুনের আসামী দোষী সাব্যস্ত হয়। ব্যারিষ্টর হিসাবে তাঁর দক্ষতা, নৈপুণ্য ও বাক্চাতুর্য আমায় যে মুগ্ধ করেছিল—সে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

যুক্তি তর্ক দিয়ে কেবল যে মামলা সাজাতে পারতেন এমন নয়, বাগ্মিতাও ছিল তার অসাধারণ। কেম্‌ব্রিজে তিনি যখন মজলিস্ এবং ইস্ট-ওয়েস্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন থেকেই তর্কযুদ্ধে তাঁর হাতেখড়ি হয়।

জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজায়ত্ব। গলার জোর ছিল বলে বিনা মাইকে তাঁর কণ্ঠস্বরে পৌঁছত শ্রোতৃমণ্ডলীর শেষ সারি অবধি। ১৯৩১ সনে করাচী কংগ্রেসে দেশবন্ধুর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আজো তা স্মরণীয় হয়ে আছে।

দেশবন্ধুর জীবনের মুখ্য ঘটনা ও তাদের তাৎপর্য বিষয়ে বলতে গিয়ে তাঁর সেই বক্তৃতা প্রায় কাব্যিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। বিষয়বিন্যাস ও কণ্ঠ-লালিত্যের ইন্দ্রজাল রচনা করে তিনি যেন দেশবন্ধুর মূর্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রোতাদের অন্তরে।

মডারেট্ হলেও মন্মথনাথ রায়চৌধুরী যতীন্দ্র মোহনের বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, বলেছেন :

> যতীন্দ্র মোহনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল চুম্বকের মতো ; স্বতঃ উৎসারিত কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য তাঁর মধ্যে সমন্বিত হওয়ার ফলে জননেতা হবার সকলরকম গুণ তাঁর মধ্যে বর্তেছিল। তাঁর বাগ্মিতা ছিল বিরাট পাহাড়ের বুক থেকে নিঃসৃত জলপ্রপাতের মতো। বাঙালীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সেরা বাঙালী। শিষ্টতা তাঁর স্বভাবজাত ছিল বলে মতের অবনিবনা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনে তাঁর দ্বিধা ছিলনা।

ঠিক সময়ে ঠিককথাটি মুখে তাঁর জোগাত, যুক্তির ধার মনে দাগ কাটত, মর্মে প্রবেশ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর, কলকাতার ময়দান কিংবা কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের প্রশস্ত প্যাণ্ডেল—যেখানেই বক্তৃতা দিন না কেন, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ শেষ অবধি শোনা যেত। কর্কশ চীৎকরে গলাফাটানো বক্তৃতা তিনি করতেন না, বজ্রনির্ঘোষের মতো গম্ভীর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। উপস্থিত মতো তিনি তাঁর বক্তব্য বলে যেতেন, পূর্ব থেকে প্রস্তুত হবার সময় সুযোগ তিনি কমই পেতেন, কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় যুক্তি কিংবা সংগতির অভাব কখনো দেখা যেতনা, পৌর্বাপর্ব ঠিক রেখে অনর্গল বলে যেতে পারতেন। তিনি

যখন বক্তৃতা দিতে উঠতেন শ্রোতৃবর্গের বিক্ষোভ মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যেত। মন্মথনাথ অন্যত্র লিখেছিলেন :

আধঘণ্টা ধরে প্রাঞ্জল বাংলায় অনর্গল তিনি বলে গেলেন। কী তাঁর যুক্তি কী গভীর তাঁর প্রত্যয়! প্রতিপক্ষের তর্ক যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে লক্ষ্যবস্তুর ঠিক কেন্দ্রে গিয়ে বিঁধল তার তীর। অপর পক্ষের মুখ দিয়ে তখন আর কথা সরেনা—তাঁরা তখন সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিপর্যস্ত।

এরকম এক একটি বক্তৃতার পর শ্রোতৃমণ্ডলী সমস্বরে ধ্বনি দিত 'বন্দেমাতরম্', কংগ্রেসের সংকল্পসাধনে প্রেরণা লাভ করত। ইংরেজীতেও তিনি মাতৃভাষার মতোই অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন।

রাজনীতিতে যেমন, খেলাধুলাতেও বাংলার এই কৃতী সন্তানের তেমনই আগ্রহ ছিল। কলকাতার লোক তাঁর নামই দিয়েছিল 'ক্রীড়ামোদী মেয়র'। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতি ও খেলাধুলাকে যুগপৎ গুরুত্ব দিয়েছেন এমন আর দ্বিতীয় নেতা ছিলেন বলে মনে হয়না। এককালে প্রত্যেকটি খেলাধুলায় তিনি উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ যখন তাঁকে খেলাধুলো ছাড়তে হয়, খবর কাগজে খেলার খবর সর্বপ্রথম সাগ্রহে তিনি পড়ে দেখতেন। কলেজে থাকতে তর্ক প্রতিযোগিতায় যেমন, নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতাতেও তেমনি তাঁর সঙ্গে খুব কম ছেলেই পেরে উঠত। যেসব খেলায় তিনি নিপুণ ছিলেন সে হল ফুটবল, সাঁতার, টেনিস, ক্রিকেট, হকি ও নৌকা বাইচ। ডাউনিং কলেজে তিনি যখন ছাত্র তখন নৌকাবাইচে কেম্‌ব্রিজের 'ব্লু' হয়েছিলেন। তাঁর আগে কিংবা পরে খুব কম সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র কেম্‌ব্রিজে খেলায় এমন নাম করেছিলেন। তাঁর জীবনের অনেক দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম হল এই যে কেম্‌ব্রিজ অক্সফোর্ড বাইচ প্রতিযোগিতার খবর জেলে থাকতে তাঁকে পেত হত খবর কাগজ মারফত কিংবা লোকমুখে। ক্রিকেট ও টেনিসেও তিনি সেই সময় কেম্‌ব্রিজের একজন সেরা খেলোয়াড়রূপে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি যখন কলকাতার মেয়র, কেবল কলকাতা কেন

সমস্ত এসিয়ায় টেনিস খেলার মান উন্নীত করার চেষ্টায় উড্‌বাণ পার্ক-এর সামান্য সাউথ ক্লাবকে এসিয়ার টেনিস ক্লাব নাম দিয়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধির সকল রকম ব্যবস্থা করেছিলেন। সাউথ ক্লাবের দেয়ালে তাঁর যে ব্রোঞ্জ নির্মিত পরিলেখ আছে তা এখনো স্পোর্টিং মেয়রের এই কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। বহু বৎসর ধরে তিনি এই ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পরেও নৌকাবাইচে তাঁর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯২৮ সনে যতীন্দ্র মোহনকে প্রেসিডেণ্ট করে ঢাকুরিয়ায় একটি লেক ক্লাব স্থাপন করার জন্য কমিটি গঠিত হয়। তাঁর এই কাজে সহযোগ করেছিলেন তাঁরই মতো ক্রীড়ামোদী দুজন শিল্পপতি—স্যর বীরেন মুখার্জি ও কে. সি. মাহিন্দ্র। লেক ক্লাবের পাশে য়ুরোপীয়ানদের যে ক্লাব ছিল সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিলনা বলে একপ্রকার তাঁদের সঙ্গে রেষারেষি ও প্রতিযোগিতার ভাব নিয়েই লেক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। দুঃখের বিষয় ১৯৩২ সনে লেক ক্লাব যখন চালু হয় তখন তিনি জেলে। ভারতীয়েরা ক্লাবের মেম্বর হয়ে এককভাবে কিংবা সদলে বাইচের নৌকায় লেকের জলে মনের আনন্দে দাঁড় বেয়ে চলেছে—এই দৃশ্য তিনি দেখে যেতে পারেননি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁকে যখন রাঁচিতে স্থানান্তর করা হয়, তাঁর বিশেষ অনুরোধে পুলিসরক্ষীরা তাঁকে তাদের গাড়িতে করে লেক ঘুরিয়ে দেখায়। কিন্তু তাঁর নিজের হাতে গড়া লেক ক্লাবে কেবল একটি বারের জন্যও পুলিস তাঁকে ঢুকতে দিতে চায়নি। মোটরের জানলা থেকে একপলক তিনি হয়তো দেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নের বাস্তবরূপ। অনির্দিষ্টকাল অন্তরীণ থেকে ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট পদ ধরে রাখা তাঁর মনঃপূত ছিলনা বলে তিনি সে পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাঁর জায়গায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন কুচবিহারের মহারাণী।

জেলের বাইরে যখনি থাকতেন কলকাতার ফুটবল খেলার মাঠে তাঁকে প্রায় দেখা যেত। হাইকোর্ট বার লাইব্রেরির মেম্বররূপে তিনি তাঁর য়ুরোপীয় সহকর্মীদের সঙ্গে সমান তাল রেখে টেনিস খেলেছেন, ক্রিকেট খেলেছেন।

য়ুরোপীয় ব্যারিষ্টর একজন বলেছেন যে যতীন্দ্র মোহনকে খেলার সাথীরূপে পেয়ে তাঁদের যেমন আনন্দ হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাঁরা তেমনি দুঃখবোধ করেছেন যে রাজনীতি তাঁকে কেবল 'বার' থেকে নয় খেলার মাঠ থেকেও দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে ভারত যে কেবল অনন্যসাধারণ একজন দেশভক্তকে হারায় এমন নয়, এমন একজন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীকে হারায় যিনি খেলার মাঠে এবং খেলার মাঠের বাইরে—এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় রেখে গেছেন। জীবনের খেলা তিনি খেলে গেছেন জয়পরাজয়ের হিসাব না রেখেই।

ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসে যতীন্দ্র মোহন ও নেলীর মতো একব্রত স্বামী স্ত্রীর জুটি বড় বেশি দেখা যায়না। ভারতে প্রথম যখন পা দিলেন, নেলী তখন বিশ বাইশ বছরের সদ্যবিবাহিতা সংসার অনভিজ্ঞা ইংরেজ তরুণী। স্বামীকে অবলম্বন করে সুদূর অপরিচিত দেশে চলে এলেন, অপরিচিত সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের বধূরূপে প্রবেশ লাভ করলেন। অতঃপর তাঁদের যুগল জীবনের যে-যাত্রা শুরু হল সে পথে পতির প্রতি প্রেমই হল তাঁর একমাত্র পাথেয়। গৃহপরিবারে, কারাগারে, রাজনীতির মঞ্চে যেখানেই যতীন্দ্র মোহন, নেলী ছায়ানুগামিনী হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হিন্দু বিবাহের আদর্শ অনুসারে যাকে অর্ধাঙ্গিনী কিংবা সহধর্মিনী বলে নেলী ছিলেন তাই। কিন্তু একথা বলা ভুল হবে যে কেবল স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে নেলী স্বাধীনতাযুদ্ধে যতীন্দ্র মোহনের শরিক হয়েছিলেন। নিজে তিনি স্বাধীন দেশের মেয়ে, স্বাধীনতার প্রতি প্রেম তাঁর মজ্জাগত। ব্রিটিশ চরিত্রের ন্যায় ও সততাবোধ থেকে বিচার করে তিনি বুঝেছিলেন, নিছক অস্ত্রশস্ত্রের হুমকি দেখিয়ে পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের এই বিরাট দেশকে ইংরেজ দাবিয়ে রাখতে পারবেনা, দাবিয়ে রাখা অন্যায়। নেলীর মধ্যে অপর একটি সহজাত ব্রিটিশ গুণ ছিল নির্যাতিতের প্রতি মমতা, পরাজিতের জন্য সংগ্রাম করা। তাঁর মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বলেই এত সহজে তিনি অভ্যস্ত আরাম ও নিরাপত্তা বিসর্জন

দিয়ে দুর্গম অভিযানে যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে কদম মিলিয়ে চলতে পেরেছিলেন। তা যদি তিনি না পারতেন যতীন্দ্র মোহন দেশপ্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন না। তিনি যে কলকাতা করপোরেশনের অলডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয়া মহিলা প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছিলেন—এ সমস্তই তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গুণে ও কৃতিত্ব গুণে। পরবর্তী জীবনে তিনি কলকাতা করপোরেশনের স্থায়ী স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতির সদস্য হয়েছিলেন, বাংলার বিধান পরিষদের এবং আরো অনেক পরে পূর্ব পাকিস্তান বিধান পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। আজকের দিনেও যতীন্দ্র মোহনের সত্যকার স্মারক বলে যদি কিছু থেকে থাকে তিনি হলেন নেলী সেনগুপ্ত। দেশ ভাগ হয়েছে। কিন্তু যে বাড়িতে তিনি নববধূবেশে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন, সেই তাঁর শ্বশুরের ভিটাকে আজো তিনি সবলে আঁকড়ে ধরে আছেন। চট্টগ্রামে থেকে এখনো তিনি দুঃখী দুর্গতের সেবা করে চলেছেন—যাত্রা মোহন যতীন্দ্র মোহনের আদর্শ অনুসরণ করে। তিনি জানেন ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে এক জাতিকে শতেকখান করার বেদনা তাঁর স্বামীর বুকে কী গভীরভাবে বাজত! তাই দেশ বিভাগের নাম করে তিনি দেশত্যাগী হতে পারেননি। চট্টগ্রামে তিনি একা আছেন যারা বলে, তাদের তিনি বলেন একা তো তিনি নেই, দেশ জোড়া তাঁর দুঃখী দরিদ্র সন্তান সন্ততি আছে, আর আছে সেই সব পুরাতন দিনের স্মৃতি যা না কি কোনো দিনই পুরাতন হবার নয়।

যতীন্দ্র মোহনের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। একবার নাকি চেকে তাঁর সইজাল করে একজন লোক তাঁকে ঠকিয়েছিল। সে লোক ধরাও পড়েছিল। কিন্তু তিনি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পুলিসের কর্তাব্যক্তিরা যখন সার্জেন্টদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করতে আসত, তিনি সর্বদা অমায়িকভাবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, চা খেতে দিতেন, ধূমপানের জন্য তাঁর দামী চুরুট দিতেন, তারপর তাদের সঙ্গে উঠতেন পুলিসের কালো গাড়িতে। পুলিসের লোকেরা পর্যন্ত তাঁকে বেশ পছন্দ করত। ইংরেজরা তাঁর সম্বন্ধে বলত :

ইংরেজদের মধ্যে তিনি যখন থাকেন তিনি তখন বাঙালী। বাঙালীদের মধ্যে তিনি একজন ইংরেজ।

আসলে তিনি ছিলেন ষোলো আনা খাঁটি বাঙালী। নামেই তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর কোনো সংস্রব ছিলনা। কোনো লেবেল দিয়ে চিহ্নিত হওয়া তাঁর মনঃপূত ছিলনা। অথচ মনের গভীরে তাঁর প্রবল ধর্মভাব ছিল। তারাচরণ সাধুকে তিনি ভক্তি ধরতেন, ভালোবাসতেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি তাঁর সমান প্রীতি ছিল বলে সকল সম্প্রদায়ের কাছে তিনি প্রীতির পাত্র ছিলেন। তাঁর বিষয়ে একটি কাগজ সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছিল :

> তিনি ছিলেন নির্ভীক, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। আধখামচা কাজ করা তাঁর ধাতে ছিলনা। যে কাজ ধরতেন তা সম্পূর্ণ শেষ না করে তিনি ছাড়তেন না। জননেতার যেসব গুণ থাকা দরকার, তাঁর মধ্যে তা ছিল পূর্ণমাত্রায়। অপর পক্ষে তিনি ছিলেন নীরব কর্মী, লোক দেখানো জাঁকজমক তিনি ঘোরতর অপছন্দ করতেন। আশেপাশে সমধর্মী কিংবা সমকক্ষ লোক তাঁর ছিলনা বলে আসলে তিনি ছিলেন একক পুরুষ। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে মহৎ গুণ ছিল এই যে অন্যায়ের কাছে মাথা কখনো নোয়াবেন না বলে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

যতীন্দ্র মোহনের জীবন অনুধাবন করে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে নিয়মানুবর্তিতায় তিনি ছিলেন সৈনিক এবং সংগ্রাম পরিচালনায় সর্বাধিনায়ক। আত্মসম্মানবোধ তাঁর অসাধারণ ছিল বলে অপরের সম্মান তিনি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করতে পারতেন না। অন্যায় যুদ্ধে জয়লাভকেও তিনি হেয়জ্ঞান করতেন।

চাপা উত্তেজনার থমথমে আবহাওয়া হাসির গমকে উড়িয়ে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যতীন্দ্র মোহনের। লোকে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে কিংবা তাঁর কাজে সহযোগ করতে উৎসাহ বোধ করত, কারণ তিনি ছিলেন একজন সর্বতোভদ্র মানুষ— রাজনীতিক মতবাদে যাদের সঙ্গে

তার মতের মিল ছিল না তারা পর্যন্ত তাঁকে সম্ভ্রম করে চলত। একবার তাঁর বিষয়ে বলতে গিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মন্তব্য করেছিলেন :

> রাজনীতিক হিসাবে তিনি খুবই বড় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি আরো অনেক বড় ছিলেন, তিনি ছিলেন প্রকৃত সজ্জন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সুরেন্দ্র চন্দ্র ধর : দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন

২। *Deshapriya Jatindra Mohan Sengupta—His Life and Work.* Modern Book Agency, Calcutta-19.

৩। Jawaharlal Nehru : *An Autobiography.* John Lang, The Bodley Head, London—1936

৪। Dr. Pattabhi Sitaramayya : *The History of the Indian National Congress.* Padma Publications Ltd., Bombay—1936

৫। *The Calcutta Municipal Gazette* (July 29, 1933)

৬। Maurice Collis : *Trials in Burma.* Penguin Books, 1945

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার